বিশ্বকাপ ফুটবল
আগামী দিনগুলোর মহাসংগ্রাম

মিত্র প্রকাশন প্রকাশনা

আলোকপাত

মূল্য ৭·০০ ● এপ্রিল ১৯৯০

বি জে পি-র স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদের অজ্ঞাতপর্ব:ডায়েরি এবং আত্মকথার প্রেক্ষাপটে

পশ্চিমবংগে বি জে পি-রনেতৃত্বে ধর্মীয় দলগুলি সি পি এম-এর বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে!

রাজস্থানের মরু উৎসব

ইস্টার্ন কোলডফিল্ড গৃহযুদ্ধের নেপথ্যে

ড্রাগ : নেশার বিষাক্ত জগৎ!

অভিযুক্ত মৃণাল সেন!

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিত কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ রূপালী গোসাভি

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

৫ম বর্ষ * তৃতীয় সংখ্যা * এপ্রিল ১৯৯০

আলোকপাত

প্রধান সম্পাদক: আলোক মিত্র
সহায়ক সম্পাদক: রমাপ্রসাদ ঘোষাল
সহ সম্পাদক: প্রদীপ বসু
উপ সম্পাদক: গুরুপ্রসাদ মহান্তি
সংবাদদাতা
দিল্লি: পুষ্কর পুষ্প
হায়দরবাদ: পারভেজ খান
মাদ্রাজ: লক্ষ্মী মোহন
লণ্ডন: বলবন্ত কাপুর
ওয়াশিংটন: শেখর তেওয়ারি
লস এঞ্জেলেস: আফসান সফি
বম্বে ব্যুরো প্রধান: রবীন্দ্র শ্রীবাস্তব
আলোকচিত্রী: বিকাশ চক্রবর্তী
ভিসুয়ালাইজার: শান্তনু মুখার্জি

দিল্লি কার্যালয়:
সঞ্জয় লাল: ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপক
৩০৫ রোহিত হাউস, ৩ তলস্তয় মার্গ
নয়াদিল্লি–১১০০০১
দূরভাষ: ৩৩১৪৫৩০, ৩৩১৩৭৪৯, ৩৩১৭৪১৬
টেলেক্স: ০৩১ ৬৭১৫ নিউজ ইন
বম্বে কার্যালয়:
অনুপ জুৎসি: আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক
৮১০ এমব্যাসি সেন্টার
নরীম্যান পয়েন্ট
বম্বে–৪০০০২১
দূরভাষ: ২৪৩৫৭৭, ২৪৪৮৪৬, ২৪৪৮৪৭
টেলেক্স: ০১১ ২৫৫৭ মায়া ইন
লখনউ কার্যালয়:
বি–১০৩, গোপালা অ্যাপার্টমেন্টস,
৫০, রামতীর্থ মার্গ, হজরতগঞ্জ, লখনউ–২২৬০০১
দূরভাষ: ২৪৮৮৭৮/২৪৬৩০০
ব্যুরো প্রধান: অজয় কুমার
কলকাতা সম্পাদকীয় ও ব্যবসায় কার্যালয়:
স্টিফেনস কোর্ট
ফ্ল্যাট–৫ এ (পাঁচতলা)
১৮ এ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা–৭০০০১৬
দূরভাষ: ২৯১০৩৫, ২৯৮৫৪০, ২৯৭৮২৮
টেলেক্স: ০২১ ৫১৭৩, নিউজ ইন
আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক: অমিত সেন
প্রধান কার্যালয়:
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ ২১১০০৩
দূরভাষ: ৫৩৬৮১, ৫১০৪২, ৫৫৮২৫, ৫৫৭৭৩
গ্রাম: মায়া এলাহাবাদ
টেলেক্স: ০৫৪–২৮০
প্রকাশক: দীপক মিত্র
মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২৮১ মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ–২১১০০৩ থেকে প্রকাশিত
এবং মায়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড থেকে অশোক মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত।
ফোটোকম্পোজিং: মিত্র প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, এলাহাবাদ–এর একটি ইউনিট–সুরুচি অফসেট।

AIR SURCHARGE 50 PAISE PER COPY
for Dibrugarh, Silchar, Tinsukia, Jorhat, Tejpur, Shilong, Kathmandu and Agartala

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন পৃষ্ঠা–১৬

নবম লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে ভারতে যে রাজনৈতিক দলটি ধর্মসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে সারা দেশে নয়া রাজনৈতিক শক্তিকে কায়েম করতে চলেছে তার প্রতিষ্ঠাতা এই কলকাতার বাসিন্দা বাঙালির শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। স্যার আশুতোষের মধ্যমপুত্র এই শ্যামাপ্রসাদ কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতের মত সর্বধর্মসমন্বয়ের দেশে বিজেপির মত হিন্দুরাষ্ট্রবাদী দল প্রতিষ্ঠা করতে গেলেন? শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস কিভাবে ধর্মবিশ্বাসী রাজনীতিকদের প্রেরণা হতে চলেছে? কাশ্মীরে তাঁর রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে জওহরলাল নেহরু, শেখ আবদুল্লা এবং বিধান রায় জনমানসে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হন কেন?

অন্তর্দন্ত পৃষ্ঠা–৩২

উৎপাদনে ব্যাপক কারচুপি, বেআইনী ঠিকাদার নিয়োগ ও স্বজনপোষণের অভিযোগ আক্রান্ত ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেকটর জে·এন· উপ্পল। কে এই উপ্পল? কেনই বা তাকে কেন্দ্র করে এখানে গৃহযুদ্ধের আগুন?
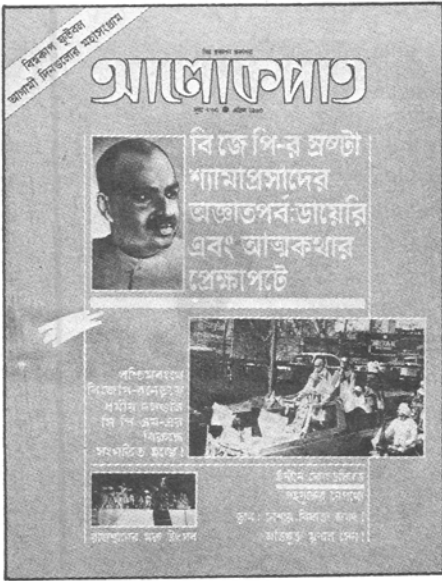
দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনশীলতা বর্তমান সময়টিকে যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অবশ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন শুধুমাত্র দেশের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বিশ্বের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণেই এখন চলেছে পরিবর্তনের হাওয়া, যার পোশাকি নাম এখন দুটি রুশ শব্দ 'গ্লাসনস্ত' আর 'পেরেস্ত্রৈকা'র সঙ্গে সমার্থক হয়ে গেছে। আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুই ধারকক্ষেত্র লোকসভা আর বিধানসভার নির্বাচন হয়ে গেছে সাম্প্রতিককালে। লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্র থেকেই শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, সামাজিক আর আর্থনীতিক সমীকরণের জটিলতায় বিজড়িত হয়ে।

এই লোকসভা নির্বাচনেই ভারতীয় রাজনীতির একটি অন্যতর সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রকটিত হয়েছিল। তা হল সমাজব্যবস্থার অন্তর্লীন ধর্মীয় অনুষঙ্গটি। ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে বিপুল জনসমর্থন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের এযাবৎকার হিসেব নিকেশকে কিছুটা বিচলিতই করে তুলেছিল। অতি সম্প্রতি নটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন সেই বীজকে মহীরুহ পরিণত করে দিয়েছে। হিন্দিবলয়ের তিন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে ভারতীয় জনতা পার্টি, যারা রাজনীতি আর ধর্মীয় আবেগের মধ্যেকার বিভেদটাকে খুব একটা প্রলম্বিত করতে চায়না।

পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিতে এই ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করলেও এই একই সম্ভাবনা চোখে পড়ে। অথচ প্রগতিকেন্দ্রিক মানসিকতার প্রবুদ্ধ পটভূমি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ধর্মীয় আবেগের ওতপ্রোত হওয়ার ঘটনাটি কিছুদিন আগেও ছিল অভাবনীয়। সম্প্রতি ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গেও রাজনৈতিক পাদপ্রদীপের আলোয় আসার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ঘটনা হল আজকের ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরী জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি উঠে এসেছিলেন বাংলার রাজনৈতিক পটভূমি থেকেই। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চিন্তন, লেখন ও দিনলিপির আশ্রয়ে প্রতিবেদিত হয়েছে এই সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন। এই সঙ্গেই সংকলিত হয়েছে পশ্চিমবাংলার রাজনীতি ও বি জে পি-র হিন্দু পুনরুত্থানের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার বিস্তৃত চালচিত্র।

কয়লাশিল্প জাতীয়করণের পর ইস্টার্ন কোলফিল্ড দেশের সবচেয়ে বড় কয়লা ক্ষেত্র। কয়লার এই জগত যে কতটা কালিমালিপ্ত—দুর্নীতি আর আর্থিক নয়ছয়ের ব্যাপ্তিতে—তা নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে এই সংখ্যায়।

'ড্রাগস'—মারাত্মক সব নেশাদ্রব্যের প্রচলন কিভাবে ছড়িয়ে পড়ছে সমাজের সর্বক্ষেত্রে—কিভাবে ঘটে এর আদানপ্রদান—কিভাবে নেশাদ্রব্যের পাচারকারীরা এড়িয়ে যায় আইনের চোখ; বিশ্বের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কিভাবে এই 'ড্রাগস' প্রধানতম সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে—তা নিয়ে রয়েছে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন।

বাংলা সিনেমার হাল হকিকৎ নিয়ে একটি রচনা উন্মুক্ত করেছে চলচ্চিত্রশিল্পের নিদারুণ দৈন্যদশার চিত্রটিকে। এই সঙ্গেই আমরা সংযোজন করেছি সত্যজিৎ রায়ের একটি বিরল সাক্ষাৎকারে—কলকাতা, তাঁর প্রিয়তম শহর বিষয়ে তাঁর অকপট ভাবনাচিন্তার বিস্তার।

বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রস্তুতিপর্ব নিয়ে রোম থেকে রয়েছে একটি বিশেষ প্রতিবেদন।

এছাড়া রয়েছে 'আলোকপাত'—এর নিয়মিত বিভাগগুলির মধ্যে অভিযান, জীবনবিচিত্রা ও অনুপ্রেরণার কাহিনীগুলি; বিজ্ঞান ও জীবনপর্যায়ে বিধৃত বিশ্ববিচিত্রা।

বৈচিত্র্য বিস্তারে 'আলোকপাত'—এর এই সংখ্যাটিও পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলির ধারাবাহিকতার অনুসারী।

আলোক মিত্র

প্রথম টেস্টটিউব শিশু সম্পর্কে জানতে চাই

ফেব্রুয়ারি '৯০ সংখ্যার আলোকপাত–এ 'টেস্ট টিউব শিশু ও একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান' সম্পর্কিত লেখাটি পড়ে ভাল লাগলেও প্রথম টেস্ট টিউব শিশু সম্পর্কে জানার আগ্রহ মিটল না। আমার মনে হয় বিশ্বে প্রথম টেস্ট টিউব শিশু সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি দু'চার কথা বলতে চাই।

বিশ্বের প্রথম টেস্ট টিউব শিশুর বয়স এখন ১০/১২ বছর। তার নাম লুইস ব্রাউন। ধাত্রীবিদ ডাঃ প্যাট্রিক স্টেপটো এবং বৈজ্ঞানিক ডাঃ রবার্ট এডওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ব্রাউন হল ক্লিনিকে লুইস ব্রাউনের জন্ম।

এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দিকে শুরু হয়ে যায় টেস্ট টিউব শিশুর জন্মদান পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা। এখন বিশ্বের প্রায় পঁচিশটি দেশে এ ধরনের গবেষণাগার রয়েছে। মোট গবেষণাগারের সংখ্যা ২০০টির মত। এই গবেষণারই ফল হিসাবে ধাত্রীবিদরা এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রায় ৩০০ বন্ধ্যা দম্পতির মুখে হাসি ফুটিয়েছেন।

প্রথম ভারতীয় দম্পতি যারা টেস্ট টিউব শিশুর পিতামাতা হবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তারা হলেন ডাঃ প্রকাশ ও শ্রীমতী প্রকাশ। যদিও এই শিশুটির জন্ম হয় ব্যাঙ্গালোরের ফিলোমা হাসপাতালে, কিন্তু নিষেক ও ভ্রূণ সংস্থাপনের কাজটি হয় প্রথম টেস্ট টিউব শিশুর জন্মস্থল সেই ইংল্যাণ্ডের ব্রাউন হল ক্লিনিকে ডাঃ এডওয়ার্ডেরই তত্ত্বাবধানে।

সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা সৃষ্ট প্রথম টেস্ট টিউব শিশুর জন্ম হয় ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের ৬ আগস্ট, বম্বের কে.ই.এম. হাসপাতালে। ডাঃ হিন্দুজার তত্ত্বাবধানে ভারতীয় প্রথম টেস্ট টিউব শিশু হিসাবে শ্রী চাওড়া ও শ্রীমতী চাওড়া তাদের কন্যার মুখ দর্শন করতে পারেন।

এরপর কলকাতায় ডাঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে জন্ম হল প্রথম ভারতীয় টেস্ট টিউব শিশু। তার নাম ইন্দ্র। কিন্তু টেস্ট টিউব শিশু নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। অনেকেই হয়তো ব্যাপারটা জানেন না। ব্যাপক প্রচার হয়নি বলেই এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সকলের অগোচরে ঢাকা পড়ে গেছে।

ইংল্যাণ্ডে ডাঃ এডওয়ার্ড যখন প্রথম টেস্ট টিউব শিশুর জন্ম দিয়েছেন তখন কলকাতায় ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথম সৃষ্টি করলেন টেস্ট টিউব শিশু। তার নাম দুর্গা। বহু বিতর্কিত এই দুর্গাকে নিয়ে তেমন কোন হৈ চৈ হল না, এর একমাত্র কারণ বোধহয় কোন মেডিকেল জার্নালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও দুর্গার কথা প্রকাশিত না হওয়া। তাই আজ টেস্ট টিউব শিশুর ইতিহাসে ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্থান নেই। অথচ ব্যাপারটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই বিষয়ে আপনার আলোকপাতে আগামী দিনে বিস্তারিত ইতিহাস জানতে চাই।

পথিক মণ্ডল
নিউব্যারাকপুর
২৪ পরগণা (উঃ)

দুঃসংবাদ দূরদর্শন

ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ আলোকপাত–এর দূরদর্শন বিভাগে কলকাতা দূরদর্শনের সংবাদ নিয়ে গুরুপ্রসাদ মহান্তির প্রতিবেদনটি বাস্তবে বলিষ্ঠ সংযোজন। এই ধরনের গঠনমূলক পর্যালোচনা অপদার্থ কলকাতা দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিপাতে আনা বিশেষ প্রয়োজন।

আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আকাশবাণীতে সংবাদ পাঠকের কণ্ঠ কানে শুনি এবং দূরদর্শন–এ দেখি। কিন্তু ইদানিং দেখা যাচ্ছে দূরদর্শনের সংবাদ বিভাগ গোঁজামিলে কাজ সারছেন। সংবাদের সঙ্গে কোন ছবি দেখানো হচ্ছে না। একমাত্র সংবাদ পাঠকের মুখ নিচু করে বকবকানি কতক্ষণ শোনা যায়! তারপর আছে ভুল সংবাদ পাঠ। আকাশবাণী ও দূরদর্শনের সংবাদের সঙ্গে কোন পার্থক্য দেখা যাচ্ছে না।

ভেবেছিলাম রাষ্ট্রীয় মোর্চা কেন্দ্রে আসায় কলকাতা দূরদর্শনে নতুনত্ব আসবে কিন্তু সে আশায় আমাদের ছাই পড়েছে। কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সূচীতে বা সিরিয়ালে কোন নতুনত্ব চোখে পড়ছে না। দায়সারা করে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্রে 'দর্শকের দরবারে' নামে পাক্ষিক চিঠিপত্রের উত্তরের বিভাগ আছে। যারা এই বিভাগটি পরিচালনা করেন তাদের বলার কায়দা দেখে মনে হয় না এরা পূর্ব থেকে প্রস্তুতি নিয়ে কেন্দ্রে আসেন। ভুল ও জড়ানো বাক্যালাপ দর্শককুলকে বিরক্ত করে। কলকাতা দূরদর্শনের ঘুঘুর বাসা ভাঙতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মানব বিশ্বাস
শংখনগর, হুগলী

ত্রুটি সংশোধন

ফেব্রুয়ারি মাসের আলোকপাতে আপনাদের লেখা 'সংবাদের সঙ্গে' পড়লাম। খুবই ভাল লাগল কিন্তু একটি ব্যাপার আপনারা কেন ভুল ছাপলেন বুঝতে পারলাম না। আপনারা চৈতালী দাশগুপ্তর ছবির নিচে শাশ্বতী গুহঠাকুরতা ছাপলেন কেন? এই ত্রুটি আপনাদের আগেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল না কি?

পিয়ালী বন্দ্যোপাধ্যায়

অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

—প্রতিবেদক

আয়ান রশীদ ও এপিক বিতর্ক

আলোকপাত জানুয়ারি '৯০ সংখ্যায় প্রকাশিত আয়ান রশিদ খান–এর সাক্ষাৎকারটি পড়লাম। উক্ত লেখাটিতে শ্রী খান একটি অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। দূরদর্শনের কাজকর্ম ও অনুষ্ঠান পরিবেশনের প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখার অছিলাতে উনি বলছেন–'ভারতের মত সেকুলার দেশে রামায়ণ, মহাভারত দেখান হয় কোন যুক্তিতে?

সব থেকে বড় কথা রামায়ণ, মহাভারতের মত দুটো এপিককে অশিক্ষিত দুটো মানুষের হাতে তৈরির দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে।' এই দিয়ে উনি কি বলতে চাইছেন? উনি কি চান যে শুধুমাত্র একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হওয়ার জন্যই ভারতবর্ষের যে কোন গণ প্রচার মাধ্যমে রামায়ণ মহাভারতের মত বিশ্বজয়ী গ্রন্থের নাট্যরূপ প্রদর্শন বন্ধ হওয়া উচিত? দূরদর্শন যে একটা সরকারী প্রচার মাধ্যম তা আমরা ভাল ভাবে জানি। এইজন্যই দূরদর্শনের একটি নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য সংস্কৃতিকে জনগণের চোখের সামনে শৈল্পিক গুণসমৃদ্ধ করে তুলে ধরা। এটা হচ্ছে সাহিত্য সংস্কৃতির উন্নয়ন ও সংরক্ষণের কথা। কোন ধর্মীয় প্রশ্নের এখানে উত্থাপন নিতান্ত অবান্তর ও বিভ্রান্তিকর। শ্রীখানের অন্যান্য প্রতিভাকে আমি স্বীকার করছি। তৎসত্ত্বেও তাঁর উক্ত মন্তব্যটি দেশের সাম্প্রদায়িক শান্তি–সম্প্রীতির পক্ষে হানিকর মনে করি। খান মহাশয়ের দ্বিতীয় মন্তব্যটি প্রকাশ পেয়েছে–'রামায়ণ মহাভারতের মত দুটি এপিককে...' এতেই তো সিদ্ধ হয় রামায়ণ মহাভারতকে কেন প্রযত্ন সহিত সরকারি প্রচার মাধ্যমে দেখানো উচিত। খান সাহেব কিছু না ভেবেচিন্তে কি করে এমন একটি হঠকারী মন্তব্য করে বসলেন বুঝতে পারছি না।

অরূপ কুমার চাংকাকতি
বনগাঁও
অসম

জ্যোতি বসুর পরিবার

এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নিজস্ব নিপুণতা, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, মানবিকতা ও ভদ্র ব্যবহারের জন্য প্রতিটি লোকেরই মন জয় করতে পেরেছেন। দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এই রাজ্যে এখনও লোকে অরাজকতা ও সাম্প্রদায়িকতা দেখতে পায়নি। সবচেয়ে বড় কথা, পশ্চিমবঙ্গে কোন জাতিভেদ নেই।

ফেব্রুয়ারির আলোকপাতে জ্যোতিবাবুর পরিবারের নানা তথ্য জানা গেল। 'আলোকপাতই' একমাত্র পত্রিকা যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সম্পূর্ণ ইতিহাস খুবই স্পষ্টভাবে বিশ্লেষিত করেছে। অতি সাধারণ জীবনে বিশ্বাসী এই মহা রাজনৈতিক নেতা শুধু বাঙালারই নন প্রতিটি ভারতবাসীর মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রতিবেদনে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের বহু অজানা তথ্য জানা গেল।

ভূপেন বসু
১৫৭, দমদম পার্ক
কলকাতা–৫৫

ড্রাগ : নেশার বিষাক্ত জগৎ

নেশার বিষাক্ত জগতের নেপথ্যপটের মানচিত্র তথ্য দিয়ে আঁকতে গিয়ে প্রতিবেদক ড্রাগ—মহল্লার অনেক চমকপ্রদ অজানা কথা শুনিয়েছেন নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর সহায়তায়।

ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ভারতকে বে—আইনী নেশাদ্রব্য তথা ড্রাগের বৃহত্তম বন্দর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ড্রাগ মাফিয়ারা দেশের কতগুলি স্পর্শ-কাতর এলাকাকে নেশার ড্রাগ ও নারকোটিক্স বা তন্দ্রা উদ্রেককারী উত্তেজক ওষুধ পাচারের কেন্দ্র করে তুলেছে। আমাদের কয়েকটি সীমান্ত রাজ্য এবং সংলগ্ন প্রতিবেশী দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে ড্রাগ ব্যারনেরা তাদের বে—আইনী ও অমানবিক ব্যবসাকে সন্দেহাতীত-ভাবে রমরমা করে তুলেছে। মানবস্বার্থের পরিপন্থী নারকোটিক্সের ব্যবসা বর্তমানে এমন একটি স্তরে পৌঁছে গেছে যে, এর দৌরাত্ম্য আর বিষময় ফল আণবিক বোমার চেয়েও ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছে। ড্রাগের সর্বনাশা নেশায় আসক্ত করে শুধু ব্যক্তি ও সমাজ নয়, গোটা দেশকে পঙ্গু করে দেবার একটি আন্তর্জাতিক চক্র সর্বাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

শুধু বন্দর হিসাবে ব্যবহৃত হলে, বিশেষ কোন চিন্তার কারণ থাকত না। নেশার প্রতি আসক্তির ঘটনা দেশের প্রতিটি প্রান্তে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ড্রাগের সঙ্গে সমাজ বিরোধী ছাড়াও সম্পর্ক রয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও উগ্রপন্থীদের। নারকোটিক্স উগ্র-পন্থীদের আগ্নেয় অস্ত্র সংগ্রহের মাধ্যম। ড্রাগের মাধ্যমে অস্ত্র সংগ্রহ করে আতঙ্কবাদীরা একদিকে যেমন দেশের স্থিতি ও শান্তি বিঘ্নিত করছে অপর-দিকে তেমনি লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে ড্রাগাসক্তে পঙ্গু করে ফেলছে।

গত আশির দশকে ড্রাগের সর্বনাশা প্রভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। দেশের মহানগর ও নগরগুলিতেই নেশার ড্রাগের প্রভাব সীমাবদ্ধ নেই—সীমান্ত রাজ্য-গুলির মানুষের জীবন ড্রাগের ছোবলে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী ভারত গোল্ডেন ট্রাঙ্গল বা স্বর্ণ ত্রিভুজ ও সোনালি অর্ধচন্দ্র বা গোল্ডেন ক্রিসেন্ট দিয়ে পরিব্যাপ্ত। লাওস, বার্মা ও থাইল্যাণ্ডকে বলা হয় স্বর্ণ—ত্রিভুজ আর ইরান, আফগানিস্থান ও পাকিস্তানকে বলা হয় গোল্ডেন ক্রিসেন্ট বা সোনালি অর্ধচন্দ্র। এর অধিকাংশ দেশের সঙ্গে ভারতের সীমানা রয়েছে চব্বিশ হাজার কিলোমিটার। সীমান্তের বেশির ভাগ অংশই উন্মুক্ত এবং প্রাকৃতিক কারণেই যথা-যথভাবে সুরক্ষিত নয়। সীমান্তের ভৌগোলিক অবস্থান ড্রাগ মাফিয়াদের পক্ষে অনুকূল।

স্বর্ণ—ত্রিভুজের বড় অংশীদার বার্মার সঙ্গে আমা-দের সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় এক হাজার কিমিঃ আর সোনালি অর্ধচন্দ্রাকারের মধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সীমান্তের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৩০০ কিমিঃ। স্বর্ণ ত্রিভুজ আর সোনালি অর্ধচন্দ্রে উৎপন্ন ড্রাগ তথা নারকোটিক্স দীর্ঘ সীমান্তের চোরাপথ ধরে প্রতিদিন বে—আইনীভাবে ভারতে পাচার হচ্ছে। আর এখান থেকেই কোটি কোটি টাকা

ড্রাগ তৈরির ল্যাবরেটরি

মূল্যের নেশাদ্রব্য পশ্চিমী দেশগুলিতে গোপন পথে পাড়ি জমাচ্ছে। একই ধরনের চোরাপথ ধরে আমাদের দেশেও নেশাদ্রব্য ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে ড্রাগ মাফিয়াদের সম্পর্ক গভীর। ১৯৭৭ সালে স্বর্ণ-ত্রিভুজের ড্রাগ মহাজনেরা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লে-সোনালি অর্ধচন্দ্রের ড্রাগ ব্যবসায়ীদের পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা রমরমা হয়ে ওঠে। আফগানিস্তান, ইরান ও পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ এনে দেয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের ফলে সে দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ আফগানি পাকিস্তান ও ইরানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাস্তুচ্যুত আফগানেরা পাকিস্তানের উত্তরাংশকে ড্রাগ তৈরির আদর্শ স্থান হিসাবে বেছে নেয়। তারা আফিং থেকে অন্যান্য নেশাদ্রব্য তৈরির গোপন কারখানা স্থাপন করে। আর আফিং থেকে তৈরি কোটি কোটি টাকার ড্রাগ পশ্চিমী দেশগুলিতে চোরাপথে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৮০ সালে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন বৃদ্ধি পায় এবং উগ্রপন্থীরা পাঞ্জাবে তৎপর হয়ে ওঠে। দু'টি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা ও ইউরোপের কয়েকটি দেশ পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করে। মূলত পশ্চিমী দেশগুলির চাপেই পাকিস্তান ড্রাগ মাফিয়াদের উপর কঠোর নজর রাখতে শুরু করে এবং পশ্চিমী দেশগুলির চাপেই পাকিস্তান দেশের উত্তরাংশে পপি চাষ প্রায় বন্ধ করে দেয়। কিন্তু পাকিস্তানী নজরদারিতে ড্রাগ পাচারকারীরা বিন্দুমাত্র হতোদ্যম হয় না। পাকিস্তান সরকার করাচীর সামুদ্রিক বন্দর ও বিমান বন্দরে ড্রাগ-বিরোধী তৎপরতা চালালে-মাফিয়ারা নূতন পথের সন্ধান শুরু করে। তারা ভারত-পাক সীমান্ত রাজ্য রাজস্থানকে ড্রাগ চোরাচালানের বড় রকমের কেন্দ্র হিবে গড়ে তোলে। বর্তমানে বোম্বাই ড্রাগ পাচারের বড় ঘাঁটি।

১৯৮৪ সালে পাঞ্জাবে অপারেশন ব্লু-স্টারের পর ড্রাগ মাফিয়ারা তাদের গোপন আস্তানা পাঞ্জাব থেকে সরিয়ে রাজস্থানে নিয়ে যায়।

ভারত-নেপাল সীমান্ত দিয়ে প্রধানত নেপালী গাঁজা পাচার হয়। নেপালের ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে গাঁজার চাষ হয়ে থাকে। এই গাঁজা থেকে তৈরি হয় হাশিশ। আর সীমান্ত এলাকার চোরাপথ ধরে সেগুলি চলে আসে ভারতে।

ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের দেশে আফিং এর চাহিদা রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর প্রদেশের পপি উৎপাদন এলাকা থেকে আফিং-এর চাহিদা মেটানো হয়। সরকারি তথ্যে প্রকাশ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে পপি চাষের জন্য এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার লাইসেন্সধারী চাষী রয়েছেন। পপি থেকে আফিং এর শুদ্ধিকরণ হয় উত্তরপ্রদেশের গাজীপুর ও মধ্যপ্রদেশের নিমুচে।

ড্রাগের ব্যবসা রমরমা করে তুলতে বড় বড় ড্রাগ ব্যবসায়ীরা বেকার যুবক, মহিলা ও কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের কাজে লাগায়।

পয়সার লোভে শত শত বেকার, সুন্দরী মহিলা ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা বর্তমানে ড্রাগ বিক্রির চলমান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী ও মন্দসৌর এবং রাজস্থানের চিতোরে ড্রাগ মাফিয়ারা ড্রাগ পাচারে বেকার যুবকদের ব্যাপকহারে ব্যবহার করে চলেছে। রাজস্থানে মহিলা ও কুষ্ঠরোগীরা এই কাজে নিযুক্ত। রাজস্থানের চিতোর থেকে কলকাতার চিৎপুর পর্যন্ত একই ধারায় তা ছড়িয়ে পড়ছে।

ডায়রেক্টর অফ রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স সংক্ষেপে ডি.আর. আই. এর মতে এখন দেশের কোন বড় শহরই ড্রাগের ছোবল থেকে মুক্ত নয়। এর জালে আটকে পড়েছে ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে।

কিছুদিন পূর্বে সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (সি বি আই) আকস্মিকভাবে হানা দিয়ে তীর্থভূমি বারাণসী ও ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ শহরে দুটি গোপন ল্যাবরেটরি আবিষ্কার করেছে। হেরোইন তৈরির জন্য এই ল্যাবরেটরি দুটি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামে সজ্জিত ছিল। শিক্ষিত কেমিষ্ট ও বিজ্ঞানের ছাত্ররা ল্যাবরেটরিতে মানুষকে পঙ্গু করার এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল।

সি বি আই ও ডি আর আই ভ্রাম্যমান ল্যাবরেটরিও সন্ধান পেয়েছে। ভ্রাম্যমান ল্যাবরেটরিতে স্ম্যাক তৈরি হত। উত্তর প্রদেশের মীরাট ও হরিয়ানার শোনপাত থেকে ভ্রাম্যমান ল্যাবরেটরি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ড্রাগ মাফিয়ারা একদিকে যেমন অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বেকার যুবক-যুবতী ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের মাদকদ্রব্য বিক্রির কাজে লাগিয়েছে, অপরদিকে তেমনি শিক্ষিত কেমিষ্ট ও বিজ্ঞানের ছাত্রকে ড্রাগ তৈরির কাজে গোপন ল্যাবরেটরিতে নিযুক্ত রেখেছে।

আন্তর্জাতিক নারকোটিক্স নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বা ইন্টারন্যাশনাল ন্যারকোটিক্স কমফোর্ট বোর্ড তাদের সাম্প্রতিক বার্ষিক প্রতিবেদনে স্বীকার করেছে যে, মাফিয়ারা ভারতকে নেশার ড্রাগ সরবরাহের অন্যতম বৃহত্তম বন্দর হিসাবে ব্যবহার করছে। পশ্চিম এশিয়া থেকে ড্রাগ ভারতের মাটি ছুঁয়ে পশ্চিমী দেশগুলিতে পাচার হচ্ছে। আর সেই সুযোগেই একশ্রেণীর মাফিয়া দেশের অভ্যন্তরে নেশার ড্রাগের বে-আইনী ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

ড্রাগ মাফিয়াদের বাড়াবাড়িতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ চিন্তিত। বিশেষ করে উন্নত দেশগুলি ড্রাগের বৃহত্তম শিকার। ড্রাগের দুর্দৈবকে ঠেকাবার জন্য মার্কিন প্রশাসন প্রায় নয় হাজার মিলিয়ন ডলারের এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আমেরিকা ও ইউরোপের বহু দেশ আজ পারমাণবিক বোমাকে যত বেশি ভয় না পাচ্ছে, ড্রাগকে ভয় পাচ্ছে তার চেয়ে বেশি। এই ড্রাগ তিলে তিলে নূতন প্রজন্মকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

মানব জাতির এই সমূহ বিপদকে রাষ্ট্রসংঘ বা ইউনাইটেড নেশনস্ উপেক্ষা করতে পারেনি। রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে দূর প্রাচ্যের দেশগুলির নারকোটিক্স নিয়ন্ত্রণ বিভাগীয় কর্মকর্তা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির কর্মকর্তাদের সঙ্গে ড্রাগ পাচার বন্ধের জন্য যৌথ আলোচনার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভারতীয় প্রতিনিধিরা সেই যৌথ সম্মেলনে ভারতকে ড্রাগ পাচারের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন এবং প্রতিবেশী
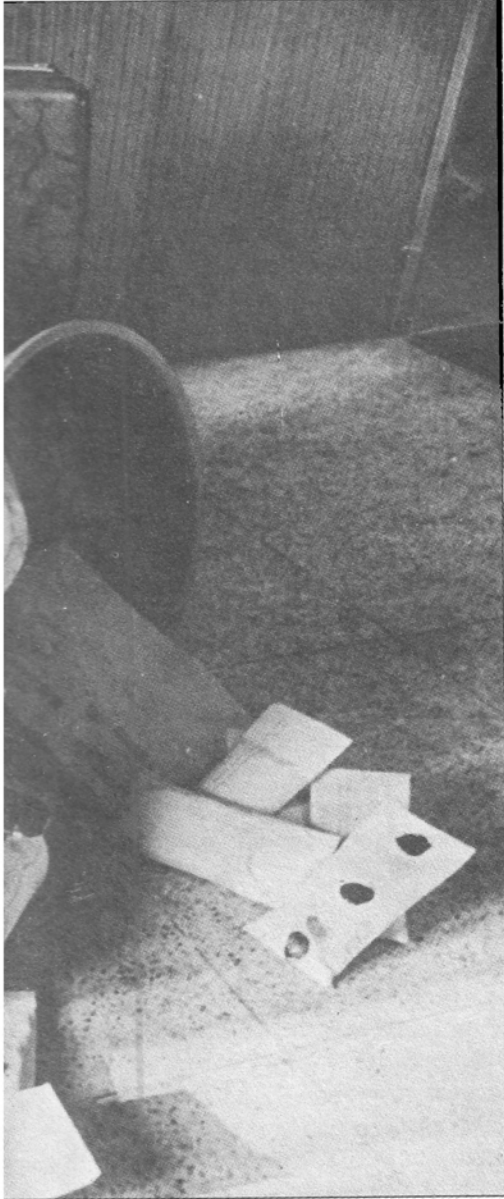
রাষ্ট্রগুলিকে ড্রাগবিরোধী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়েছিলেন।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারত আফিং রপ্তানীকারক দেশ। কিন্তু পাকিস্তান থেকে অধিকমাত্রায় আফিং ভারতে অনুপ্রবেশের ফলে আফিং–এর যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভারতীয় প্রতিনিধি ওই যৌথ সম্মেলনে একটি দলিল দাখিল করেছিলেন। সেই দলিল থেকে প্রমাণ হচ্ছে, ১৯৮০ সালে যেখানে ৪৯০ কেজি আফিং ধরা পড়েছিল–ঠিক তার পরের বছর বাজেয়াপ্তের পরিমাণ ছিল ১,৫৪০ কেজি। পরবর্তী বছরগুলিতে প্রায় একই হারে পাকিস্তান থেকে ভারতে আফিং পাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, যে পরিমাণ আফিং বাজেয়াপ্ত করা

> মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতে হেরোইন পাচারের মাত্রাও প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৮০ সালে বাজেয়াপ্ত হেরোইনের পরিমাণ ছিল মাত্র দেড় কেজি! ১৯৮৯ সালে সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েক হাজার কেজি।

হয়েছে–তার দশ থেকে পঁচিশ গুণ আফিং ভারতে পাচার করা হয়েছে। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের আশ্বাস সত্ত্বেও বে–আইনী আফিং পাচার এখনও সমানভাবে চলেছে।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে ভারতে হেরোইন পাচারের মাত্রাও প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৮০ সালে বাজেয়াপ্ত হেরোইনের পরিমাণ ছিল মাত্র দেড় কেজি! ১৯৮৯ সালে সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে কয়েক হাজার কেজি।

ভারতে পপি চাষের কথাও সেই যৌথ সম্মেলনে আলোচিত হয়েছিল। পপি চাষ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে ভারতের গৃহীত ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রসংঘের নারকোটিক্স সম্পর্কিত কমিশন মডেল হিসাবে গ্রহণ করেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতে পপি চাষ নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়েছিল ১৮৫৭ সালের ৬ই জুন। তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ১৮৫৭ সালে অপিয়াম অ্যাক্ট কার্যকর করেন। এই অ্যাক্টের মুখবন্ধে বলা হয়েছিল যে, পপি চাষ ও আফিং তৈরির প্রচলিত সরকারি ব্যবস্থাও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিহীন। এই অসঙ্গতি দূরীকরণের জন্যই এই আইন কার্যকর করা হয়েছিল। বে–আইনী পপি চাষ ও আফিং তৈরি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযোজ্য। ১৮৭৪ সালে এই অ্যাক্টকে সংশোধন

পুলিশের হেফাজতে নেশাদ্রব্য

করা হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৮ সালে সেই সংশোধিত আইনকে সংবিধানের ৩৭২ ধারা অনুযায়ী রক্ষা করা হচ্ছে।

অপিয়াম অ্যাক্ট ছাড়াও, ১৯৩০ সালে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার ডেঞ্জারাস ড্রাগ অ্যাক্ট উক্ত সালের ১লা মার্চ থেকে কার্যকর করেছিলেন। এই আইনের মাধ্যমে কতগুলি সাংঘাতিক ওষুধ বা ডেঞ্জারাস ড্রাগস কেন্দ্রিয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ আনার এবং এগুলির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে এই আইনকে কার্যকর করা হয়েছিল। যদিও পপি চাষ ও আফিং উৎপাদন ভারতে বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে–তবুও কোন সময়ে বে-আইনীভাবে আফিং পাচারের জন্য কোন দেশ বা রাষ্ট্রপুঞ্জ ভারতকে দোষারোপ করেনি। অর্থাৎ ভারতীয় আফিং দেশে অথবা বিদেশে কোনদিন কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনি।

স্বর্ণ ত্রিভুজ বা গোল্ডেন ট্রাঙ্গুলারে আফিং উৎপাদন নিয়ে পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও আমেরিকা ও বৃটিশ দু'দেশই মনে করে, পৃথিবীতে উৎপাদিত মোট আফিং এর ষাট থেকে আশি ভাগ একমাত্র বার্মাতে উৎপন্ন হয়। স্বর্ণ ত্রিভুজে আফিং উৎপাদনে বার্মার স্থান যেমন সর্বোচ্চ তেমনি সোনালি অর্ধচন্দ্রে পাকিস্তান সবচেয়ে বেশি আফিং উৎপাদন করে থাকে। পাকিস্তানে উৎপাদিত আফিং বেশির ভাগ পশ্চিমী দেশগুলির গোপন বাজারে চলে যায়।

আন্তর্জাতিক নারকোটিক্স কমিশনের মত অনুযায়ী বৃটেনের বাজারে আশি ভাগ আফিং পাকিস্তান থেকে পাচার হয়। গোল্ডেন ক্রিসেন্টে উৎপাদিত আফিং এর ৫২ ভাগ আমেরিকার বাজার দখল করে আছে। গোল্ডেন ট্রাঙ্গুলারে উৎপাদিত আফিং এর বিশ ভাগ এবং বাকি ল্যাটিন আমেরিকা, বিশেষ করে মেক্সিকো থেকে আমেরিকার বাজারে যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় আফিং পাচার প্রায় শূন্যের ঘরে। বরং সীমান্ত অতিক্রম করে অধিক মাত্রায় আফিং চোরাপথে ভারতের বাজারে প্রবেশ করায় আফিং এর অবৈধ কারবার প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

নারকোটিক্স ও ড্রাগাসক্তদের সংখ্যা যথাযথভাবে কেউ নিরূপণ করেনি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (ওয়ার্লড হেল্থ অরগানাইজেশন) ১৯৮৫ সালে একটা আনুমানিক হিসাব বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিল। ১৯৮৫ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছিল, গোটা পৃথিবীতে পঞ্চাশ মিলিয়ন ড্রাগাসক্ত রয়েছে। সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে পাঁচ বছরে ড্রাগাসক্তদের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে ১৯৮৫ সালে তা পৃথিবীতে ৩০ মিলিয়ন মানুষ মারিজুয়ানা আসক্ত। প্রায় আট মিলিয়ন মানুষ কোকেন অভ্যস্ত। সতেরো লক্ষ মানুষ আফিং খেয়ে হয়ে থাকে। প্রায় ৭০,০০০ মানুষ হেরোইন আসক্ত। বাকিরা অন্যান্য তন্দ্রাউদ্রেককারী উ[...] গ্রহণ করে। আমাদের নারকোটিক্স নিয়ন্ত্রণ স[...] মতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এই হিসাব এখন অপ্রচ[...] যে পরিমাণ নেশার ড্রাগ ধরা পড়ছে ত[...] আন্দাজ করা যায়, বিভিন্ন ড্রাগাসক্তদের একশ' মিলিয়ন অতিক্রম করে গেছে গত পাঁচ বছরে পৃথিবীতে ড্রাগাসক্তদের দ্বিগুণ হয়েছে।

ভারতে ড্রাগাসক্তদের নির্দিষ্ট হিসাব হিসাব করাও সম্ভব নয়। সরকারিভাবে মোটামুটি হিসাব করা হয়েছে। নির্ভর[...] হলেও, সহজেই বলা যায়, গোটা দেশে ড্রাগ[...] সংখ্যা প্রায় কুড়ি মিলিয়ন। এর মধ্যে বৃহ[...] গুলিতে ড্রাগাসক্তদের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ[...] স্থান সর্বোচ্চ তারপর বোম্বাই। কলকাত[...]

মিরাকল আই
এমনভাবে সেট করা—গভীর রাতে বাজে না

সময় জানায়
প্রতি ঘণ্টায় মনে করিয়ে দেয়
তাই সবাই নিশ্চিন্ত আর খুশী
ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় না।

প্রতি ১৫ মিনিটেঃ একবার ১/৪ মেলোডি শোনা যায়
প্রতি ৩০ মিনিটেঃ একবার ১/২ মেলোডি শোনা যায়
প্রতি ৪৫ মিনিটেঃ একবার ৩/৪ মেলোডি শোনা যায়
প্রতি ৬০ মিনিটেঃ পুরো মেলোডি ও ঘণ্টা-ধ্বনি শোনা যায়

ভারতে
মিউজিকাল ক্লক্স-এর
পথিকৃত
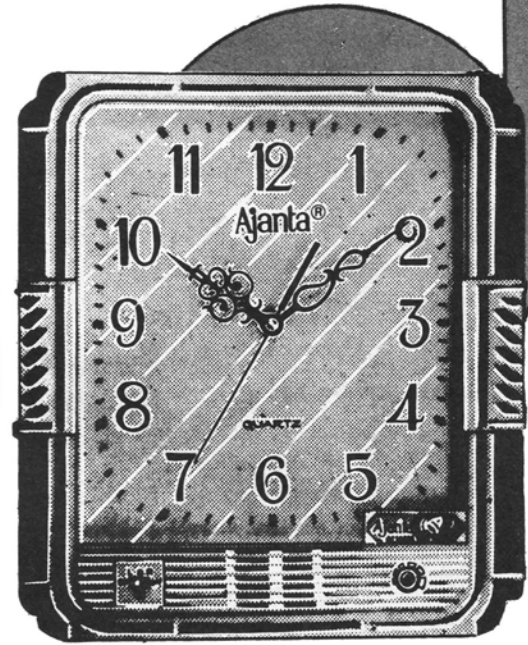
Ajanta®
QUARTZ
the touch of tomorrow's technology

রেজিস্টার্ড অফিসঃ
প্রুথ্ভিরাজ প্লট, পো. বক্স নং. ১১৫.
মোরভি ৩৬৩৬৪১
ফোনঃ ৩৬২৭, ২২৮০, ২৪৫৭, ২৪৩৩
টেলেক্সঃ ০১৬৮-২১২ ATCM
গ্রামঃ ভনিথা

KPS/AM/9-89/BEN

M207

M267

M227

M257

সমস্ত নামী দোকানে পাওয়া যায়
সতর্কীকরণঃ ঘড়ি-তে 'অজন্তা' ছাপটা দেখে নিন। নকল থেকে সাবধান থাকুন।

হ্যাশিশ সহ চোরা কারবারিরা

নেশায় আক্রান্তদের সংখ্যা সরকারিভাবে সত্তর হাজার বলা হলেও–বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন, মহানগরীতে ড্রাগাসক্তদের সংখ্যা লক্ষ অতিক্রম করে গেছে। একটি নির্ভুল ও সঠিক চিত্র তুলে ধরার বিশেষ কোন প্রয়াস এখনও নেওয়া হয়নি। তবে ড্রাগাসক্তদের সংখ্যা নিরূপণের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

রাজ্য হিসাবে মণিপুর ড্রাগের নেশায় সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছে। উত্তর–পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যই কম বেশি ড্রাগের ছোবলে আক্রান্ত। বার্মার সঙ্গে সীমান্ত ঘেঁষা মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ও মিজোরামে ড্রাগাসক্তদের সমস্যা রাজ্য সরকারের বড় রকমের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠেছে।

ড্রাগের ক্রমবর্ধমান সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রিয় সরকার কতগুলি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

নারকোটিক্স পাচার রোধের জন্য ১৯৭৮ সালের অপিয়াম অ্যাক্ট, ১৯১৪ সালের এক্সাইজ অ্যাক্ট, ১৯৩০ সালের ডেঞ্জারাস ড্রাগ অ্যাক্টস এবং ১৯৬২ সালে কাস্টম অ্যাক্ট্ অনুযায়ী এই সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবুও নেশার ড্রাগের অবাধ এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভব হয়নি। একদিকে চোরাচালান বন্ধের জন্য ব্যবস্থা যত নিশ্ছিদ্র করা হচ্ছে, অপরদিকে চোরাচালানীরা নিত্যনূতন ফন্দী ফিকিরের মাধ্যমে ভারতে নেশার ড্রাগের আমদানী বাড়িয়ে দিয়েছে।

আশির দশকের মাঝামাঝি নেশার ড্রাগের দৌরাত্ম্য এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায় যার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারকে আরও কঠিন আইন তৈরি করতে হয়। ১৯৮৫ সালের ২৮শে আগষ্ট লোকসভা নারকোটিক্স ড্রাগস্ এণ্ড সাইকোট্রপিক্স সাবস্ট্যানসেস্ অ্যাক্ট্ (এন.ডি.পি.এস. অ্যাক্ট্) পাশ করে।

১৯৬৬ সালে ড্রাগ অ্যাডিকশন্ বিষয়ে যে গোপালন কমিটি গঠন করা হয়েছিল–সেই কমিটির সুপারিশেই এই সর্বশেষ আইনটি লোকসভায় পাশ হয়। গোপালন কমিটি ড্রাগ অ্যাডিকশন্ মোকাবিলা করার জন্য একটি কেন্দ্রিয় আইন এবং ড্রাগ অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন।

১৯৮৫ সালের ১৪ই নভেম্বর এই আইন সারা দেশে কার্যকর হয়েছে। এই আইন কার্যকর হবার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৭৮ সালের অপিয়াম অ্যাক্ট এবং ১৯৩০ সালের ডেঞ্জারাস ড্রাগ অ্যাক্ট বাতিল হয়ে যায়।

এই নূতন আইনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই আইন অনুসারে ড্রাগ পাচারকারীকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক লক্ষ টাকা জরিমানার সংস্থান রয়েছে। প্রয়োজনে এবং অপরাধের মাত্রা বিচারে এই সাজা দশ বছর থেকে বাড়িয়ে কুড়ি বছর এবং জরিমানার পরিমাণ দ্বিগুণ করা যাবে। যদি কোন অপরাধী একই অপরাধ বারবার করে সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী পনেরো বছর সশ্রম কারাদণ্ডের সংস্থান আছে। এই কারাদণ্ড ত্রিশ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। এসব ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ দেড় লক্ষ থেকে বাড়িয়ে তিন লক্ষ টাকা করার ব্যবস্থা রয়েছে।

গাঁজা ও চরস চাষের ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার ব্যবস্থা রয়েছে। অপরাধের মাত্রা বিচারে কারাদণ্ড ও জরিমানা দ্বিগুণ করা যেতে পারে। এই আইন প্রয়োগের ঢালাও ক্ষমতা বিভিন্ন সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে।

এই আইন বলবৎ হবার পর থেকে চোরাই নেশার ড্রাগ বাজেয়াপ্তর মাত্রা বেড়ে গেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি একক ও যৌথভাবে গোপনস্থানে হানা দিয়ে গাঁজা, হেরোইন, মরফিন, ম্যান ডেক্স এবং কোকেন বাজেয়াপ্ত করেছে। কি আফিং বাজেয়াপ্তর মাত্রা কমে গেছে। ১৯৮ সালে বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে যেখানে বাই হাজার কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছিল, নূত আইন কার্যকর হবার পরেই, সেখানে ১৯৮ সালে গাঁজা বাজেয়াপ্তর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয় দাঁড়িয়েছে সাতচল্লিশ হাজার কেজি। ছয় হাজা কেজি হ্যাশিশের জায়গায় ১৯৮৬ সালে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল ১,৬৫০০ কেজি। ১৯৮৩ সাে মাত্র ১৩৯ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়ে ছিল। নূতন আইনে বলীয়ান হয়ে প্রয়োগকারী বিভিন্ন সংস্থা ২,৭০০ কেজি হেরোইন আটক করেছে। আটক নেশার ড্রাগের পরিমাণ দেখে

> গাঁজা ও চরস চাষের ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার ব্যবস্থা রয়েছে। অপরাধের মাত্রা বিচারে কারাদণ্ড ও জরিমানা দ্বিগুণ করা যেতে পারে।

মনে করা হচ্ছে, আইনের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করে ড্রাগ মাফিয়ারা চোরাই চালানের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে।

গত বছরে বাজেয়াপ্ত বিভিন্ন নেশার ড্রাগের মূল্য নিরূপণ করা হয়েছিল কয়েকশ কোটি টাকা। দিল্লির যমুনা নদীর তীরে বাজেয়াপ্ত হেরোইনে বার কয়েক সৎকার করা হয়েছে। সমস্ত বাজেয়াপ্ত ড্রাগ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কলকাতায় বাজেয়াপ্ত ত্রিশ কোটি টাকা মূল্যের নেশার ড্রাগ কোন একটি বড় ফ্যাকটরির বয়লারের গনগনে আগুনে ভস্ম করা হয়েছে।

ভারতে গাঁজার চাষ বর্তমান বছর থেকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হবে। পূর্বতন সরকারের এই সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রীয় মোর্চা সরকার কার্যকর করবেন কি না–তা জানা নেই। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে দেশে গাঁজার চাষের পরিমাণ অবশ্যই হ্রাস পেয়েছে। তবে মেঘালয়ের কয়েকটি অঞ্চলে বে-আইনী গাঁজা চাষ চলেছে। সাধারণত নেপাল থেকেই গাঁজা চোরাপথে ভারতে চালান হয়ে থাকে। নেপালে গাঁজার চাষের উপর নিয়ন্ত্রণ না আনলে ভারতে গাঁজার চাষ নিষিদ্ধ করে আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে হয়ত বন্ধ করা যাবে–কিন্তু চোরাই চালান অবশ্যই বেড়ে যাবে।

আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে গোপন পথে আসে হ্যাশিশ। এগুলি পাঞ্জাব, রাজস্থান ও কচ্ছ সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। নূতন আইন

৯৬ পৃষ্ঠায় দেখুন

কাঁচের পৃথিবী

আরিজোনা–তে প্রস্তাবিত কাঁচের পৃথিবী

বায়োস্ফীয়ারে থাকবেন এঁদের মধ্যে একজন

সম্পূর্ণ কাঁচে মোড়া একটি পৃথিবীর প্রতিরূপ গড়ে তোলা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনায়। আগামী ১৯৯২ সাল অবধি এর মধ্যে বাস করবেন একদল মানুষ, একদল বিজ্ঞানী। কি হবে সেই কাঁচমহলের স্বরূপ, সে বিষয়ে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ।

সম্পূর্ণ কাঁচ দিয়ে আচ্ছাদিত একটি মিনি–পৃথিবী গড়ে তাতে ১৯৯২ সাল অবধি কাটাবেন কিছু বিজ্ঞানী। অবশ্যই রহস্যময় এবং পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য। কিন্তু বড় রহস্যময় এবং অনিশ্চিত এই পরিকল্পনা। ভীষণ কৌতূহলোদ্দীপকও। শেষপর্যন্ত কি হবে কে জানে!...

পরিকল্পনাটি বাস্তবিকই দুঃসাহসিক। আরিজোনার একটা অঞ্চলে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে গড়ে তুলতে চলেছেন অন্য আরেকটা পৃথিবী। আড়াই একর–ব্যাপী কাঁচে মোড়া সেই পৃথিবীর সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কোনো যোগাযোগই থাকবে না। নিশ্ছিদ্র নীরন্ধ্র সেই পৃথিবী হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রকৃতির সমস্ত উপাদানই থাকবে সেখানে। বাতাস, মেঘ, বৃষ্টি–সব। একটা পাহাড় থাকবে, ৬০ ফুট উঁচু গাছ, প্রবাল প্রাচীর ও তরঙ্গসমৃদ্ধ একটি সাগরও থাকবে। আরো থাকবে ছাগল, শুওর, পাখি, মৌমাছি, বাদুড়, ব্যাঙ, পতঙ্গ, প্রজাপতি, মাছ, হরিণ এবং মানুষ। ১৯৯০–এর সেপ্টেম্বর মাসের কোনো একটা দিনে সেই পৃথিবীর মধ্যে চারজন পুরুষ ও চারজন মহিলা প্রবেশ করে বন্ধ করে দেবেন 'এয়ারলক'। ওরা সবাই বিজ্ঞানী। দু'বছর থাকবেন ওই রুদ্ধ পৃথিবীতে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বলতে থাকবে শুধু সূর্যালোক এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান–প্রদানের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হবে এটি।

ঐ পৃথিবীটির নাম দেওয়া হয়েছে 'বায়োস্ফীয়ার টু'। আমাদের এই পৃথিবীকে ধরা হয় বায়ো-স্ফীয়ার–১ হিসেবে। পুরো প্রোজেক্টটির পেছনে খরচ ধরা হয়েছে ৩৩ মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ প্রায় ৫৬ কোটি টাকা। আমেরিকারই একটি ধনী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী টাকাটা দিচ্ছেন। ঐ পৃথিবীর মধ্যে বাতাস, জল ও শরীরের বর্জ্যপদার্থ সবকিছু পুনর্ব্যবহৃত হবে। এবং জীবনচক্র যেভাবে ভার-সাম্যের সঙ্গে আবর্তিত হয়, সেখানেও তাই করা হবে। এই যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য, তার একটু এদিক ওদিক হলেই সর্বনাশ। সর্বত্রই এই পৃথিবী-তেও তো তাই অনেকে পরিকল্পনাটিকে কিছু টাকা-ওয়ালা লোকের খামখেয়ালীপনা বলে নাক সিঁট-কাচ্ছেন, কিন্তু কয়েকজন খ্যাতনামা মার্কিনী-বিজ্ঞানী এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আগ্রহী এবং সরাসরি যুক্ত–অতএব, জিনিসটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বায়োস্ফীয়ার–টু এর পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে মহাশূন্যে বসবাসের একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা তৈরি হবে। যে ব্যবসায়ী

টাকা দিচ্ছেন, তিনি নিশ্চিত যে, পরে তার টাকা ঠিক উঠে আসবে। 'নাসা'র হয়ে মহাশূন্যে বিশ্রামাগার তৈরি, পৃথিবীর ক্রমক্ষীয়মাণ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের প্রভূত রোজগার হবে।

আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ–গবেষণা ল্যাবরেটরির ডিরেকটর কার্ল হজস পরিকল্পনাটিতে অংশ নিচ্ছেন। তাঁর মতে, বায়োস্ফীয়ার–টু যদি মানুষকে এই পৃথিবী সম্পর্কে বুঝতে শেখায়, ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে ভাবতে সাহায্য করে, তাহলে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় সাফল্য এবং সর্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রোজেক্‌ট হয়ে উঠবে এটি। আমরা প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে বিপদের মধ্যে আছি। অ্যাসিড–বৃষ্টি, দূষিত বাতাস, বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস বিপজ্জনক হারে বেড়ে চলেছে। বায়োস্ফীয়ার–টু'র এই যে সব নতুনভাবে শুরুর অভিজ্ঞতা, সেটাই কাজে লেগে যাবে আমাদের।

ইতিমধ্যে প্রোজেক্‌টটি তৈরি করতে,গিয়ে কতরকম সব অভিনব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। ছোট্ট উদাহরণ, একজোড়া ছোট্ট হামিং–বার্ড–কে বাঁচিয়ে রাখতে কমপক্ষে কতগুলো ফুলের দরকার ? উত্তর ৩,২০০ ! সমুদ্রের গভীরতা কত ? বায়োস্ফীয়ার–টু'এর ক্ষেত্রে এর উত্তর, ৩৫ ফুট ! আকাশ কত উঁচু ? উত্তর ৮৫ ফুট (অবশ্যই বায়োস্ফীয়ার–২' এর আকাশ)। কানাডাবাসী বিজ্ঞানী যিনি এই প্রোজেক্‌টের ডিরেক্‌টর, মার্গারেট অগাস্টিন মন্তব্য করেছেন, 'এক অবিশ্বাস্য আবিষ্কারের দিকে পা বাড়াতে চলেছি আমরা।' জীবন–বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ঘটনা বিপ্লব সৃষ্টি করবে। আমেরিকার এয়ার ফোর্সের জন্য 'ক্লোজ ইকল্যাজিক্যাল সিস্টেম' নিয়ে গবেষণারত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী উইলিয়াম অসওয়াল্ডও পরিকল্পনাটির ব্যাপারে গভীর উৎসাহ প্রকাশ করেছেন।

এই মুহূর্তে তেরোজন 'বায়োনট' (অ্যাস্ট্রোনট-এর মতো, আর কি) আরিজোনায় এই মিনি–পৃথিবী তৈরির কাজে ব্যস্ত, এঁদের মধ্যে দুজন ব্রিটিশ। ওঁরা আটজন থাকার জন্য আটটি বার্থ বানাচ্ছেন। ঐ রুদ্ধ ও বদ্ধ পৃথিবীতে কিন্তু জীবনযাপন মোটেই নিস্তেজ বা এক ঘেয়ে হবে না। আটজন অধিবাসী ওখানে দু'বছর ধরে প্রায় সবসময় ব্যস্ত থাকবেন নানাবিধ পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার কাজে। ৫,০০০ টি ইলেকট্রনিক সেন্সর, কম্প্যুটারের মাধ্যমে ডেটা রেকর্ড করে যাবে। ওখানকার ফার্মে পালন করা হবে আফ্রিকান পিগমি ছাগল, ভিয়েতনামের শুওর, দক্ষিণ আমেরিকার মুরগি, আফ্রিকান মাছ তিলাপিয়া। সেখানে রোপন করা হবে ১০০ রকমের শষ্য ও সব্জী, যেমন গম, ধান, সয়াবীন, আলু, ফলমূল ইত্যাদি। কীটনাশক সেখানে নিষিদ্ধ। বদলে ব্যবহৃত হবে প্রকৃতির নিজস্ব খাদ্য-খাদক চক্রের মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষার পদ্ধতি। যেমন আলুর পোকা দূর করতে থাকবে অরেকজাতের পোকা, যারা আলুর পোকা খেয়ে ফেলে। আটজন অধিবাসী রোজ গ্রহণ করবেন মাথা পিছু ২,৩৬৪ ক্যালোরি। দুটি কফি গাছ থেকে প্রায় দুকেজি মত কফি উৎপাদিত হবে, তাতে ওঁদের বছর দুয়েক চলে যাবে। মদের জন্য থাকবে দ্রাক্ষার বাগান। আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিস্ট পিটার ওয়ারশাল এই প্রোজেকটের অন্যতম কনসালট্যান্ট। তিনিও উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে গেছেন। অধিবাসীদের জন্য থাকবে একেকজনের এককটি অ্যাপার্টমেন্ট, ওরা অবসর সময়ে বীচে শুয়ে থাকবেন, সমুদ্রে সাঁতার কাটবেন, মরুভূমিতে ক্যাম্প করবেন। ইউ এস জিওলজিক্যাল সার্ভের কর্মী টনি বার্জেস মন্তব্য করেছেন, 'ওঁরা যদি ক্লান্ত ও বিরক্ত বোধ করেন, তাহলে আমাদের সব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। ঐ মিনি–পৃথিবীটিকে আমরা কোনোমতেই নীরস ল্যাবরেটরি বানিয়ে তুলতে চাইছি না।'

বায়োস্ফীয়ার–টু আচ্ছাদিত থাকবে কাঁচের এক উঁচু বিশাল চাঁদোয়ায়। ভেতরে জল ও স্থলভাগ থাকবে সমান সমান। সেখানে ধূমপান নিষিদ্ধ। আলো, উত্তাপ ও আর্দ্রতা যথাযথ মাত্রায় বজায় রাখার জন্য প্রকৃতিক পাঁচটি উপাদানও যথাযথ অনুপাতে সেখানে রাখা হবে–বন, প্রান্তর, জলাভূমি, মরুভূমি এবং সমুদ্র। এগুলি এমনভাবে অবস্থিত থাকবে যাতে সমুদ্র ও জলাভূমি থেকে আর্দ্রতাবাহী গরম বাতাস মরুভূমির থেকে ক্রমশ এগিয়ে যাবে জঙ্গলের দিকে, সেখানে ঠাণ্ডা হয়ে তৈরি করবে মেঘ, হবে বৃষ্টি। গাছপালা থেকে উৎসারিত হবে অক্সিজেন, আর কার্বন–ডাই অক্সাইড গ্যাস শুষে নেবে ঐ গাছপালারই। অধিবাসীদের শরীরের বর্জ্যপদার্থগুলি ফার্মে সারের কাজ করবে, শৈবাল, ব্যাকটিরিয়া, জলজ উদ্ভিদগুলিও ঐ সারে পুষ্ট হবে, পরিবর্তে সেগুলি রুপান্তরিত হবে মাছের খাদ্যে।

অতএব, ভেতরের অধিবাসীদের ভেবে চিন্তে চলতে হবে খুব। কীটপতঙ্গের সংখ্যার অনুপাতিক হারের ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটলে শস্যের ক্ষতি হবে। আবার পাখিদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকলে কীটপতঙ্গ সব খেয়ে নেবে তারা, তখন আবার উপকারী কীটপতঙ্গের অভাবে শস্যের ক্ষতি। তার মানে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে খাদ্যখাদকের অনুপাতটা ঠিক আছে কিনা।

বিশেষজ্ঞরা এই মিনি–পৃথিবীর নক্সা, গঠন, বিন্যাস সবকিছুই হবহু বাইরের প্রকৃতির মত করে গড়ে তুলছেন। সেখানে থাকবে ১,০০০ প্রজাতির উদ্ভিদ, ১,৩০০ প্রজাতির পশুপাখি, ৭০০ রকমের শৈবাল, ৩০ রকমের ছত্রাক, এবং আরো বহুকিছু। মরুভূমি বানানোর দায়িত্ব রয়েছে টনি বার্জেসের ওপর। কিউ গার্ডেনস–এর ডিরেকটর গিলিয়ান প্র্যান্স বানাচ্ছেন বনজঙ্গল। মিঃ প্র্যান্স জানিয়েছেন, বনে ২৫০ ধরনের গাছপালা থাকবে,

কাঁচের নকল পৃথিবীর প্রস্তাবিত বাসিন্দারা

থাকবে প্রায় ১,৩০০ প্রকারের জন্তু জানোয়ার

যে সব গাছপালা রাখা হবে এই নকল পৃথিবীতে

বেশিরভাগই অধিবাসীদের কাজে লাগবে, যেমন কলা, কোকো, পেঁপে, পেয়ারা, আতা ইত্যাদি। ব্রাজিলের বাদামগাছ রাখার কথা ভাবা হয়েছিল, ওটা ১৫০ ফুট উঁচু হয় বলে শেষ অবধি বাদ দেওয়া হয়েছে। রুক্ষ প্রান্তরের নক্সা ও বিন্যাস এবং নির্মাণের কাজটা করছেন পিটার ওয়ারশাল। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, সবকিছুই নিচ্ছি, এখান থেকে কিছু ওখান থেকে কিছু। পুরো জীবচক্রটাকে চালু রাখতে হবে তো। আর, প্রকৃতির পুরো ব্যাপারটি এত জটিল, কেউ এর রহস্য সম্পূর্ণ উন্মোচন করতে পারে না। বায়োস্ফীয়ারের জঙ্গলে থাকবে মাউস ডিয়ার (এশিয়ার প্রাণী এটি), থাকবে অ্যাফ্রিকান প্রাণী গ্যালিগো, তিনজাতের সাপ, নানাধরণের কচ্ছপ, ব্যাঙ টিকটিকি ইত্যাদি।

বিশেষজ্ঞরা শুধু অধিবাসী লোকজন পশুপাখি কীটপতঙ্গের ওপর ঐ রুদ্ধ পৃথিবীতে বসবাসের প্রতিক্রিয়াই পর্যবেক্ষণ করবেন না, তাঁরা উল্টোটাও লক্ষ্য করবেন সতর্কভাবে। অর্থ্যাৎ, পরিবেশ, আবহাওয়া ইত্যাদির প্রতিক্রিয়াও হবে তাঁদের বিচার্য বিষয়। লন্ডনবাসী স্যালি সিলভারস্টোন হচ্ছেন স্থাপত্য ও নক্সার ম্যানেজার, আর অপর ব্রিটিশ সহযোগী জেন পয়েন্টার হচ্ছেন ২৫০ কীটপতঙ্গ সম্বলিত ল্যাবরেটরির ম্যানেজার। কীট-পতঙ্গগুলির জন্য খুঁটিয়ে খাদ্য–শৃঙ্খলার ব্যাপারটি দেখে নিতে হচ্ছে। এসব পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে বহু তথ্য জানা যাচ্ছে, যেমন একটা 'গ্যালিগো'-এর জন্য রোজ লাগে ৩০ গ্রাম ঝিঁঝিঁপোকা, একটু ফল।

১৩ জন বিজ্ঞানী গবেষকদের দুজন ব্রিটিশ, সাতজন আমেরিকান, দুজন জার্মান, একজন অস্ট্রেলিয়ান, একজন বেলজিয়ান। এঁদের মধ্যে কোন আটজন শেষপর্যন্ত বায়োস্ফীয়ারে ঢোকার জন্য নির্বাচিত হবেন, এখনো ঠিক হয়নি। তবে বাকি পাঁচজন কিন্তু প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত থেকে যাবেনই।

সন্দেহের নিরসন হয়নি পুরোপুরি! শেষপর্যন্ত বায়োস্ফীয়ারের পরিকল্পনা সফলভাবে কার্যকর করা যাবে কিনা, অনেকেই নিশ্চিত নন। 'নাসা'র জনৈক মুখপাত্র জেমস ব্রেট কিছু সমস্যার কথা বলেছেন, যেমন এর জটিলতা, এর বিশাল আকৃতি ইত্যাদি। তবে প্রোজেক্টি সফল বা ব্যর্থ যাই হোক না কেন, বিজ্ঞানীরা কিছু মূল্যবান অভিজ্ঞতা অন্তত লাভ করবেন। সবচেয়ে ভালো কথাটি বলেছেন মার্গারেট অগাস্টিন, তিনি বলেছেন–দু'বছর পর আমরা যখন বেরিয়ে আসবো, হয়তো আমাদের সঙ্গে থাকবে ছোট্ট একটি শিশু, পৃথিবীর প্রথম 'বায়োস্ফীরিয়ান'।

ডারমট পারগেভিয়ে

ছবি : আখতার হুসেন

কমল বসু:
কলকাতার মেয়রের ব্যক্তিগত কথা
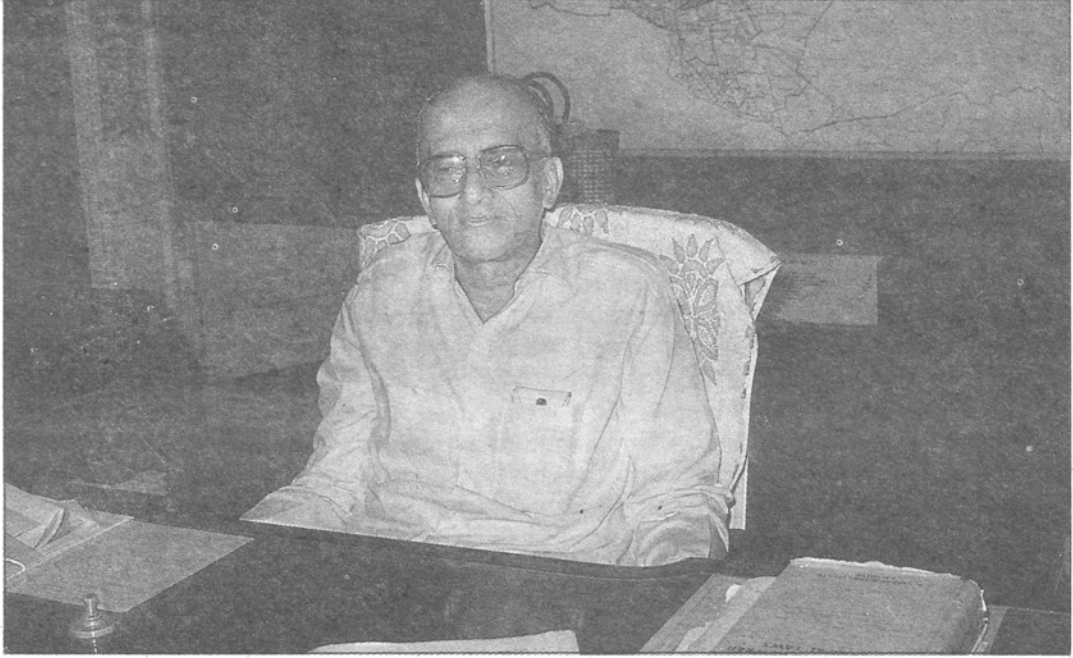
কমল বসু, নিজের চেয়ারে

ছবি : বিকাশ চক্রবর্তী

একসময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে আসনে বসতেন সেখানে এখন আসীন কলকাতার মেয়র কমল বসু। সংবাদ মাধ্যমে নানা বিতর্কের জালে ফেঁসে যাওয়া প্রকৃত মানুষটি আসলে কেমন? এখানে কমল বসুর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার শেষে এই প্রতিবেদনে পেশ করা হয়েছে ওই বিতর্কিত মানুষটির অতি ব্যক্তিগত রূপটি।

দু পাশে টেলিফোন। সামনে অজস্র ফাইলের সারি। ক্রমাগত পদস্থ কর্মীদের আসা যাওয়া। মাঝে মাঝেই টেলিফোনের ঝনঝনানি। কিছুক্ষণ পরপরই কাগজপত্র নিয়ে ছুটে আসছেন ব্যক্তিগত সহকারী। বিশাল টেবিলের ওপাশে বসে যে সৌম্য চেহারার মানুষটি একের পর এক ফাইলে সই করে চলেছেন, একটার পর একটা রিসিভ করে চলেছেন টেলিফোন, সেই সৌম্য চেহারার মানুষটিই যে সম্প্রতি বিতর্কের শিরোনাম হয়ে উঠেছেন খবরের কাগজের পাতায়—বাইরে থেকে তা কিন্তু একবিন্দু বোঝার উপায় নেই। তিনি কেবল বলেছেন, 'কে কি বলল তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি শুধু কাজ করে যেতে চাই।' বলতে বলতেই আবার টেলিফোনের ঝনঝনানি। হাত বাড়িয়ে রঙিন টেলিফোন তুলে সেই সৌম্য চেহারার মানুষটি বলে উঠলেন, 'আমি কমল বসু—কলকাতা কর্পোরেশানের মেয়র কথা বলছি।' কথা শেষ করেই রিসিভার রেখে কাগজে চোখ বুলিয়ে নেওয়া। তারপর ফাইল নিয়ে আবার ব্যস্ততা।

মেয়র কমল বসুকে নিয়ে এর আগেই বির্তক হয়েছিল, সেই জল জুড়োতে না জুড়োতে আবার নিউ মার্কেটে নব নির্মিত স্টল বিলি নিয়ে কারচুপির অভিযোগ। এবং কারচুপির অভিযোগ করেছেন সি পি আই এম সম্পাদক বিমান বসু। বিমান বসুর অভিযোগে টনক নড়ে উঠেছিল তামাম প্রশাসনের। এমন কি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নির্দেশ দিয়েছিলেন তদন্ত করার জন্য। বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু কমল বসু একটুও উত্তেজিত না হয়ে বলেছেন, আমি শুধু কাজ করে যেতে চাই। সাংবাদিক, বিরোধী পক্ষের প্রশ্ন বাণে জর্জরিত মেয়র জানিয়েছেন, তাদের মত তিনিও অভিযোগের সত্যতা প্রমাণে সমান আগ্রহী।

এই বহু আলোচিত কলকাতা কর্পোরেশানের মেয়র কমল বসু সর্বদাই সংবাদ শিরোনামে জায়গা করে নেবার সুবাদে ইতিমধ্যেই রূপান্তরিত হয়েছেন প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে। এ হেন কলকাতা কর্পোরেশানের মেয়র কমল বসুর জীবন কাহিনী নিশ্চয়ই তার জমকালো কেরিয়ারের মত সমান আকর্ষণ সৃষ্টিকারী। সেই জীবন কাহিনী জানতে ছুটে গিয়েছিলাম তাঁর কর্পোরেশানের অফিসে। ব্যস্ততার ফাঁকেও কমলবাবু আমাদের সময় দিলেন অনেকক্ষণ। সামনে বাজেট। তবু কমলবাবু একে একে পরতে পরতে খুলে দিতে লাগলেন তাঁর অতীতের বৃত্তান্তের ধারাবাহিকতা।

'আমার জন্ম ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসে। অবিভক্ত বাংলার হুগলী জেলার রাধানগরে। বাবার নাম গিরীন্দ্র নাথ বসু। মা মলিনা বসু। আমরা কলকাতার একেবারে আদি বাসিন্দা। আমার পিতামহরা একশো বছরেরও বেশি এই শহরে রয়েছেন। পিতামহ ছিলেন ভূপেন্দ্র নাথ বসু। সেই সময়কার বিখ্যাত মানুষ। ভূপেন্দ্র নাথ বসুর নামে শ্যামবাজার-সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর রাস্তা রয়েছে।'

গিরীন্দ্র বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে পাশ করে ফিরে এসে ব্যারিস্টারি শুরু করেন। দু বছর প্র্যাকটিস করার পর হঠাৎ বসু পরিবারে নেমে এল বিপর্যয়। গিরীন্দ্র নাথ মারা গেলেন। সনটি ১৯২২, আগস্ট মাস। আজকের কমল বসুর বয়স তখন সাড়ে তিন বছর। দিদি অরুণাকে নিয়ে এবং শিশু কমলকে নিয়ে মলিনা পড়লেন অথৈ জলে। জীবনের শুরুতেই অগ্নি পরীক্ষা। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবার বলে বিপদটা তত ভয়ংকর হতে পারল না। বিশাল পরিবার। রোজ দুশো লোকের পাত পড়ত। ভূপেন্দ্ররা ছিলেন তিন ভাই। তাদের উত্তরসূরীরা জমজমাট করে রেখেছিলেন বসু পরিবার। সুতরাং শিশু কমল বাবার অভাব তেমন করে বুঝতে পারেননি। পরে, অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে তাঁদের পরিবার ভাগ হয়ে যায়।

শিশু কমলকে ভর্তি করে দেওয়া হয় টাউন স্কুলে। ১৯৩৫ সালে। টাউন স্কুলের পড়াশুনো

সস্ত্রীক মেয়র ছবি : গোপাল দেবনাথ

শেষে স্কুল ফাইনাল পাশ করলেন। বাড়িতে সবসময়ই খেলাধূলার পরিবেশ ছিল। জেবা ছিলেন ভারত বিখ্যাত ফুটবল ক্লাব মোহন বাগানের প্রতিষ্ঠাতা। সুতরাং কলকাতার খেলাধূলার সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল নিবিড়। খেলাধূলার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনোও চলতে লাগল। ১৯৩৯ সালে স্নাতক হলেন স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে। ১৯৪১ এ এম.এ. পাশ করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিষয় ইকনোমিক্স ও পলিটিক্যাল সায়েন্স। তারপর ভর্তি হলেন আইন কলেজে। কিন্তু পুরো শেষ করতে পারলেন না। ততদিনে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে গেছে। তার মাঝে পড়াশুনো। ১৯৪৯-এ কলকাতার হাইকোর্টে অ্যাটর্নি হিসেবে শুরু করলেন প্র্যাকটিস।

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের সূত্রে তিনি জড়িয়ে পড়লেন বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে। পার্টির সংগঠনের কাজে সময় দেবার দরুন অ্যাটর্নির পরীক্ষায় বসা হল না। পার্টির কাজে যেতে হল পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। তখন কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি। এদেশের বুকে শুরু হয়ে গেছে বীজ রোপণের পালা। অগ্নিবর্ষণাক্রান্ত দিনে বসু পরিবারের সেই যুবকটি যোগাযোগ রাখতে শুরু করলেন নেতাদের সঙ্গে।

সাল ১৯৪২। কিছুদিন আগে কমিউনিস্ট পার্টি আইনত স্বীকৃতি পেয়েছে। ততদিনে কমল বসু দলের সক্রিয় কর্মীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। ওই বছরই পদ পেয়েছেন পার্টির সদস্য। পার্টির আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়মিত কমসূচীতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলে পরিচয়ের পরিধি বেড়ে যেতে থাকে। নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত ওঠাবসা চলে। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৮, এই পাঁচ বছর ছাত্র আন্দোলন, সংগঠনের কাজে নিজেকে ঢেলে দেন। সেইসঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। একেবারে জোরদার রাজনৈতিক আন্দোলন। টাউন স্কুলের সেই ছাত্রটি রূপান্তরিত হলেন এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে। তাঁর জীবন উৎসর্গ করে দিলেন রাজনীতিতে। নিয়মিত যোগাযোগ ঘটতে লাগল নানা বামপন্থী নেতাদের সঙ্গে।

১৯৪৮ সাল। কমিউনিস্ট পার্টির তখন দারুণ দুঃসময়। ভারত সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করলেন পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে রুজু হল একাধিক মামলা মামলায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পার্টি কমল বসু তখন আইনের বই হাতে রেহাই খুঁজছেন সময় দিয়েছেন মামলার। সেইসময় তাঁকে জেলবন্দী নেতাদের সাক্ষাৎকার নিতে জেলে যেতে হত পার্টির কাজের জন্য বক্সারে পর্যন্ত গিয়েছিলেন তিনি।

সে বড় ভয়ানক দিন, বিপর্যয়ের দিন। পায়ের নিচে আগুন ঝরা পথ। ত্যাগ তিতিক্ষা আর সহিষ্ণুতায় কমিউনিস্ট পার্টির পথ চলা এগিয়ে যেতে লাগল। পুলিশ পিছনে লেগেছে।। বসু পরিবারের বাড়ি সার্চ করল তারা। কমিউনিস্ট সন্দেহে এক টুকরো কাগজকেও রেহাই দিল না পুলিশ। সব মিলিয়ে ভয়ংকর বিপর্যয় নেমে এল কমিউনিস্ট পার্টিতে তবু কঠোর কঠিন পার্টি কর্মীরা। যে করেই হোক এই বিপর্যয় রোধ করতে হবে। তার জন্য র ঘাম ঝরাতে পার্টির কর্মীরা পিছপা নন। পিছু নন পার্টির কর্মী কমল বসুও।

জেলে বন্দী পার্টির নেতা প্রমোদ দাশগু কাকাবাবু মুজফ্ফর আহমেদ, হরেকৃষ্ণ কোঙা সঙ্গে পার্টির পক্ষ থেকে নিয়মিত সাক্ষাৎ নেওয়া, আন্ডার গ্রাউন্ডে পার্টি রাজনীতি একাধিক মামলা চালানো, কমল বসুর রাজনৈ ভিত্তি মজবুত হচ্ছিল এইসবের মাধ্যমে দিনের রাজনীতি করা কমল বসু ততদিনে রিত হয়েছেন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বে।

এল বাহান্ন সাল। কমল বসু মনোনয়ন সংসদের নির্বাচনে। ডায়মণ্ডহারবারে প্রার্থী দাঁড়িয়ে নির্বাচিত হয়ে পাড়ি দিলেন তারপরের বার কিন্তু জিততে পারলেন না হলেন পাঁচশো ভোটে। হেরে গেলেও তাঁ পড়েছিল আড়াই লাখ ভোট। আবার ফিরে অ্যাটর্নির পেশায়। সেখানে বড় ব্যস্ত কাটতে লাগল। পাশাপাশি পার্টির সঙ্গে কিন্তু অটুট রইল। পার্টির মামলা তদারকে থাকল তাঁর হাতে।

এইভাবেই বছরগুলো কেটে যাচ্ছিল হিসেবে পশার জমছিল। অন্যদিকে প সম্পর্ক নিবিড় থেকে নিবিড়তর হতে ১৯৭৭ সালে সল্টলেক স্টেডিয়াম তৈ যে কমিটির সৃষ্টি হয়েছিল, সেই কমি ছিলেন কমল বসু। সেই স্টেডিয়ামের সকলের মুখে মুখে ফেরে।

এরপর এল পার্টির সঙ্গে সরাস রাখার আহ্বান। প্রয়াত সরোজ জ্যোতি বসু জানালেন তাঁকে দায়িত্ব

প শ্চা দ প ট

এই আহ্বান আর ফেরাতে পারলেন না কমলবাবু। সরোজবাবু, জ্যোতিবাবুর কথায় দায়িত্ব নিলেন। এতে অ্যাটর্নি পেশার ক্ষতি হল ঠিকই, তবু তা হাসিমুখেই স্বীকার করে নিলেন কমলবাবু। তারপর থেকে শুরু হল এগিয়ে যাওয়া।

কথায় বলে, কিছু কাজ করতে গেলে বিতর্ক হবেই। কেউ বলবেন ভাল, কেউ বলবেন মন্দ। যারা কাজ করেন, তাঁদের এসবে আগ্রহ দেখাতে নেই। কমলবাবু তো সরাসরিই বলেছেন, আমি শুধু কাজ করে যেতে চাই। এর আগে রডন স্কোয়ার নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। এবার নিউ মার্কেটের স্টল বন্টন নিয়ে। তবু কলকাতার মেয়র অকুতোভয়। তিনি কোন ভুল করেন নি, জানিয়েছেন কমল বসু।

কমলবাবু বিয়ে করেছেন বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবারের মেয়ে শান্তাকে। বছরটি ছিল উনিশশো পঁয়তাল্লিশ। এম.এ. পাশ করা শান্তা লেখালেখি করেন। সেইসঙ্গে বেশ কিছু সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত। কমল শান্তার একমাত্র ছেলে শান্তনু রয়েছেন আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোতে। রিসার্চ ফেলো শান্তনু বিয়ে করেছেন আর্জেন্টিনার মেয়েকে। তিনিও রিসার্চ ফেলো। বসু পরিবারের ঐতিহ্যও বহুদিনের। ভূপেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন এই পরিবারের নামজাদা মানুষ। বলরাম ঘোষ স্ট্রিটে রয়েছে ঠাকুর্দার বাড়ি। ১৮৭৮ সালে বসু পরিবারের পূর্ব পুরুষেরা এই বাড়িটি কেনেন। জেঠামশাই ছিলেন কারমাইকেল কলেজের প্রিন্সিপাল। স্বদেশি আন্দোলনেও বসু পরিবারের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট। বসু পরিবারে মহাত্মা গান্ধী সহ আরো অনেক স্বদেশি নেতাদের আগমনও ঘটেছিল। ১৯০৬ সালে বরিশালে যখন আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে, সুরেন্দ্র নাথ গ্রেপ্তার হন, তখন বসু পরিবার ওই আন্দোলনে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

কলকাতা কর্পোরেশানের মেয়র পদটি নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। এক সময় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এই পদে আসীন হয়েছিলেন। তিন শো বছরের ঐতিহ্যশালী কলকাতাকে গড়ে তোলার পেছনে মেয়রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কলকাতার ভবিষ্যৎ নিয়ে মেয়রকে সদা সর্বদাই মাথা ঘামাতে হয়। সব মিলিয়ে, এই পদটিকে ঘিরে একদিকে যেমন আশা প্রত্যাশা গড়ে উঠেছে, তেমনই আছে বিতর্কের অবকাশ। কেননা এই পদের সঙ্গে জড়িত রয়েছে জনস্বার্থ। সুতারং রাইটার্সের পাশাপাশি নগর উন্নয়নেও কর্পোরেশানের ভূমিকা বিশাল।

মেয়রের হাতে সময় খুব কম। রোজই রাত হয়ে যায় ফাইল দেখতে দেখতে। 'কোন কাজই আমি ফেলে রাখতে চাই না।' স্মিত হেসে কমল বসু জানালেন। অবসর অল্প, তবু সুযোগ পেলেই গল্প উপন্যাস পড়েন। তবে তা খুব হাল্কা ধরনের। সিরিয়াস বই কম পড়া হয়। ম্যাগাজিন পড়তে খুবই ভালবাসেন কলকাতার মেয়র। বিশেষ করে রাজনীতির ওপর লেখা থাকলে পড়ে ফেলেন। চোখের অসুস্থতার জন্য টি.ভি. দেখেন কম।

দুজনের ছোট্ট সংসার। পুত্র শান্তনু সুপ্রতিষ্ঠিত। পিতা হিসেবে কমলবাবু অত্যন্ত সুখী। বাড়ি প্রায় ফাঁকাই থাকে, তবে আত্মীয় স্বজন, নানা ধরনের মানুষের যাতায়াত আছেই। কমলবাবুর কথায়, 'আমাদের পরিবারের অতিথি সমাগম নতুন কিছু নয়।'

জীবনের প্রতিপদে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এই সৌম্য শান্ত মানুষটি মাথা ঠাণ্ডা করে এগিয়ে চলেছেন চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে। একসময় সল্টলেক স্টেডিয়াম তাঁর জীবনে একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। সে চ্যালেঞ্জ জয় করেছেন কমলবাবু। সল্টলেক স্টেডিয়াম আজ কলকাতার অহংকার। সেই অহংকারটি বুকে জিইয়ে রেখে কলকাতার নব রূপকার কমল বসুর পথ চলা এখনও অব্যাহত রয়েছে। কর্মীদের কখনো থেমে যেতে নেই—তা কলকাতার এই সম্মানিত মেয়র ভালভাবেই জানেন। স্পন্দনের মৃত্যু মানেই জীবনের মৃত্যু।

বিশেষ প্রতিনিধি
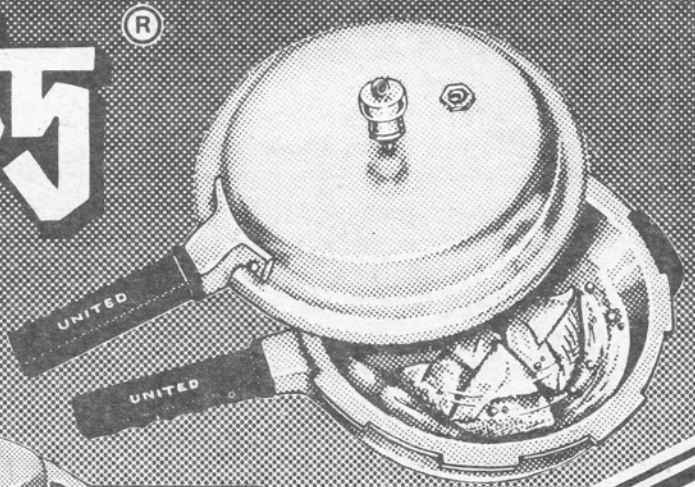
চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে ঘটে যাওয়া ভারতের আট রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে যখন গত বছরের নভেম্বর মাসের শেষদিকের লোকসভা নির্বাচনের পুনরাবৃত্তিতে প্রবল ভি পি হাওয়াকে প্রতিহত করে ভারতীয় জনতা পার্টি তথা বিজেপির চমকপ্রদ সফলতা তামাম ভারতের রাজনৈতিক ভিত্তিভূমিতে জোরদার আঘাত হানল তখন স্বাভাবিকভাবেই ভারতের রাজনৈতিক মহলে রীতিমত শোরগোলের সঙ্গে দেশজ রাজনীতির নয়া পট পরিবর্তনে হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত করার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। রামজন্মভূমি–বাবরি বিতর্ক, রামমন্দির নির্মাণের ডাক, সংখ্যালঘু কমিশনের পরিবর্তে মানবাধিকার কমিশন গঠনের ইস্তাহার, কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলোপের প্রস্তাব এবং হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের হুংকার এতদিনে ভারতবাসীর মনে নয়া চেতনায় সাড়া ফেলে দিল। নবম লোকসভা নির্বাচনে ৮৮টি আসন জয় করে উত্থানের প্রাক-আভাস এবারকার বিধানসভা নির্বাচনে অবিসংবাদিত সত্য হিসেবে প্রমাণিত হল। এই রাজনৈতিক দলটির আসন্ন ভবিষ্যতে দিল্লিতে একাধিপত্য দখলের সম্ভাবনাকে
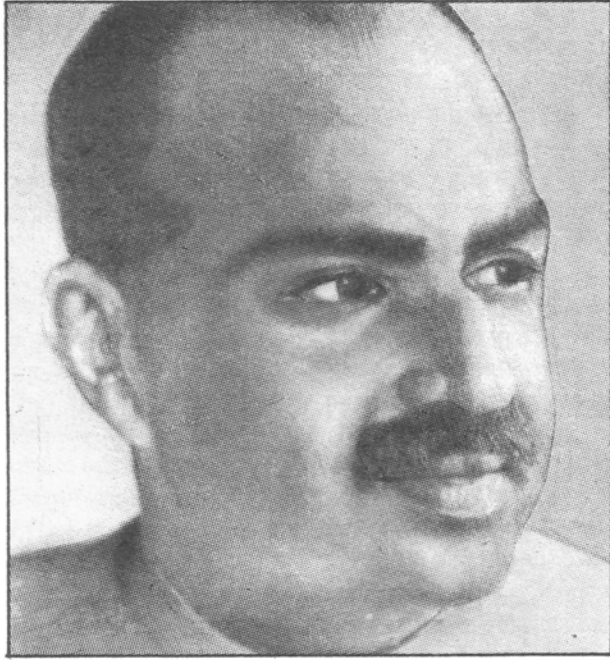
বি জে পি-র স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদের অজ্ঞাতপ

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা শুরু করলেন। সব মিলিয়ে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতীয় জনতা পার্টি রূপান্তরিত হল ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক মহাশক্তিতে। সারা দেশের সমস্ত রাজনৈতিক মহলও সচকিত হয়ে উঠল এই রাজনৈতিক দলটির আকস্মিক উত্থানে। পাশাপাশি কংগ্রেসের পরিবর্তে সংযুক্ত বিরোধী-দলগুলির দিল্লি দখলের অন্যতম মহাশক্তি হিসেবে বি জে পি এই ক'মাসে উঠে এল পাদপ্রদীপের আলোয়। চূড়ান্ত রকমের সরব হয়ে ওঠা সর্বভারতীয় প্রেসগুলি বিশ্লেষণে বসলেন ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থানের উৎস বিচারে। প্রশ্ন উঠল রাষ্ট্রীয় রাজনীতির আকাশে আজ যে মহীরুহ ধর্মচেতনার মাটিতে সনাতন সংস্কৃতির সফল বীজ পুঁতে পুষ্ট চারাগাছ বানিয়ে ফেলল তাকে এই সফলতার সোপানটি চিনিয়ে দিলেন কোন তাত্ত্বিক? একটা দল একটা রাজনৈতিক বিশ্বাস। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে সেই বিশ্বাসের জন্মদাতা কে, আর স্রষ্টাই বা কে? এখানে আমরা এমন এক বাঙালি বীরের কথা বলব যিনি আজকের এই সফল মহীরুহর পিতা। আজকের বি জে পির যাবতীয় তত্ত্ব, বিশ্বাস ও রূপরেখা সৃষ্টির প্রথম পুরুষ কিন্তু এই বাংলারই এক প্রবাদপুরুষ। দেশে নেহরু ঘরাণা প্রতিষ্ঠার দাপটে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মতই যাঁকে এতদিন চিনতে দেওয়া হয়নি। অথচ আজ যে হিন্দু সংস্কৃতি চেতনার স্ফূরণ সারা দেশকে মাতিয়ে

নবম লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে ভারতে যে রাজনৈতিক দলটি ধর্মসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে সারা দেশে নয়া রাজনৈতিক শক্তিকে কায়েম করতে চলেছে সে বিজেপি। তার প্রতিষ্ঠাতা আসলে কিন্তু এই কলকাতার বাসিন্দা বাঙালি বীর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বঙ্গীয় শিক্ষাজগতের ও নৈতিকশক্তির পুরোধা পুরুষ স্যার আশুতোষের মধ্যপুত্র এই শ্যামাপ্রসাদ কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ভারতের মত সর্বধর্মসমন্বয়ের দেশে বিজেপির মত হিন্দুরাষ্ট্রবাদী দল প্রতিষ্ঠা করতে গেলেন? শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস কিভাবে ধর্মবিশ্বাসী রাজনীতিকদের প্রেরণা হতে চলেছে? হিন্দুত্ব ও ঈশ্বরবোধ সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের আত্মক' কি বলে? কাশ্মীরে তাঁর রহস্যময় মৃত্যু নিয়ে জওহরলাল নেহরু, শেখ আবদুল্লা এবং বিধান র জনমানসে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হন কেন? সর্বভারতীয় রাজনীতির প্রধান বাঙালি চরিত্রের অ কথার দিকে তথ্যনিষ্ঠ আলোকপাত।
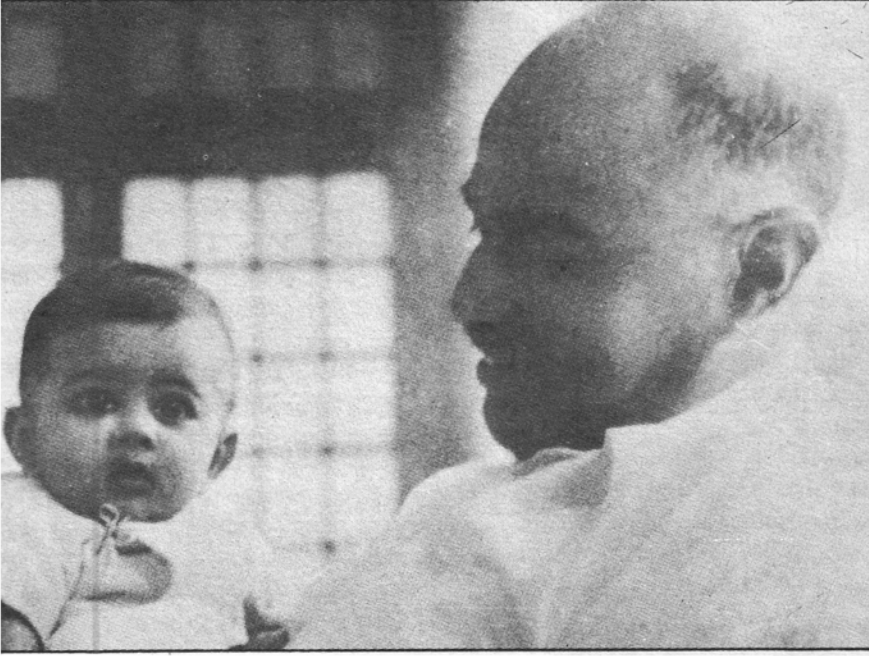
র সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ছে তার প্রথম পুরুষ ছিলেন এই বাংলা তথা কাতার এক পুরুষসিংহ। এখন তাঁর কথাই যাক।

সেটা পঞ্চাশের দশকের কথা। ভারতে তখন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ক্যারিসমা ত্মা গান্ধীর মানসপুত্র হিসেবে ভারতের কোণায় ায় প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী ার ভারত তৈরির রূপকার পণ্ডিত নেহরু কেন্দ্রিয় মন্ত্রীসভার জন্য কিছু পূর্ণমানুষ খুঁজে চ্ছেন। এসময়ই পণ্ডিতজীর নজর গেল ার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম ্র দিকে। দক্ষিণ কলকাতার সম্মানিত র্জ পরিবারের ছেলে শ্যামাপ্রসাদকে তিনি সভায় নিয়ে এলেন কেন্দ্রিয় সরকারকে আরও কার্যকর করার জন্য। সারা বাংলা চমকিত এই চমকের কিছুদিন পরেই অপেক্ষা করছিল ও বড় চমক। ভারতের ধর্মচেতনার নভূমিতে ব্রিটিশ বেনিয়ার পুঁতে যাওয়া য়িকতার বিষবৃক্ষ তখন সবেমাত্র ন ভারতে পাতা মেলতে শুরু করেছে অত্যন্ত াপনে। আর ভোট সর্বস্ব রাজনীতির কল্যাণে সেন্টিমেন্টে ভোট পাওয়ার ধান্দায় দেশের নেতারা একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে াজ করা শুরু করলেন। এমনকি ওই দায়কে খুশী করতে তাদের গরিষ্ঠ একটি রাজ্যে ভৌম বিরোধী বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার জন্য ধান সংশোধন করাও হয়ে গেল। সর্বোপরি স্তানের ধর্মীয় সুড়সুড়ির মোকাবিলায় ওই দায়কে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধা দিতে
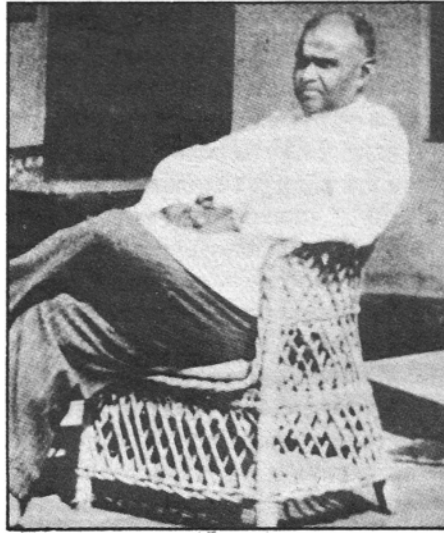
প্রবীণ বয়সে শ্যামাপ্রসাদ

হিন্দুত্বের গরিমা। অথচ এই হিন্দুত্বই হল এ দেশের মূল সংস্কৃতি। প্রমাদ গুনলেন দেশপ্রেমিক শ্যামাপ্রসাদ। অন্তর থেকে ডাক শুনলেন এর প্রতিবাদ করার। তৎক্ষণাৎ কেন্দ্রিয় মন্ত্রীসভার মসনদ পরিত্যাগ করে নেমে এলেন সাধারণ পথের ধুলোয়। সেখান থেকে লড়াই করার শপথ নিলেন। তিনি আত্মনিয়োগ করলেন হিন্দুসংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রপীঠ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কাজকর্মে। এইভাবে শ্যামাপ্রসাদ নেমে পড়লেন দেশজ সংস্কৃতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে দেশের জন্য প্রকৃত মানুষ তৈরির কাজে। আর তখনই যাত্রাপথে এসে দাঁড়াল

বলবৃদ্ধিতে আশংকিত জওহরলাল নেহরু আর·এস·এস কে ব্যান বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। সারা দেশজুড়ে সরকারি পর্যায়ে শুরু হল আর এস·এসের কাজকর্মে কুৎসা লেপন। তাতে কংগ্রেসের সঙ্গে গলা মেলাল কমিউনিস্টরা। সেই মুহূর্তে শ্যামাপ্রসাদ অনুভব করলেন হিন্দু সংস্কৃতি চর্চার এই সংগঠনকে ভোটসর্বস্ব রাজনীতিবিদদের করাল থাবা থেকে রক্ষা করার জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা দরকার। যারা প্রয়োজনে প্রশাসনের ভেতরে বা বাইরে থেকে এই সংগঠনের হয়ে লড়াই চালাতে পারবে। তারপরই শ্যামাপ্রসাদের মস্তিষ্কপ্রসূত এই চিন্তাভাবনা ভারতীয় জনসংঘ নামে হিন্দুত্ব রক্ষাকারী একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম দিল। যে দল অনেক উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত পরিশীলনের সিঁড়ি ভেঙ্গে আজকের ভারতীয় জনতা পার্টি তথা বি জে পি নামক সফল রাজনৈতিক দলের রূপ পেয়েছে। এমনকি এই বি জে পির আজ যে দুই পুরোধা পুরুষ অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং লালকৃষ্ণ আদবানি সারা দেশ জুড়ে মূল্যবোধ ভিত্তিক রাজনীতি সংস্থাপনের ডাক দিচ্ছেন সেই দুজনই বঙ্গবীর শ্যামাপ্রসাদের হাতের তৈরি। আজও তাঁরা দেশে শ্যামাপ্রসাদের আদর্শ রূপায়ণের জন্য অক্লান্ত যোদ্ধা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন।

সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক বঙ্গতনয়ের সৃষ্ট ভারতীয় জনতা পার্টির এই চাঞ্চল্যকর সাফল্যে যখন সারাদেশ একেবারেই হতচকিত, তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দেওয়া কোন তাত্ত্বিক শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে বি জে পি আজ সারা ভারতে এমন অগ্রগতির, এমন সাফল্যের নজির রেখেছে? কিভাবেই বা তিনি এই সনাতন ধর্মবাদী হিন্দুসংস্কৃতি উত্থানের মহাযাত্রার সারথি হয়েছিলেন? কোন পরিপ্রেক্ষিতে এই আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান পুরুষের হাতে রোপন করা হয়েছিল তামাম ভারত ব্যাপী হিন্দুকেন্দ্রিক মহীরুহের প্রবল সম্ভাবনাময় চারাগাছটি? আজ চূড়ান্ত সফলতার দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির আদিপুরুষটির কথা গতানুগতিক সংবাদমাধ্যম বিস্মৃত হলেও আলোকপাত নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করছে সেই আদিপুরুষটির কথা জনসমক্ষে তুলে ধরতে। এবং নৈতিক শক্তি সম্পন্ন রাজনৈতিক দলটির সৃষ্টিকারী ছিলেন যে বাঙালিটি, তাঁর জীবনকথা জানানোর সাথেসাথে প্রকাশ করছি তাঁর সাড়াজাগানো চাঞ্চল্যকর একটি ডায়েরির কথা। যে ডায়রির প্রেক্ষাপটে উন্মোচিত হয়েছে আজকের ভারতীয় জনতা পার্টির জন্ম রহস্য। এবং প্রকাশ পেয়েছে রাজনৈতিক ধান্দাবাজি চক্রান্তে এই বীরপুরুষকে সুদূর কাশ্মীরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করানোর সন্দেহটিকে। আর কি আশ্চর্যের কথা শ্যামাপ্রসাদ সেদিন যে কাশ্মীর নিয়ে সংশয় প্রকাশ
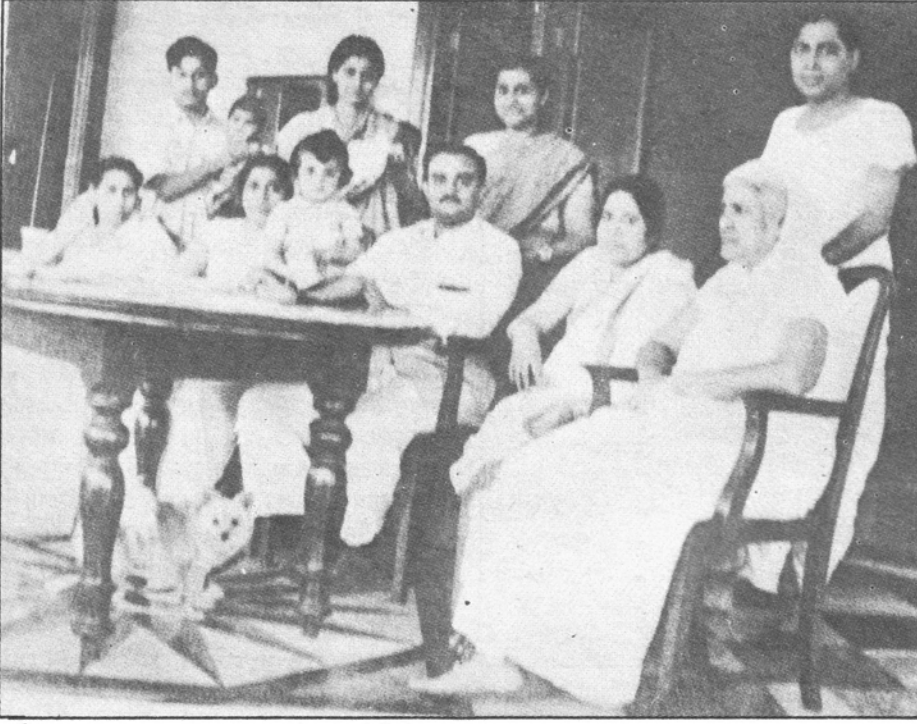
পরিজন সহ শ্যামাপ্রসাদ-পুত্র অনুতোষ মুখোপাধ্যায়

আশংকাও সত্য প্রমাণিত করে জন্ম নিয়েছে প্রবল ভারতবিরোধী সত্তা। সে জন্মরহস্যটিও এখানে প্রকাশ পাবে।

পরাধীন ভারতে ইংরাজ রাজপুরুষদের মুখের মত জবাবের চপেটাঘাত করার মত সাহসী সংস্কৃতি-পুরুষ ও বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সার্থক সন্তান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যিনি আজকের ভারতীয় জনতা পার্টির জনক তাঁর ডায়েরির উদ্ধৃত অংশ থেকে জানা যাবে, কি করে এবং কোন মানসিকতায় তাঁরই হাতে সৃষ্টি হয়েছিল বি জে পি ওরফে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। আরও জানা যাবে, ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে—সাম্প্রতিক তোলপাড় সৃষ্টিকারী ভারতীয় জনতা পার্টি গঠনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ভূমিকা।

'উনিশশো সাল ৬ জুলাই ভবানীপুর, কলকাতা সাতাত্তর আশুতোষ মুখার্জি রোড (তখন রসা রোড নর্থ) ভবনে (মুখার্জি পরিবারের দক্ষিণ কলকাতাস্থ বাসভবনে) আমার জন্ম হয়। আমরা চারভাই তিন বোন ছিলাম। আমার আগে আমার বড় বোন কমলাদেবী আঠারোশো পঁচানব্বই সালে ও আমার বড় দাদা রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আঠারশো ছিয়ানব্বই সালের ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। উনিশশো দুই সালে অকটোবর মাসে আমার ছোটভাই উমাপ্রসাদের।…'

'আমার পিতামহ ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁরা চারভাই ছিলেন, এক বোনও ছিলেন। বড় দুর্গাপ্রসাদ, মধ্যম হরিপ্রসাদ, সেজ গঙ্গাপ্রসাদ, ছোট রাধিকাপ্রসাদ বোনের নাম থাকোমণি। অল্প বয়সে তাঁরা বাপ, মা দুই হারান। তাঁদের মা ব্রহ্মময়ী জীরাট থেকে পদব্রজে পুরীধামে তীর্থ করতে গেলেন। সেখানে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁদের পিতা বিশ্বনাথ পৈত্রিক ভিটে রাগনাপাড়া ত্যাগ করে মাতুলালয় জীরাটে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গঙ্গায় স্নান করার সময় একটি জাহাজের মাস্তুল তাঁর মাথায় পড়ে এবং সেই আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। গল্প শুনেছি, যে যখন তাঁর বয়স খুব অল্প এবং তাঁর মার সঙ্গে জীরাটে আসার কিছু পরে, তাঁর বিসূচিকা হয়। সকলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ধরে নিয়েছিল এবং গঙ্গার কোলে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। বিধবা মা একমাত্র সন্তানকে ছাড়তে পারেননি, তাঁর মৃতপ্রায় দেহ আঁকড়ে গঙ্গার ধারে কাঁদছিলেন। এমন সময় এক সাহেব নৌকোযোগে যাচ্ছিলেন। তিনি দয়াপরবশ হয়ে নৌকো থামালেন এবং বালককে দেখে বিচার করলেন যে তার জীবনের দীপ তখনও অল্প জ্বলছে। তাঁর ওষুধের গুণে বালক সুস্থ হয়ে ওঠেন। ওইরূপ অলৌকিক উপায়ে মুখোপাধ্যায় বংশ রক্ষা পায়। যদি তাঁর জীবনের সেদিন অবসান ঘটতো, গঙ্গাপ্রসাদ জন্মাতেন না, বাংলায় ও ভারতে আশুতোষও আসবার অবকাশ পেতেন না।'

মুখোপাধ্যায় পরিবারের এই অলৌকিক ঘটনাটি তাঁদের বংশে একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ঘটনা। কেননা শ্যামাপ্রসাদ মনে করতেন এই ঘটনা ঈশ্বরেরই করুণার প্রকাশ। অলৌকিক উপায়ে সেদিন যদি বিশ্বনাথ রক্ষা না পেতেন তাহলে যেমন প্রবল প্রতাপশালী বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ জন্মাতেন না, তেমনই জন্মাতেন না ভারতীয় জনতা পার্টির আদি জনক শ্যামাপ্রসাদ। এরপর জীরাটেই পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেন বিশ্বনাথ। তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মময়ী পুরীতে দেহ রাখার কিছুদিন পর তাঁর নিজেরও মৃত্যু হয়। তখন জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গাপ্রসাদ—এর বয়স মাত্র সতেরো। বাকি তিনভাই—সকলেই নাবালক। সংসারে আপন বলতে কেউ নেই, এই আকস্মিক বিপদে ওঁরা একেবারেই অথৈ জলে পড়লেন। এখানেও ঈশ্বরের অপার করুণা। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িরই আগেকার এক স্নেহ বৎসল পরিচারিকা এই বিপর্যয়ের দিনে তাঁদের সহায় হয়ে দাঁড়ালেন। মুখোপাধ্যায় পরিবার পায়ের তলায় জমি পেল। যথা সর্বস্ব ব্যয় করে তিনি তাঁদের নিয়ে এলেন কলকাতাতে। দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে জিততে রশদ যোগালেন তিনি। দুর্গাপ্রসাদ প্রতিজ্ঞা করলেন যে করেই হোক, সংসার গড়বেন, ভাইদের মানুষ করে তুলবেন। সেখান থেকেই মুখোপাধ্যায় পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষার মহাযাত্রা শুরু। যে যাত্রা প্রতিষ্ঠিত হবা… লড়াই।

'১৮৬৪ সালের ২৯, অন্যমতে ২৮ জুন আম… পিতৃদেব আশুতোষের জন্ম হয়। ১৮৭৩ স… পিতামহ ভবানীপুরে সাতাত্তর রসা রোডে (ন… বাড়ি কিনে দক্ষিণ কলকাতায় বসবাস করা… করলেন। কনিষ্ঠ রাধিকাপ্রসাদ ইঞ্জিনিয়ার হ… দুর্গাপ্রসাদ যুক্তপ্রদেশে বড় সরকারি চাকরি… যান। প্রতিষ্ঠাবান লোক হিসেবে তাঁর বিশেষ… ছিল। তাঁর অদ্ভুত ত্যাগ ও প্রচেষ্টা ন… ভাইয়েরা মানুষ হয়ে উঠতেন না।'

'আমার পিতামহ গঙ্গাপ্রসাদকে… কখনও দেখিনি। তবে শুনেছি তিনি … হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছি… মেজাজ বাইরে বড় কড়া ছিল, কিন্তু তাঁর… অসাধারণ কোমল। কখনও দু টাকার… নেননি। এবং তাও গ্রহণ করেন নি যখ… রোগীর সাংসারিক অবস্থা এমন যে … দেওয়াও কষ্টসাধ্য হবে। সকলে তাঁ… করতেন—তিনি কখনও অন্যায়কে প্র… বলে কোথাও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি সহ… চিকিৎসা শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলে…

আসলে পূর্বপুরুষের ব্যক্তিত্ব… সঞ্চারিত হওয়ার কথা। পিতামহ… সততা এবং মানবিকতা পরবর্তী… স্যার আশুতোষ এবং পৌত্র… কর্মজীবনের মধ্যে বারংবার… শত দুঃখের মধ্যেও গঙ্গাপ্রস… মহনীয়তার জন্য তা তিনি রক্ষা… সারা জীবন। এবং পরবর্তীকা… তাই সঞ্চারিত হয় পুত্র ও… গঙ্গাপ্রসাদের চরিত্রই ছিল শ্যা… বীজ।

কাশ্মীরে বন্দী শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুরহস্য

ভারতীয় জনতা পার্টির স্রষ্টা শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু অনেকের কাছেই রহস্যাবৃত হয়ে গিয়েছে। উনিশশো তিপ্পান্ন সালের তেইশে জুন অমৃত বাজার পত্রিকাতে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীনগর থেকে নিজস্ব সংবাদ দাতার পাঠানো সংবাদ থেকে জানা যায় যে বর্তমানে বন্দী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছেন। সরকারি চিকিৎসকরা তাঁর দেখাশুনো করছেন। একজন সরকারি মুখপাত্রর মতে, শ্যামাপ্রসাদের অবস্থা গুরুতর কিছু নয়। তাঁর জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সেই সময়ে স্বাধীন ভারতে কাশ্মীর অন্তর্ভুক্ত হলেও সেই রাজ্যে বিশেষ কয়েকটি আইন প্রযোজ্য ছিল। এবং কাশ্মীরের অনেকটা অংশ পাকিস্তানের দখলে। তখন জম্মু ও কাশ্মীরে জনসংঘের উদ্যোগে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। আন্দোলনকারীরা নিগৃহীত হচ্ছেন, সে খবরও দিল্লির কানে এসে পৌঁছতে লাগল। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন জনসংঘের সভাপতি। এবং লোকসভার নির্বাচিত সদস্য। বিরোধী দলের নেতা হিসেবে তখন তাঁর খুব নাম ডাক। কাশ্মীরের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি নিয়ে শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লার মধ্যে পত্র বিনিময় হয়। সেই পত্র বিনিময়ের মধ্যে কাশ্মীরের প্রকৃত পরিস্থিতি নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত উনিশশো তিপ্পান্ন সালের আটই জুন শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাকে একটি টেলিগ্রামে জানান যে তিনি কাশ্মীর পরিস্থিতি সরজমিনে পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজন হলে শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে সেখানে যাচ্ছেন। এবং তিনি শেখ আবদুল্লার সঙ্গে দেখা করতেও আগ্রহী। ওই টেলিগ্রামের একটি কপি পাঠানো হয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে। যাত্রাপথে আবদুল্লার টেলিগ্রামের উত্তর শ্যামাপ্রসাদের হাতে আসে। তাতে আবদুল্লা তাঁকে সরাসরি কাশ্মীরে যেতে মানা না করলেও তাঁকে এক রকম নিরুৎসাহই করেন। টেলিগ্রামে তিনি জানান যে এখানকার পরিস্থিতি খুবই উত্তাল। এ অবস্থায় শ্যামাপ্রসাদের আসা ফলপ্রসূ হবে না। শেখ আবদুল্লার এই টেলিগ্রামের কথা অবশ্য নেহেরু জানতেন না। ওই টেলিগ্রামটি পেয়ে শ্যামাপ্রসাদ একটু সংশয়ে পড়ে যান। তবু তিনি কাশ্মীরের পথে এগিয়ে চললেন। বলা বাহুল্য, সেই সময় কাশ্মীরে ঢুকতে গেলে ভারত সরকারের অনুমতিপত্র লাগতো। শ্যামাপ্রসাদের কাছে ওই অনুমতিপত্র ছিল না। এ কারণে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তবে এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। সেই আইন অমান্য করলে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা ছিল একমাত্র ভারত সরকারের। কিন্তু তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন কাশ্মীর সরকারের হাতে। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থেকে জানা যায়, কাশ্মীর সরকারের পাবলিক সিকিউরিটি অ্যাক্ট এর বিশেষ ধারা অনুযায়ী তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর মত, তাঁর গ্রেপ্তারের ব্যাপারটিও ছিল রহস্যে ঘেরা।

কাশ্মীর সরকারের হাতে শ্যামাপ্রসাদ গ্রেপ্তার হ'ন এগারোই মে। গ্রেপ্তারের পর তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও রাত দুটোয় কাশ্মীরের ওই সুউচ্চ পার্বত্য প্রদেশে তাঁকে জীপে করে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে তৎকালীন কাশ্মীরের স্বাস্থ্য ও কারামন্ত্রী পণ্ডিত শ্যামলাল সরফ্ বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের অসুস্থতার খবর কাশ্মীর সরকার খুব ভালো ভাবেই জানতেন। জুন মাসের পঁচিশ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানান যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নামেই বন্দী ছিলেন এবং বিশেষ করে তাঁর স্বাস্থ্যের দুর্বলতার কারণে সরকার তাঁকে সব রকম সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন। একুশ জুন তিনি তাঁর ডায়েরিতে লেখেন যে আমি তিন চারদিন ধরে সুস্থ নই। কুড়ি জুন থেকে তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। কুড়ি তারিখে একশো পয়েন্ট দুই জ্বর ওঠে। একুশ তারিখেও জ্বর একশোতে উঠে থাকে। বাইশ তারিখে রাত আটটায় জ্বর ওঠে আটানব্বই পয়েন্ট দুই এ। অনেকের মতে, কাশ্মীরের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর এই গুরুতর অসুখকে 'শরীর একটু খারাপ' এবং 'অল্প ব্যথা' এইভাবে বর্ণনা করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পরেই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'তিনদিন আগে তাঁর সামান্য ঠাণ্ডা লাগে এবং সেটা ড্রাই প্লুরিসিতে পরিণত হয়।' বিদেশ থেকে ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু জানান যে 'বাইশে তিনি কিছুটা অসুস্থতাবোধ করেছিলেন।' শ্যামাপ্রসাদের ব্যারিস্টার মিঃ ত্রিবেদীর বক্তব্য থেকে অবশ্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও নেহেরুর বক্তব্য পরিষ্কার হয়না। সব থেকে আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো, শ্যামাপ্রসাদকে কোন 'নার্সিং হোম' এ নিয়ে গিয়ে রাখা হয়নি। রাখা হয়েছিল শ্রীনগরের সরকারি হাসপাতালের স্ত্রী রোগ সম্পর্কিত ওয়ার্ডে!

কাশ্মীর সরকার নিযুক্ত ডাঃ আলি মোহম্মদ, এম·আর·সি·পি· (এডিন) এবং ডাঃ রামনাথ পরিহার এম ডি (এডিন) দুই চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন। তাঁদের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বাইশ তারিখে শ্যামাপ্রসাদ হৃৎপিণ্ড সংলগ্ন বুকের কাছে দু মিনিট ধরে যন্ত্রণা অনুভব করেন। ব্লাড প্রেসার নেমে যাওয়ায় তিনি সব সময়ই বুকের মধ্যে ভারি চাপ ও অবসাদ অনুভব করেন। সরকারি ডাক্তররা তাঁকে নিশাত বাগের অন্তরীণ ক্যাম্পে পরীক্ষা করেন। চিকিৎসা করার পর তাঁর অবস্থার উন্নতি হলে তাঁকে সরকারি নার্সিং হোমে (!) নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রক্ত, মূত্র, ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফি দিয়ে চিকিৎসা করেন সরকারি চিকিৎসকরা। অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পাশাপাশি অক্সিজেনও দেওয়া হয়। এতে অবস্থার উন্নতি হয় বলে সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়। রাত নটায় শ্যামাপ্রসাদের শারীরিক অবস্থা মোটের ওপর ভালোই ছিল। কিন্তু এগারোটা থেকে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে থাকে। অস্থিরতা দেখা দেয়। ক্রমে ক্রমে পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, রাত তিনটে কুড়ি নাগাদ শ্যামাপ্রসাদের শ্বাসক্রিয়া ও নাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। পৃথিবী থেকে চিরতরের জন্য বিদায় নেন বাংলার কর্মময় পুরুষটি।

সরকারি ভাষ্যের সঙ্গে বাস্তবের ফারাক ছিল অনেকখানি। বহু মানুষই শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সহজে মেনে নিতে পারেননি। কাশ্মীর সরকারের বিবৃতির সমালোচনা করে অনেক কাগজ নানা ধরনের মন্তব্য করে। এমন কি তাঁর পরিবারে যে টেলিগ্রামটি আসে তাতে মৃত্যুর কোনও কারণ বলা হয়নি। অনুমান করা যায় যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সংবাদটি 'সেনসর' করেছিলেন। এমন কি স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি শ্যামাপ্রসাদের চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় প্রকাশ করে। সহবন্দী গুরুদত্ত বৈদ্যর বিবৃতি থেকেও চিকিৎসাব্যবস্থার চূড়ান্ত অবহেলার কথা জানা যায়। যদিও কাশ্মীর সরকার তাঁর সর্বোত্তম সুচিকিৎসা করার দাবী জানিয়েছিল, তবু জনমানসে তাঁর বন্দীদশায় অসুস্থতার বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন থেকে গিয়েছিল–যার নিরসন আজও হয়নি।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত রয়ে গিয়েছে। কেনই বা তাঁকে কাশ্মীর সরকার গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করেছিল–সে সবের উত্তর আজও পাওয়া যায়নি। শ্যামাপ্রসাদ চেয়েছিলেন তামাম ভারতে অবহেলিত হিন্দুর সুবিচার, রাজনৈতিক ফয়দা তুলে দেশের এই বৃহত্তম জাতিটি যাতে সত্যিই মর্যাদা পায় তার জন্য তিনি আপ্রাণ লড়াই চালিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরে বন্দীদশায় এই শক্তিমান পুরুষটির মৃত্যু ঘটে–যে মৃত্যু জন্ম দিয়েছে অনেক বিতর্ক, অনেক জিজ্ঞাসার। সেই বিতর্ক, জিজ্ঞাসার উত্তর কি কোনও দিনও পাওয়া যাবে?

উনিশশো চোদ্দ সালে গঙ্গাপ্রসাদের স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হিসেবে ভবানীপুরের বাড়িটির অধিকার পেলেন আশুতোষ। সেখানেই শ্যামাপ্রসাদের ছেলেবেলা কেটেছিল। বয়সের অনুপাতে তিনি ছিলেন ভারিক্কী চালচলনের অধিকারী। চেহারায় অনেক বড় সড়। দেহটিও ভারি। কথাবার্তা, বুদ্ধি ও মনোবিকাশেও সাধারণ ছেলেমেয়েদের থেকে অগ্রসর। অথচ এতবড় চেহারা ও মেধার অধিকারী হয়েও শ্যামাপ্রসাদের মন ছিল শিশুর মত কোমল। বড় বেলা পর্যন্ত ভাইদের সঙ্গে ছোটখাটো খুনসুটিও করতে ভালবাসতেন অপর্যাপ্ত। ডাক নাম ছিল 'বেনী'। স্কুলের খাতাপত্রে তাঁর নাম 'শ্যামাপ্রসাদ' লেখা থাকলেও সহপাঠীরা তাকে ডাকতেন এই 'বেনী' নামেই। বাংলা বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে একটি রচনার মধ্যে ছিল 'বেনী বড় দুরন্ত বালক।' স্কুলের সুযোগ সন্ধানী ছাত্ররা তাকে প্রায়ই ঠাট্টা করে ওই কথা বলে উত্যক্ত করতো। বিরক্ত শ্যামাপ্রসাদ একদিন বাড়িতে ফিরে এসে বাবা-মাকে ধরলেন তাঁর বেনী নামটি পাল্টে দেওয়ার জন্যে। অনেক পীড়াপীড়ির পরে শেষপর্যন্ত বাবা-মা তাঁর নাম পাল্টে দিয়েছিলেন। এবার শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতিকথার পাতা থেকে ছেলেবেলার কথা শোনা যাক।

'খুব ছেলেবেলার ঘটনা যা আমার মনে আছে, তখন হয়তো হাঁটতেও শিখিনি। বাড়ির বাইরের সিঁড়ি দিয়ে আমাকে পেরামবুলেটরে বসিয়ে চাকর নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় গাড়ি উল্টে যায় ও আমি গুরুতরভাবে আঘাত পাই। সেই আঘাতের ঘটনা আমার মনের মধ্যে একটা আতঙ্কের ছাপ নিয়ে অনেকদিন ছিল এবং আজও সেই কথা মনে পড়ে। ছেলেবেলার গল্প বড় হয়ে শুনেছি যে, খুব ছোট বয়স থেকেই আমি ভোজন পটু ছিলাম। যখন উঠে দাঁড়াতে পারিনা, কোন রকমে বসতে পারি, হয়তো কথাও ফোটেনি, তখন বড় একটা আম তলার দিকে ফুটো করে আমার হাতে তুলে দেওয়া হতো। বাবা হয়তো তখন স্নানে যাচ্ছেন—অত বড় আম হাতে দেখে মাকে বকে গেলেন। স্নান শেষ করে এসে দেখলেন যে আমটি আমি শেষ করেছি। তার ভিতরের সব রস নিঃশেষ করে আম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলতাম, ঐ, যা। এবং আরো একটার জন্য হাত বাড়াতাম।'

শৈশব মানুষের তৈরি হওয়ার প্রকৃত ইতিহাস। সে ইতিহাস না জানলে আসল মানুষ তৈরির মূল খবর পাওয়া যাবে না। তাই শ্যামাপ্রসাদকে ভাল করে জানতে হলে, তাঁর জীবন দর্শনকে বুঝতে হলে তাঁর শৈশবের দিনগুলির কথা জানা দরকার। সেজন্যই কর্মী শ্যামাপ্রসাদকে জানার আগে মানুষ শ্যামাপ্রসাদকে সামগ্রিকভাবে জানা যাক। তাই তাঁর নিজের লেখা শৈশবের স্মৃতিকথা আমাদেরকে এবার সেই পরিচয়টি বিধৃত করুক।

'উনিশশো চার সালে যখন আমার তিন বছর বয়স আমরা কাশী গিয়েছিলাম। সেখানে যে
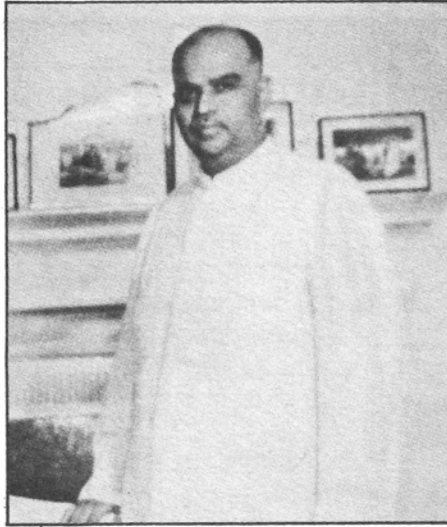
বঙ্গবীর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বাড়িতে থাকতাম তার একটা প্রকাণ্ড হল ঘর দুতলায় ছিল। এ ছবিটা এখনো মনে আঁকা আছে। আমি কালো ছেলে ছিলাম, মনে অভিমান ছিল যে আমাকে তত আদর করে না সকলে। আমার ছোট ভাই বিজু দেখতে খুব সুন্দর ছিল, কাশীতে লুকিয়ে একবার কামড়ে দিয়েছিলাম। একথা এখনও মনে পড়ে। বাড়িতে ছেলেবেলায় দেখতাম বহু লোক আসতেন বাবার সঙ্গে দেখা করতে—এ বেশ মনে আছে। বাবার জুড়ি গাড়ি আসতো, সহিস সুর করে চীৎকার করে রাস্তার লোককে সরে যেতে বলতো, এও মনে পড়ে। ছেলেবেলা থেকে বাবার কাছে থাকতে, তিনি না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে ভালো লাগতো।'

পিতা আশুতোষ শ্যামাপ্রসাদের জীবনে ধ্রুবতারার মত আদর্শের কাজ করতেন। তা তাঁর মহাপ্রয়াণের পর ১৯২৪ সালের মে মাসের ডায়েরির পাতাগুলি পড়লেই বোঝা যায়। আদর্শের মূলপাঠ যে তিনি এই মহাতেজস্বী পিতার পায়ের তলায় বসেই নিয়েছিলেন সেকথাও শ্যামাপ্রসাদ বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। পিতা আশুতোষ ব্যতীত দুই মামার প্রভাবও শ্যামাপ্রসাদের জীবনে কম ছাপ রেখে যায়নি। ডায়েরির পাতা থেকেই মেনে নেওয়া যাক সেকথা।

'ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে যাঁরা থাকতেন, তাঁদের মধ্যে দুজনের প্রভাব আমার উপর খুবই পড়েছিল। একজন ছিলেন আমার বাবার মাতুল অধর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তাকে আমরা দাদু বলে ডাকতাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। সব নাতি নাতনীদের মধ্যে আমিই সর্বাধিক প্রিয় ছিলাম। তাঁর চরিত্র অদ্ভুত ছিল। তিনি অসাধারণ মদ্যপ ছিলেন। যখন এইভাবে তিনি বিভোর হতেন, তখন তাঁর ব্যবহার অবর্ণনীয় হয়ে উঠতো। পথে ঘাটে এমনভাবে চলতেন আর এমন চিৎকার করতেন যে ভবানীপুরের অনেকেই চিনতো বলে বিশেষ গোলমালের সৃষ্টি হতো না। এক একবার আমরা দেখেছি বাবা তাঁর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বাড়িতে আসা পর্যন্ত বন্ধ করতে বাধ্য হতেন।'

'আমি এতক্ষণ আমার ঠাকুরমার ভাই এর কথা বললাম। আরো একজন থাকতেন আমাদের বাড়িতে তিনি আমার মাতুল, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেই বলেছি অত্যন্ত সুপুরুষ ও সুরসিক ছিলেন। কিন্তু দেখতাম আমার মার সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না। তিনি আমার দিদিমার উপর কখনো ভালো ব্যবহার করতেন না। এই কারণে মায়ের সঙ্গেও তাঁর সদ্ভাব ছিল না। প্রতি শনিবার তিনি কৃষ্ণনগরে দেশের বাড়ি যেতেন, সেইখানে তাঁর পরিবারবর্গ থাকতো। তিনি আমাদের একমাত্র মামা ছিলেন। মামার বাড়ি বেড়াতে যাবার প্রবল ইচ্ছে হত আমাদের। কিন্তু তা সব সময় হয়ে উঠতো না। অনেক সময় মা ও মামার ভিতর বাক্যালাপ বন্ধ থাকত—আমাদের বাড়িতেই মামা থাকতেন। তবু, আমরা মাঝেমাঝে মামার বাড়ি বেড়াতে যেতাম। একবার বাবার সঙ্গে কৃষ্ণনগর গেলাম। স্টেশানে মহারাজার হাতি এল বাবাকে নিয়ে যাবার জন্য। আমরাও হাতি চড়ে গেলাম। সে কি আনন্দ। পরে মামার সঙ্গে আমরা ভায়েরা এক সঙ্গে যেতাম অথবা আমি একলা যেতাম। বাবা খুব ভোজন বিলাসী ছিলেন। তাঁর কাছে দুদিন থাকা মানে খাওয়ার বিপুল আয়োজন।'

ছেলেবেলার 'বেনী' তার প্রতিভা এবং স্বাতন্ত্রের গুণে সকলেরই নজর কেনে নেয়। ছেলেবেলা থেকেই শ্যামাপ্রসাদ মেলামেশা করতেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড়দের সঙ্গে তাঁরাও তাঁর সঙ্গে আচরণ করতেন সহ আন্তরিকতা সহযোগে বয়সের তারতম্যের দূর বা গাম্ভীর্য না রেখে। তাঁর জীবনগড়ার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি পরের দিকে খুবই কাজে লেগেছে। ফলে নানা গুরুগম্ভীর আলোচনা শৈশব থেকে তাঁকে মননগতভাবে পরিণত করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

ছোটবেলা থেকে বড়দের সঙ্গে বেশি মেলা করলেও নিজের বয়সের ওজনটি তখন থে বজায় রাখার অভ্যাস করেছিলেন তিনি। বড় সঙ্গে আড্ডা মারার সময়েও তিনি কথাবা আচরণে তাদের প্রতি তিলমাত্র শ্রদ্ধার অ দেখাতেন না। তবে শ্যামাপ্রসাদের ভারিক্কী চেহ চাল চলনে, বাক্যালাপে স্বতঃস্ফূর্ত গাম্ভীর্যের থাকলেও তাঁর স্বভাবে রহস্যপ্রিয়তার কিন্তু অভাব ছিল না। অনেক সময় হাস্য পরিহ সরস উপহাস করে তিনি কৌতুকময় পরি ঘটনার সৃষ্টি করতেন। কথাবার্তায় ম জমানোর অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁর। পরবর্তী লোকসভার নথিপত্রে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর কথা কা নানান উপভোগ্য উজ্জ্বল উদাহরণ দেখা

হিন্দু সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ

'এর চেয়ে হিন্দুর দুর্ভাগ্য কি আর হতে পারে। তার রাজনৈতিক শক্তিকে লাঘব করতে, নষ্ট করতে, ইংরাজ-মুসলমানে এক বিরাট চক্রান্ত ফেঁদে বসেছে। কিন্তু হিন্দু তার নিজের কোন প্রতিষ্ঠান গড়তে চায় না। যে প্রতিষ্ঠান আমরা এত বাধাসত্ত্বেও গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি, তাকে স্বহস্তে ভাঙতে সে আনন্দবোধ করে। এর চেয়ে আত্মঘাতী নীতি আর কি হতে পারে? যে জাতি নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যেতে এত ব্যগ্র, যে জাতির আপন জাতিত্ব-গৌরব বোধ নেই, যে নিজের রাষ্ট্র গড়ে তোলার কথা ভাবলে বা বললে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হচ্ছে বলে নিজেকে ধিক্কার দেয়, সে জাতির ভবিষ্যৎ কি? শুধু ইংরেজ বা মুসলমানকে দোষ দিয়ে লাভ কি? ইংরেজ এসেছিল এ দেশে ব্যবসাবাণিজ্যের লোভে। সেই লোভ ক্রমে রাজ্যাধিকারে পরিণত হল। তার এত বড় জমিদারী ও লাভের সামগ্রী সে সহজে ছাড়তে চাইবে কেন? মুসলমান এ দেশে তার রাজত্ব বিস্তার করেছিল ৭০০ বৎসর ধরে। হিন্দুদের উপর প্রভুত্ব করেছিল, কখনও তাদের সঙ্গে ভাল, কখনও মন্দ ব্যবহার করে। যদিও আজ তাদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক একদিন হিন্দু পরিবারে অন্তর্ভুক্ত ছিল কয়েক পুরুষ পূর্বে, তথাপি তারা আজ হিন্দুবিদ্বেষী। আবার তারা এখানে তাদের রাজত্ব স্থাপিত করবে, এটা তারা ভাববার সাহস রাখে। যতদিন ইংরেজ এখানে প্রভুত্ব করবে, ততদিন হিন্দু মুসলমান দুই পক্ষই ইংরেজের গোলামী করেছে। আজ ইংরেজ চলে গেলে কে বেশী ক্ষমতাশালী হবে—এটা দুপক্ষেরই ভাবা স্বাভাবিক। মুসলমান তৈরি হয়ে উঠছে, সেই সময়ে যেন তারা হিন্দুর তাঁবেদাররূপে পরিণত না হয়। যদি মুসলমান মিলিত হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বজায় রাখে, যে যার ধর্ম ও আচরণ অনুযায়ী বসবাস করে, তাহলে ত গোলমালের কথা ওঠে না। কিন্তু যদি আবার মুসলমান তার স্বধর্মে অতিরিক্ত নিষ্ঠা দেখিয়ে হিন্দুর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে প্রয়োগ করে, তখন হিন্দু কি ভাবে নিজেকে রক্ষা করবে সেটা চিন্তা করে দেখেও না। একটা সিভিল ওয়ার ছাড়া হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান হবে না। সিভিল ওয়ার আমরা চাই না—কিন্তু যদি অপর পক্ষ তৈরি হয়ে ওঠে আর আমরা প্রস্তুত না থাকি, তাহলে আমরাই ঠক্‌ব শেষ পর্যন্ত। কংগ্রেস হিন্দু মুসলমানের সমস্যার কোন মীমাংসা করতে পারে নি, পারবেও না। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা হিন্দু ও মুসলমানের ভেতর বোঝাপড়া করে শেষ হবে। বন্ধুভাবে মিলন হবে, অথবা সংঘর্ষের মধ্যে আপন আপন শক্তি পরীক্ষার পর আপোষ হবে! আপোষ যদি না হয় যে অধিক শক্তিশালী, সেই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে। একটা প্রতিষ্ঠান যে হিন্দুর সহায়তার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে অথচ হিন্দুস্বার্থ রক্ষা করার কথা চিন্তা করা বা বলা পাপ বলে মনে করে, সেই প্রতিষ্ঠান কি করে লড়তে পারে আর এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যে মুসলমান প্রাধান্য স্থাপন করাই, ইসলামের ধ্বজাকে বাড়িয়ে তোলাই তার একমাত্র কাম্য মনে করে। এই সামান্য সত্য কথা হিন্দু তার এত বুদ্ধি ও অর্থবল থাকা সত্ত্বেও বুঝতে পারে না, এর চেয়ে দুঃখের কথা কি হতে পারে? মুসলমান ধর্মের ভিতর এক অদ্ভুত একতা আছে—সাম্যবাদ আছে, যা হিন্দু তার নিজের ধর্মাচারণের মধ্যে সহজে পায় না। নানা জাতি ও বর্ণভেদ, প্রাদেশিকতা—এইসব কারণে এক হিন্দু অপর হিন্দুর জন্য সেরূপ সহানুভূতি বোধ করে না, যা বোধ করে কোন মুসলমান তার অন্য মুসলমান ভাই-এর জন্য—তা সে পৃথিবীর বা ভারতের যে কোন প্রান্ত থেকে আসুক না কেন। ভারতের সব হিন্দু এক-যতদিন না এই বোধ আমাদের ভিতর দৃঢ়ভাবে জন্মাবে, ততদিন হিন্দুর রাষ্ট্র বা তার জাতিগত প্রাধান্য এ দেশে স্থাপিত হতে পারবে না। সামাজিক, অর্থনৈতিক বিপ্লবের ভিতর দিয়ে আমরা নিজেদের না নিয়ে যেতে পারলে, এই বিরাট হিন্দুত্ব বোধ জাগবে না। হিন্দুসভার সামনে এই বৃহৎ কাজ রয়েছে যা সাধনা করতে অনেক মালমসলার প্রয়োজন। বহু বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রচার, সামাজিক কুনীতির ও সংকীর্ণতার সংশোধন, সাম্যবাদের উপর ধর্মের আসল ভিত্তি স্থাপন, শিক্ষাপ্রসার—এ সব না হলে হিন্দু জাগরণ সম্ভব হবে না। শুধু ব্যক্তিগত আর্থিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি—এই করে হিন্দু জগতে টিকে থাকতে পারবে না। নূতন করে বাঁচতে হবে। জাতিকে গড়ে তুলতে হবে, দরকার হলে অপরের কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য কেড়ে নিতে হবে—এই রকম—এগিয়ে চলার তীব্র একাগ্রতা আজ ভারতের মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছে—শুধু তাদের নিন্দা করে লাভ কি? একটা জীবন্ত জাতি হয়ে ওঠবার এই আগ্রহ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি—কিন্তু শেখবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ক'জন?'

শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরি থেকে

অথচ ছেলেবেলা থেকেই তাঁর এই অসাধারণ চারিত্রিক ক্ষমতার অস্ফুট ইঙ্গিত মিলেছে। আর ছেলেবেলাতে এই দুরন্ত ডানপিটে বালকটি যে ভবিষ্যতে প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হবেন, তার আভাস ইঙ্গিতও ছেলেবেলার জীবনযাপনের মধ্য থেকেই পাওয়া গিয়েছিল।

পিতা তেজদৃপ্ত বাংলার বাঘ, মাতা অন্তঃসলিলা স্নেহময়ী। পিতার প্রতাপে তামাম বাংলা মায় সারা ভারত সচকিত। সেই বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র শ্যামাপ্রসাদের সারা জীবনটাতেই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ। উনিশশ চব্বিশ সালে, মাত্র তেইশ বছর বয়সেই তিনি বাংলা শিক্ষা জগতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন।

উনিশশো ছাব্বিশে কেমব্রিজে অনুষ্ঠিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে এই শ্যামাপ্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। এবং এই প্রথম বিদেশযাত্রা তিনি সফল করেন বিলেতের শিক্ষাদুনিয়ায় বাঙালির প্রধান জয়পতাকা উত্তীর্ণ করে। কেমব্রিজে প্রদত্ত শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা সেদিন পাশ্চাত্যের জগতকে সহজেই জয় করতে পেরেছিল। এই রকমই জাঁকজমকপূর্ণ ছিল তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারের শুরুটি। উনত্রিশে বঙ্গীয় বিধান পরিষদে তিনি জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। উনিশশো তিরিশ সাল, অর্থাৎ তার পরের বছরই কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিধান পরিষদ বর্জন নিয়ে মতবিরোধ ঘটলে তিনি আদর্শের পরাকাষ্ঠা বজায় রাখতে দল ও পদ ছেড়ে দেন। এরপর সেই পদেই প্রার্থী হয়ে তিনি দাঁড়ালেন স্বতন্ত্র পরিচিতিতে। তারপর বিপুল সমর্থনে পুনঃ-নির্বাচিত হলেন সেই পদে।

বঙ্গচিত্তবিজেতা শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক কেরিয়ার এরপর থেকে আর থেমে থাকেনি। চৌত্রিশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ পাওয়ার পরেই তিনি সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করেন। পরের বছর ব্যাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের কোর্ট এবং কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। তিনি হিন্দু সংস্কৃতি চেনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উনিশশো উনচল্লিশ সালে যোগ দিলেন নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভায়। পরের বছর নির্বাচিত হলেন ওই মহাসভার সর্বভারতীয় সংগঠনের কার্য নির্বাহক সভাপতি। সেইসঙ্গে দায়িত্ব পেলেন বঙ্গীয় হিন্দুসভারও সভাপতি পদটির।

কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার পর শ্যামাপ্রসাদের পরবর্তী পর্যায়ে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভাতে যোগদান যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদের গোঁড়া সমর্থক এই মহাসভাতে যোগদানের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ 'জন সংঘ' গঠনের ইঙ্গিতটি টের পাওয়া যায়। যে বছর

রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখতে শুরু করেছিলেন। তার মানে কিন্তু এই নয় যে তিনি কট্টর মুসলিম বিরোধী ছিলেন। তাঁর ডায়েরি পড়লে এটা পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে তিনি বরাবরই হিন্দু মুসলমানের সহাবস্থানের দিকটিই কামনা করতেন। কিন্তু ব্রিটিশ বেনিয়ারা রাজনৈতিক ধান্দার কারণে তাতে বেশ ভালভাবেই ঘুণ ধরাতে পেরেছিল। সেজন্যই বোধহয় তিনি বাধ্য হয়েছিলেন হিন্দুদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে।

তারপর এল ১৯৫১ সাল। শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টায় গঠিত হল তাঁর কল্পনার রাজনৈতিক দল। ভারতীয় 'জনসংঘ'। এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের সভাপতি হলেন স্বয়ং শ্যামাপ্রসাদ। হিন্দু মহাসভার সঙ্গে মনোমালিন্য এবং ভারতীয় জনসংঘের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব পরিষ্কার বোঝা যায় উনিশশো ছেচল্লিশ সালের দশ জানুয়ারির ডায়েরিতে লেখা অংশবিশেষ থেকে।

'আমাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরতে লাগল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বন্যার সামনে যেমন ঘর দুয়ার ভেসে ভেসে যায়, সেই রকম কংগ্রেসের বিরোধী যারা দাঁড়িয়েছিল তারা সরে যেতে লাগল। কতক লোক-স্বার্থের খাতিরে হিন্দু মহাসভার নাম নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারা সরে পড়া বুদ্ধিমানের পরিচয় বলে মনে করল। হিন্দু মহাসভাপন্থী কিছুলোকও সরে দাঁড়াল–না জিজ্ঞাসা করে বা অনুমোদন না নিয়ে। কাউকে লোভ দেখিয়ে সরিয়ে দেওয়া হ'ল। মোট কথা আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখলাম চারদিকে। জীবনে হারজিৎটাই বড় কথা নয়। দুটো দল থাকলে দুজনেই জিততে পারেনা। সত্য কি এবং সেই সত্যের উপর বিশ্বাস কতটা পরিমানে আছে এই আসল কথা। কংগ্রেস মুসলমান কেন্দ্রে তাঁদের প্রার্থী দাঁড় করালেন না–দু একটি ছাড়া যেখানে কংগ্রেস নামে মুসলমান জয়ী হলেন, সে হল যুক্ত নির্বাচন কেন্দ্র ও হিন্দুর ভোটের সংখ্যা বেশি জাতীয়তাবাদী মুসলমান ও অন্য নামে মুসলমান দাঁড়ালে লীগের বিরোধিতা করে। তাদের সঙ্গে প্রকাশ্য সহযোগিতা কংগ্রেস করতে দ্বিধা বোধ করল না। কিন্তু কংগ্রেসের বাইরে জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের সঙ্গে কোনরকম মিলন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হল।'

জনসংঘ তৈরির সময় শ্যামাপ্রসাদ বিশ্বাস করতেন হিন্দুদের ভোট তদানীন্তন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ব্যবহার করলেও আশ্চর্যের ব্যাপার তারা কিন্তু কোনভাবেই হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা করতে আগ্রহী হয়নি। এ সম্পর্কে তাঁর ডায়েরির অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে, যার মাধ্যমে ওই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে: 'হিন্দুদের ভোট নিয়েই কংগ্রেস ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ করতে পারে, অথচ হিন্দুদের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষা করতে কংগ্রেস অক্ষম এবং নিজেদের হিন্দু প্রতিনিধি বলে স্বীকার করতেও রাজি নয়। এর চেয়ে হিন্দুর দুর্ভাগ্য কি আর হতে পারে। তার রাজনৈতিক শক্তিকে লাঘব করতে, নষ্ট করতে, ইংরাজ-মুসলমানদের একাংশের সঙ্গে এক বিরাট চক্রান্ত ফেঁদে বসেছে কিন্তু হিন্দু তার নিজের কোন প্রতিষ্ঠান করতে চায় না। যে প্রতিষ্ঠান আমরা এত বাধা সত্ত্বেও গড়ে তুলতে চেষ্টা করছি, তাকে স্বহস্তে ভাঙতে সে আনন্দবোধ করে।'

জনসংঘ সৃষ্টির সূত্রপাত উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে। ওই বছরে উনিশশো আটচল্লিশ সালের আগস্ট মাসের সম্মেলনে হিন্দু মহাসভার পক্ষে সেই সিদ্ধান্ত নাকচ করা হয়। ওই মহাসভাতে শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভাকে রাজনীতি ছেড়ে সামাজিক কাজকর্ম করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেদিনের সভাতে তাঁর ওই প্রস্তাবটি নাকচ করে দেওয়া হয়। দলীয় নেতারা রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব নিলেন। দল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন শ্যামাপ্রসাদ। 'হিন্দু' নামের বাইরে থেকেই রাজনৈতিক লড়াই করার জন্য এসময় তৈরি করলেন প্রথম রাজনৈতিক দল 'পিপলস পার্টি'। পিপলস পার্টি ব্যর্থ হতে এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের উপর সরকারি আক্রমণ নেমে আসার পর হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টায় এরপর গঠিত হলো 'জনসংঘ'।

এরপর থেকে শ্যামাপ্রসাদের কর্মরথ কখনই থেমে থাকেনি। বরং ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে সক্রিয়ভাবে ছুটে বেড়িয়েছে। জনসংঘ তৈরির পর শ্যামাপ্রসাদ পুরোপুরি হিন্দু উত্থানের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, সঙ্গে পেলেন দুই সুযোগ্য কিশোর অনুসারী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং লালকৃষ্ণ আদবানিকে। নিজের কাজের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে চিনে, লালন করে, তাকে সঞ্জীবিত করে যাওয়ার ব্যবস্থাও করলেন।

এসময়ই পশ্চিমবঙ্গে সংগঠনকে মজবুত করার প্রচেষ্টায় নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়িকে সংগঠনের পাশে পান শ্যামাপ্রসাদ। বাংলা মঞ্চাভিনয়ের তথা নাট্যআন্দোলনের এই প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বকে পেয়ে তিরি সারা বাংলা চষে বেড়াতে লাগলেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে নিয়ে মফঃস্বলের জেলায় জেলায় শুরু করলেন 'হিন্দু জাগরণ কর্মসূচী'। এমন সময়ই এসে পড়ল রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন। শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগে অধিকাংশ কেন্দ্রে জনসংঘ প্রার্থী ছিল। এবং পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে সেই প্রথম ও সেই শেষ বারের মত জনসংঘ বিধায়ক পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। তখন প্রকৃতপক্ষে শ্যামাপ্রসাদ নামটি ছিল বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলের একটি নাড়িছেঁড়া টান। বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে পিতা স্যার আশুতোষের মতো তাঁর সম্পর্ক ছিল দারুণ নিবিড়। ১৯৫২ সালে কটক বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তাই সংস্কৃতি পরায়ন বাঙালি শ্যামাপ্রসাদকে প্রাণের

ব্রাবোর্নের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ

আপন করে নিয়েছিল সহজেই। যাঁকে মঞ্চে একটিবার দেখার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকত লোক কলকাতা ময়দানে কিংবা মফঃস্বলে মাঠে। স্বয়ং শিশিরকুমারও তাঁর স্বল্প রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহকর্মীদের বলেছিলেন–শ্যামাপ্রসাদ নামের জাদুই তাঁকে জনসংঘের হয়ে প্রচারে নামা বাধ্য করেছে।

১৯৫২ সালে শ্যামাপ্রসাদ দক্ষিণ কলকা লোকসভা কেন্দ্র থেকে এম·পি· নির্বাচিত হন। এ লোকসভায় ন্যাশনল ডেমোক্রেটিক পার্টি ন সংঘবদ্ধ বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির প্রা করেন এবং স্বয়ং তাঁর নেতৃত্ব দেন। কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ১৯৭৭ সা ১৯৮৯ সালে যথাক্রমে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও বি সিং বিরোধী ঐক্যের যে প্রয়াস চালিয়েছেন ও হয়েছেন সেই রাজনৈতিক পথের হদিশ সব আগে দিয়েছিলেন এই বঙ্গতনয় শ্যামাপ্রস এমনকি বিরোধীরা লোকসভা নির্বাচনের যেভাবে ভারতবন্ধ ডেকেছিলেন তারও গোড় করেন এই শ্যামাপ্রসাদ। ১৯৫২ সালে ভ রেলের পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে ভারত সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন এবং তাকে স করেন। ১৯৭৮ সালে ইন্দিরা গান্ধীর ক

জনসংযোগে ব্যস্ত শ্যামাপ্রসাদ

ছবি: হীরক সেন

বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদের দেখানো পথেই জয়প্রকাশ নারায়ণ বিরোধী ঐক্যকে গ্রথিত করেন। সেসময় শ্যামাপ্রসাদের জনসংঘ নিজের অস্তিত্ব মিশিয়ে দেয় জনতা পার্টির সঙ্গে। পরে আবার ১৯৮৪ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে তাঁরা জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে ভারতীয় জনতা পার্টি সংক্ষেপে বি জে পি নাম গ্রহণ করেন। বি জে পির সর্বভারতীয় সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানিকে এই বি জে পি আদর্শপুরুষদের কথা জিজ্ঞাসা করাতে বর্তমান প্রতিবেদককে তিনি বিবেকানন্দ, নেতাজীর পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদের নাম উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, 'বি জে পি আজ যে আদর্শের জন্য লড়ছে একদিন তার পথ দেখিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদই।'

এরপর এল সেই কলংকিত ১৯৫৩ সাল, এই সালেই রাজনৈতিক চক্রান্তের বলি হতে হল বাঙালির তেজোদৃপ্ত রাজনৈতিক কণ্ঠস্বরকে। সেসময় প্রায় প্রতিদিনই লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যা, শেখ আবদুল্লার কাজকর্ম এবং কংগ্রেস সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি হচ্ছে বিরোধী দলনেতা শ্যামাপ্রসাদের। সংবাদ মাধ্যম মুখর থাকছে শ্যামাপ্রসাদের প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ে। তখনই শ্যামাপ্রসাদ দাবী করে বসলেন—ভারতে সব রাজ্যের সমান মর্যাদা। তাই শেখ আবদুল্লার আবদার রাখতে শুধুমাত্র কাশ্মীরকে সংবিধান-গতভাবে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া চলবে না। পণ্ডিত জওহরলাল তাঁর সে দাবী তৎক্ষণাৎ নাকচ করলেন। তার প্রতিবাদে প্রত্যক্ষ বিরোধিতার পথে নামলেন শ্যামাপ্রসাদ। শ্যামাপ্রসাদ মনে করতেন কাশ্মীরকে যদি এই মর্যাদা দেওয়া হয় তাহলে সে ভারতের সঙ্গে থেকেও কোনদিন ভারতের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারবে না। যার পরিণতিতে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতা তার থেকেই যাবে। মাত্র ৩৬ বছর বাদেই শ্যামাপ্রসাদের সেদিনকার কথা অমোঘ ভবিষ্যৎবাণীতে পরিণত হচ্ছে। আজকের কাশ্মীর কি শ্যামাপ্রসাদ কথিত কংগ্রেসের সেই ভুল রাজনীতির ফসল নয়? তাই বাঙালি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় কাশ্মীর ঘুরে এসে লেখেন—'কাশ্মীর যাবেন না!' (আলোকপাত পূজা সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

শ্যামাপ্রসাদ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাশ্মীর পলিসির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই—এ মাঠে নামলে রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস সরকার তাঁর বিরুদ্ধে ফর্জি মামলা দায়ের করলেন ভয় দেখিয়ে থামাতে। তবু সারা দেশের প্রান্তে প্রান্তে তিনি সংগঠিত করতে লাগলেন সত্যাগ্রহ আন্দোলন। যারই পরিণতিতে মে মাসে তিনি আন্দোলন সংগঠিত করতে কাশ্মীর গেলেন। সেখানে ভারতের নিরাপত্তার দোহাই পেড়ে জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা জাতীয় নিরাপত্তা আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন। তারপর তাঁকে লোকচক্ষুর অন্তরালে বন্দীজীবন কাটাতে হল ২২ জুন পর্যন্ত। ২৩ তারিখ সকালে আচমকা প্রচার করা হয় তাঁর মৃত্যু সংবাদ। দেশবাসী বজ্রাহত স্তম্ভিত। বন্দী অবস্থায় এক অভূতপূর্ব রহস্যের মধ্যে মারা গেলেন শ্যামাপ্রসাদ। যে রহস্যের কিনারা আজ পর্যন্ত হয়নি। যার জন্য বিধানচন্দ্র রায় এমন কি জওহরলাল নেহরুও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে অনুরোধ করেন শেখ আবদুল্লাকে। যা আবদুল্লা সাহেব কোনদিনই করেননি। তাই বাঙালি তথা ভারতবাসী বিশ্বাস করেনি তার প্রচারিত সংবাদকে।

লড়াই, লড়াই। সারা জীবন শুধু লড়াই। কাশ্মীরে বন্দীদশায় মৃত্যুর আগে পর্যন্ত লড়াই থামাতে চাননি বাংলার এই বীর পুরুষটি। যেখানে অনিয়ম সেখানেই লড়াই। আপোস না করার জন্য অনেক নিন্দা মন্দ সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। কেউ বলেছেন বড় বেশি হিন্দুপ্রেমী। অথচ কি আশ্চর্য, তামাম ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি কি অনায়াসে সাম্প্রদায়িক তোষণ করে পার হয়ে গেল নির্বাচনী বৈতরনী। পার পেয়ে যায় এখনকার রাজনৈতিক ধ্বজাধারী ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষগুলিও। এজন্য মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও শ্যামাপ্রসাদের ক্ষোভ ছিল চরমে। সংখ্যালঘু তোষণের আড়ালে ভোটরাজনীতির ফয়দা লোটার বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম প্রতিবাদের মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে আন্দোলিত করে শ্যামাপ্রসাদ সচকিত করে তুলেছিলেন তামাম ভারতবাসীকে, মানেন নি পাহাড়প্রতিম বাধা, তুচ্ছ করেছেন যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা। রাজনৈতিক নিষ্ঠার যে বীজ তিনি পুঁতেছিলেন কয়েক দশক আগে, সেই চারাগাছ থেকে আজ মহীরূহ রূপান্তরিত হয়েছে তামাম ভারতের চতুর্দিকে। তাই আজ ভারতীয় রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র হিন্দি হৃদয়বলয় শ্যামাপ্রসাদের সুরে সুর মিলিয়ে বলছে সংরক্ষণ নয় সমউত্থান, সংখ্যালঘু কমিশন নয় চাই মানবাধিকার কমিশন। চাই দেশের সব ধর্মালম্বীর জন্য সমান আইন। দুর্নীতির পঙ্কে নিবদ্ধ ভারতে চাই মূল্যবোধ ভিত্তিক রাজনীতি। আর এসবের শিক্ষাই দিয়ে গেছেন শ্যামাপ্রসাদ। বি জে পি বহন করে চলে তারই অমর পতাকা। তাইতো বি জে পির এই অভূতপূর্ব গণউত্থান।

দায় আমাদেরই, আমরা তাঁকে আলোকিত করতে পারিনি। সারা দেশে যখন ঝড়ের মত ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মযজ্ঞের স্রোত বয়ে চলেছে, তখন আমাদের দায়িত্ব ছিল তাদের আদিপুরুষকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরা। দেরিতে হলেও আলোকপাত জাতির প্রয়োজনে সে দায়িত্বই পালন করার চেষ্টা করল। কতটা সফল হল জানিনা। কিন্তু এটুকু জানি রাজনৈতিক চক্রান্ত করে ব্যক্তিকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তার আদর্শকে সরানো যায় না। তাই শ্যামাপ্রসাদকে সরিয়ে দেওয়া গেলেও তাঁর আদর্শকে সরিয়ে দেওয়া যায়নি। লোকসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে ভারতের মানুষ তাই প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

রমাপ্রসাদ ঘোষাল

ছবি: সুস্মিতা চৌধুরী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সাহিত্যিক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন রাজ্যপাল হরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মেমোরিয়াল হল, আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট, শ্যামাপ্রসাদের আত্মীয়স্বজন, ভারতীয় জনতা পার্টির প: ব: রাজ্য কমিটি।

পশ্চিমবংগে বি·জে·পির নেতৃত্বে ধর্মীয় দলগুলি সি·পি·এমের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে?

পশ্চিমবাংলায়ও বাড়ছে শক্তি

বি জে পি এখন সর্বভারতীয় রাজনীতিতে শক্তিশালী

লোকসভা এবং সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে বি.জে.পির বিশাল সাফল্য এ রাজ্যেও সি.পি.এম-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রবলভাবে বি.জে.পিকে প্রতিষ্ঠা করছে। হিন্দু ধর্মসংস্কৃতির উদ্বুদ্ধকরণের ডাক দিয়ে মার্কসবাদীদের মোকাবিলায় বি.জে.পি সঙ্গে নিতে চাইছে অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনগুলিকে। এই মুহূর্তে পশ্চিমবংগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চক্রের নেপথ্যপট বিশ্লেষণ।

৮ মার্চ। ১৯৯০। বৃহস্পতিবারের সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় রাজ্য বি.জে.পি কর্মসমিতির একটি দাবী পশ্চিমবংগের রাজনৈতিক মহলকে দারুণ নাড়া দিয়ে গেল। অবিশ্বাস্য ভাবে বি.জে.পি দাবী করে পুরুলিয়ার আনন্দনগরে আনন্দমার্গীদের উপর সি.পি.এম এবং পুলিশের যৌথ আক্রমণ ও তাণ্ডবের উপর রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। বি·জে·পির রাজ্য সভাপতি সুকুমার ব্যানার্জি এবং সম্পাদক পরেশ দত্ত ও তপন শিকদারের এই ঘোষণা শুনে যারা চমকে উঠলেন তারা জানতেন বি·জে·পি ও আনন্দমার্গের মধ্যে তত্ত্বগত ও আদর্শগত ফারাক এত বেশি যে প্রায় দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা ওরা। মিল শুধুমাত্র দুটি জায়গায় এক দুপক্ষের সঙ্গে মার্কসবাদীদের তীব্র বিরোধ, আর দুই-দুইপক্ষই ঈশ্বর বিশ্বাসী। কিন্তু যাদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক এমনকি দার্শনিক পার্থক্যও এত বেশি সেই রাজনৈতিক দল বি·জে·পি এবং দাবীকৃত আধ্যাত্মিক সংগঠন আনন্দমার্গ সি পি এম বিরোধিতার ক্ষেত্রে একজনের পাশে অপরজন দাঁড়াতে পারে কি করে? তবে কি এর পিছনে বি·জে·পির কোন রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক উদ্দেশ্য আছে।

এই বিষয়টি তখনই পরিষ্কার হবে যখন গত ২৩ জানুয়ারি কলকাতার এসপ্ল্যানেড ইস্টের একটি সভার কথা মনে পড়বে। এই দিন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বি·জে·পি, সন্তানদল এবং কংগ্রেস নেতারা একমঞ্চে ভাষণ দেন। এবং ওইদিনের কিছু ভাষণে সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবংগের রাজনীতিতে এই দুই অভিযোগই এখন সি·পি·এম নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে করা হয়ে থাকে। আরও উল্লেখ করার বিষয় হল এই মিটিং-এ কংগ্রেসের কলকাতাস্থ এম·পি অজিত পাঁজা ছাড়া অন্যান্য কোন নেতা উপস্থিত না থাকলেও সন্তানদলের স্রষ্টা বালক ব্রহ্মচারী ও বি·জে·পি রাজ্য নেতৃত্বের প্রধান সুকুমার ব্যানার্জি, তপন শিকদার ও পরেশ দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অথচ গত বছর পর্যন্ত সি·পি·এম রাজ্য সম্পাদক প্রয়াত সরোজ মুখার্জির মত সি·পি·এম নেতারা দাবী করতেন সন্তানদল বামফ্রন্টের সমর্থক বলে। কিন্তু সেই কথিত বাম সমর্থক সন্তানদল হঠাৎ কট্টর সি·পি·এম বিরোধী প্রবল রাজনৈতিক শক্তি বি·জে·পির সঙ্গে এত দহরম মহরম আরম্ভ করল কেন! এমনকি সন্তানদলের মুখপত্র 'কড়া চাবুক'-এ বি·জে·পির হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের দাবীকে সমর্থন জানিয়ে সন্তানদলের আধ্যাত্মিক পিতা বালক ব্রহ্মচারী বলেন, 'দেশভাগের সময়ে পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা যে অত্যাচার হিন্দুদের উপর করেছে, যেভাবে নির্যাতনের রোলার

চালিয়েছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। এমতাবস্থায় মুসলমানেরাই আমাদের পরোক্ষে শিখিয়ে দিল মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে। সুতরাং তারা যদি মুসলিম রাষ্ট্র গড়তে পারে, বি·জে·পি কেন বলতে পারবে না যে আমরা হিন্দুরাষ্ট্র গড়ে তুলব।' এই মুখপত্রেই বালক ব্রহ্মচারী আরও ঘোষণা করেছেন–'সারাদেশে সন্ত্রাস রুখতে বি·জে·পি ও সন্তানদল একসঙ্গে এগিয়ে যাবে। দরকার হলে সন্তানরা বি·জে·পি কর্মীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে। বি·জে·পি মুসলিম বিদ্বেষী নয়। এবং তারা কোন সাম্প্রদায়িক উষ্কানিও দেয়না। বি·জে·পি সমস্ত সৎকাজে আমার সাহায্য চায়। আমিও সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।' এরপরেই মেদিনীপুর ও দাঁতনে সি·পি·এম, সন্তান-দলের কর্মীদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে এবং যথাবিহিতভাবে তার প্রতিরোধ করা হবে বলে বি·জে·পি রাজ্য দপ্তর থেকে কড়া বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু এই দুটি আশ্চর্য ঘটনা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটির জন্ম দেয় তা হল–এইভাবে সি·পি·এম বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে বি·জে·পি আনন্দমার্গ এবং সন্তানদলকে নিজের কাছে টেনে নিচ্ছে কেন? তবে কি সি·পি·এমকে এরাজ্য থেকে উৎখাত করার লক্ষ্যে পৌঁছতে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিবংগের ধর্মীয় সংগঠনগুলিকে নিজস্ব রাজনৈতিক সহায়কের ভূমিকায় নামাতে চলেছে?

এর মূল কারণটি খুঁজে পাওয়া যাবে বি·জে·পির ৩ মার্চ নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কর্মসমিতির প্রস্তুতি বৈঠকে। এই বৈঠকে কেন্দ্রিয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে সাংগঠনিক কৌশল স্থির করা হয়, তা হল আট রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচনের পরই উৎখাত করা প্রো হিন্দু সংগঠন গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে রাজ্যকে কব্জা করা। কারণ পশ্চিমবংগই একমাত্র রাজ্য যেখানে খৃশ্চান রাজনৈতিক শক্তি উল্লেখনীয় নয় এবং মুসলিম জনসংখ্যা ১৩ শতাংশ মাত্র। আর প্রধান বিরোধীদল কংগ্রেস জ্যোতি-স্তুতিতে মগ্ন, তাদের কর্মীরাই তাদের নেতৃত্বের উপর আস্থা হারিয়েছে। সেজন্য পশ্চিমবংগ কব্জা করার সাংগঠনিক কৌশল স্থির করতে পরবর্তী জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক ৬ এপ্রিল কলকাতায় করা হবে! তার আগে রাজ্য বি·জে·পি কে নির্দেশ দেওয়া হল রাজ্যের সর্বধর্মীয় সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ কম্যুনিস্ট বিরোধিতার পথে নিয়ে আসতে। কারণ বি·জে·পির নেতারা ঠিকই বুঝেছেন সি·পি·এমের ক্যাডার শক্তি মোকাবিলা করে রাজ্যক্ষমতা দখল করতে হলে মার্কসইজম বনাম স্পিরিচুয়ালিজম এর লড়াইটা মাঠে নিয়ে যেতে হবে। তাই এভাবে ধর্মীয় সংগঠনগুলিকে কব্জা করার জন্য বি·জে·পির এই সুক্ষ্ম এবং সফল রাজনৈতিক কৌশল যা আগামী বাংলার রাজনৈতিক পরম্পরাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। কিন্তু এবিষয়ে বি·জে·-পি-র গোপন রূপরেখাটি কি?

বি·জে·পির সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানের পিছনে পড়ে থাকা দীর্ঘ রাস্তার দিকে তাকালে দেখতে পাই, ১৯৫১ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত 'জনসঙ্ঘ' কে। '৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় জনসঙ্ঘ মিশে যায় জনতা পার্টিতে। এবং '৮০-র নির্বাচনের পর জনতাপার্টি থেকে বেরিয়ে এসে এই জনসঙ্ঘই জন্ম দেয় ভারতীয় জনতা পার্টি-র। যা এতদিন হিন্দিবলয়ের রাজ্য রাজনীতিতে কোনরকমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। '৮৫-র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী বি·জে·পির রাজনৈতিক সাফল্য ছিল গুজরাটে ১১, হিমাচল প্রদেশে ৭, মহারাষ্ট্রে ১৬, উত্তর প্রদেশে ১৬, অন্ধ্রপ্রদেশে ১১, রাজস্থানে ৩৬, বিহারে ১২, মধ্যপ্রদেশে ৫৮ এবং ওড়িশায় ১টি। '৮৯-র লোকসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত এই বি·জে·পি মাটি কামড়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে অনুপ্রবেশের ক্যাডার বেসড জমি তৈরি করে গেছে। আর তার সাংগঠনিক কাজে পরোক্ষভাবে শক্তি জুগিয়েছে আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও অন্যান্য কয়েকটি হিন্দু মনোভাবাপন্ন ধর্মীয় সংস্থা।

এবার লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বি·জে·পি সারা ভারতে রাজনৈতিক ঝড় তোলে রাম-জন্মভূমি ইস্যুকে সামনে রেখে। এই ইস্যুতে বি·জে·পি-র সঙ্গে আর এস·এস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। যদিও বি·জে·পির রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মূলে আর·এস·এস-র অনেকটাই অবদান আছে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, তাদের হিন্দুরাষ্ট্রের দাবীকে রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যাবার জন্যই আর·এস·এস ছিল জনসংঘের প্রধান হাতিয়ার। কারণ জনসংঘ তখন প্রকাশ্যেই হিন্দুস্বার্থ রক্ষায় সংগ্রামের ডাক দিত। এবং ওই আর·এস·এস থেকেই উঠে আসত বি·জে·পির রাজনৈতিক ক্যাডাররা। এরপর জনসংঘ অধুনা বি·জে·পি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর তখনকার সভাপতি অটল বিহারী বাজপেয়ীর রাজনৈতিক বক্তব্যে আর·এস·এস-এর সঙ্গে আদর্শগত দূরত্ব বাড়তে থাকে। বাজপেয়ী বলতে থাকেন, হিন্দুরাষ্ট্রের দাবীকে একমাত্র মূলধন করে জাতীয় রাজনীতি চালানো অসম্ভব। এর সঙ্গে আর্থ সামাজিক

লালকৃষ্ণ আদবানী

কেন্দ্রিয় সমিতির মিটিং

কর্মসূচিগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এখানেই আর·এস·এস-র সঙ্গে বি·জে·পির ঠাণ্ডা বিরোধ বাধে। কিন্তু গত লোকসভা নির্বাচনের আগে রামমন্দির গড়ার দাবীতে বি·জে·পি হিন্দু স্বার্থের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিলে আর·এস·এস আবার ঘনিষ্ট হয়। বি·জে·পিও কট্টর হিন্দুয়ানাকে অন্যতম মূলধন করে নির্বাচনী ময়দানে নেমে পড়ে।

পশ্চিমবংগ রাজ্য বি·জে·পির সম্পাদক তপন সিকদার অবশ্য বলেন, 'বি·জে·পি তথাকথিত হিন্দু রাষ্ট্রের কথা বলেনা। হিন্দুরাষ্ট্রের নামে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকে আঘাত দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানোর ঘোরতর বিরোধী। আসলে ভারতে বসবাসকারী সকলেই বাই রেস হিন্দু। হিন্দুত্ব শুধু ধর্ম নয়, একটি সংস্কৃতি। হিন্দুত্ব নিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে বিকৃত প্রচার করা হচ্ছে। আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির জন্য আমরা নিশ্চয়ই গর্ববোধ করি। তবে বি·জে·পি ধর্ম-নিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থে বিশ্বাসী। কিন্তু আমাদের দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ করে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতি তোষণদারী নিয়ে রাজনৈতিক ধান্দাবাজি হচ্ছে। যা ভারতের সংবিধান বিরোধী। বি·জে·পি ভোট আদায়ের ধান্দায় ভারতের এই সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থক্ষুণ্ণ করার বিরোধী। বোঝা উচিত হিন্দুত্বের জন্যই ভারত ধর্ম নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পেরেছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে সেই সত্য দারুণভাবে উপলব্ধি করা উচিত। উপলব্ধি করা উচিত হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক নয়। এটাই হিন্দুদের চরিত্র ও সংস্কৃতি। গীতায় আছে, 'ইয়ে যথামং প্রপদ্দন্তে তাং তথৈব ভজমহম।' বিবেকানন্দ বলেছেন, 'নট দ্যাট দেয়ার ইজ ট্রুথ ইন এভরি রিজিন বাট এভরি রিজিন ইজ হোললি ট্রুথ।' বি·জে·পি ভারতের শাশ্বত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সেজন্যই বি·জে·পি ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সর্বধর্ম সমভাবের কথা বলে। একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কি করে ভিন্ন ধর্মের জন্য ভিন্ন আইন হয়। আর যদি করাই হয় সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যেভাবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হয়েছে। তাই আমরা চেয়েছি—ইণ্ডিয়ান কমন সিভিল অ্যাণ্ড ক্রিমিনাল কোর্ট। আমরা মাইনরিটি কমিশনের পরিবর্তে হিউম্যান রাইটস কমিশন চেয়েছি। এটাই বি·জে·পির হিন্দু রাষ্ট্রের কাঠামো। যেখানে 'এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান' থাকবে। মানবিকতার প্রশ্নে এদেশের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় সংস্থাগুলি বি·জে·পি-কে সমর্থন করবে এটাইতো বাস্তব। যে কোন ভারতীয়রই করা উচিত।'

বি·জে·পির মতে পশ্চিমবংগে কংগ্রেস সি·পি·এমের ক্যাডার মেসিনারির কাছে পর্যুদস্ত। তবু তাদের মাস বেস টিকে ছিল কেন্দ্রিয় সরকার থাকার সুবাদে। এখন তাও নেই। নেই রাজ্য পর্যায়ে তাদের দক্ষ নেতাও। বি·জে·পি একেই তাই মূলধন করে নেমে পড়ল সংগঠন গড়তে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে চাইল সব সি·পি·এম বিরোধী শক্তিকে এককাট্টা করতে। তাই তারা বলতে লাগল, এরাজ্যে সি·পি·এম ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে শেষ করে দিতে চাইছে। সি·পি·এম একের পর এক পরিকল্পনা মাফিক হামলা চালাচ্ছে মঠ, আশ্রম, (রামকৃষ্ণ) মিশনের ওপর। বঙ্কিম চন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিচ্ছে। রাম ও বাবরের তুলনা করে বাবরকে বিরাট ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে বর্ণনা করছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে বিকৃত করে মার্কসবাদ যা আজ সারা পৃথিবীতে বর্জিত হতে চলেছে তাকে এ রাজ্যে চালাবার চেষ্টা করছে। তাঁরা জানেন না রাম আপাতত মিথোলজিক্যাল হলেও তিনি ভারতীয় ইতিহাসের শাশ্বত পুরুষ। আজ থেকে প্রায় ২,০০১ বছর আগে বিক্রমাদিত্যের মত একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি অযোধ্যায় রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যখন পৃথিবীতে খ্রীস্ট কিংবা মুসলিম ধর্মের জন্মই হয়নি। বাবরি মসজিদের ১৭টি পিলারে হিন্দু দেবদেবীর খোদাইকরা মূর্তি তারই প্রমাণ। অথচ সি·পি·এম তা অস্বীকার করছে। এরাজ্যে জনগণের মধ্যে বি·জে·পিকে নিয়ে মিথ্যে গালগল্প ছড়াচ্ছে। আর হামলা চালাচ্ছে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর। বি·জে·পি তা কখনও বরদাস্ত করবে না। যে কোন ধর্মের অস্তিত্বের প্রশ্নে বি·জে·পি লড়াই করে যাবে। এমনকি মুসলিম, এমন কি খ্রীষ্ট ধর্মের স্বার্থেও। কারণ এটাই সনাতন হিন্দু ধর্মের আদর্শ।...ইত্যাদি...ইত্যাদি।

এরাজ্যে বি·জে·পির আন্দোলনের অন্যতম ইস্যু তাই ভারতীয় দর্শনের বাহক বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থাগুলির পাশে দাঁড়ানো। তাদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে বি·জে·পি যে কোন মূল্যেই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায়। গত ১৩ জানুয়ারি ৯০, বাংলা দৈনিক 'আজকাল'-এ প্রকাশিত বালক ব্রহ্মচারীর বিবৃতিতে এরাজ্যে ধর্মীয় সংস্থাগুলির একজোট সমর্থন-এরাজ্যের ক্ষমতা দখলের লড়াইতে বি·জে·পির দিকে বর্তাবে তার প্রচ্ছন্ন ইংগিত পাওয়া যায়।

এই বিবৃতিতে বালক ব্রহ্মচারী বলেন, সন্তানদল বি·জে·পির হিন্দুরাষ্ট্রের দাবী সমর্থন করে। সন্তানদলের মুখপত্র 'কড়া চাবুক'-এর ডিসেম্বর সংখ্যায়

বি জে পি-র পশ্চিমবঙ্গ শাখা প্রধান তপন শিকদার

কলকাতায় বি জে পি-র পতাকা

বি শে ষ প্র তি বে দ ন

বালক ব্রহ্মচারী জানিয়েছেন, 'মুসলিমরা যদি ইসলামিক রাষ্ট্র গড়তে পারে বি·জে·পি কেন বলতে পারবেনা আমরা হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তুলব?' এছাড়াও তিনি জানিয়েছেন সারা দেশে সন্ত্রাস রুখতে বি·জে·পি ও সন্তানদল একই সঙ্গে এগিয়ে যাবে। বি·জে·পিও সমস্ত 'সৎকাজে' সন্তানদলের সহযোগিতা চায়। সন্তানদলও সেই সহযোগিতায় হাত বাড়াতে প্রস্তুত।

কয়েক মাস আগেও সাম্যবাদ ও বেদভিত্তিক সাম্যবাদের মধ্যে গূঢ় সামঞ্জস্য বের করে যে সন্তানদল বামফ্রন্টকে পরোক্ষভাবে সমর্থন জানিয়ে আসছিল। সি·পি·এম রাজ্য নেতৃত্ব তখন প্রকাশ্যেই বলতেন–সন্তানদল বামফ্রন্টের সমর্থক। জ্যোতি বসু, সরোজ মুখার্জি, সুভাষ চক্রবর্তী এবং শান্তি ঘটকের সঙ্গে বালক ব্রহ্মচারীর মাখামাখি তখন ছিল সংবাদপত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়ের একটি। এরকম একটি সমর্থক দলের এই ধরনের বিবৃতি রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তো বটেই, সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে। এর কারণ সন্তানদলের ওপর সি·পি·এম সমর্থকদের একের পর এক হামলা!

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধ্যানেশ চক্রবর্তী

বালক ব্রহ্মচারী

বামফ্রন্ট প্রশাসনের প্রতি বালক ব্রহ্মচারী প্রকাশ্য বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন গত ২৮ এপ্রিল ১৯৮৮-র রাতে। যখন তারাতলায় সন্তানদলের মন্দির ভাঙা ও একটি হত্যার ঘটনা ঘটে। সেদিন তিনি বলেছিলেন, 'এরাজ্যে প্রায়ই আমাদের ওপর হামলা হচ্ছে। যেখানেই ধর্মস্থান, সেখানেই বামপন্থীদের হামলা। ধর্মকে বিনাশ করে দেওয়ার খেলায় মার্কসবাদীরা উঠে পড়ে লেগেছে।' সন্তানদলের ওপর সি·পি·এম সমর্থকদের হামলার নথিভুক্ত নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি তারই প্রমাণ। যাদবপুরে অজয় নগরের অন্তর্গত মুকুন্দপুরে, বাঁকুড়ার উত্তরাঞ্চলের ২নং কমিটির অন্তর্ভুক্ত পিড়বাবলী, মেদিনীপুরের শালবনী, বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ও শক্তিগড়ে, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদের ডোমকল, ২৪ পরগনার পানিহাটি, খড়দহ প্রভৃতি এলাকায় সন্তানদলের ওপর সি·পি·এম সমর্থকদের হামলার ঘটনাগুলি সন্তানদলকে নিরাপত্তার ব্যাপারে ভাবিয়ে তুলছে। তাই তারা নিরাপত্তার জন্য হাত বাড়িয়েছে সমমনোভাবাপন্ন দলের দিকে। আর সুযোগ বুঝে বি·জে·পিও তাদের দিকে বন্ধুত্বের ও নির্ভরতার হাত বাড়িয়েছে।

সম্প্রতি বি·জে·পির রাজ্য সভাপতি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যতম রাজ্য সম্পাদক পরেশ দত্ত সন্তানদলের দপ্তরে গিয়ে বালক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা করেন। তারপরই মেদিনীপুরের দাঁতন ও উত্তরবঙ্গে সন্তানদলের ওপর সি·পি·এম· কর্মীদের হামলার ব্যাপারে সন্তানদলের পক্ষ থেকে বি·জে·পির রাজ্য অফিসে চিঠি আসে। বি·জে·পির রাজ্য কমিটির সভাপতি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রেস বিবৃতি দেন, 'সন্তানদলের কর্মীদের ওপর সি·পি·এম

এসপ্লানেড ইস্টে হিন্দু মনোভাবাপন্ন দলগুলির জমায়েত

বি জে পি সহযোগিতা চাইলে, আমি আছি।

বালক ব্রহ্মচারী

প্রশ্ন: ভারতের সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলি এতদিনের রাজনৈতিক ট্র্যাডিশনকে অন্যদিকে চালিত করছে বলে মনে হচ্ছে। আপনি কি এর মধ্যে 'নতুন ভারতবর্ষ'–এর ইংগিত পাচ্ছেন?

বালক ব্রহ্মচারী: ভারতের পরিবর্তনের কথা আমি বহুদিন ধরেই বলে আসছি। তবে এখনও সেই প্রার্থিত পরিবর্তন আসে নি। আরও যত দলাদলি, মারামারি হবে ততই এর পরিবর্তন দেখা যাবে। আমরা ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলি। কিন্তু হিন্দু-মুসলিম এই দুটি জাত কোনদিন মিলিত হতে পারবে না। তাই আমি 'হিন্দু রাষ্ট্রে'র কথা বলেছি। কারণ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে যদি মুসলিম রাষ্ট্র হতে পারে, ভারতইবা হিন্দুরাষ্ট্র হবে না কেন?

প্রশ্ন: আপনি কি মনে করেন এ রাজ্যের ধর্মীয় সংস্থাগুলি আজ বিপন্ন প্রায়?

বালক ব্রহ্মচারী: হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। আমার সন্তানদের ওপর একের পর এক অত্যাচার চলছে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে। আমার একটি অঙ্গুলি হেলনেই আগুন জ্বলে যেতে পারে। আমি শুধু এক হাতে দেশলাই কাঠি আর অন্য হাতে বাক্সটি নিয়ে বসে আছি। একবার জ্বালিয়ে দিলে সে আগুন নেভানো যাবে না। সাড়ে পাঁচ কোটি সন্তানের পিতা আমি। আমার সন্তানেরা শুধু সেই নির্দেশের অপেক্ষায় চেয়ে আছে।

প্রশ্ন: এ রাজ্যের সকল ধর্মীয় সংস্থাগুলি কি একত্রিত হয়ে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে?

বালক ব্রহ্মচারী: তথাকথিত ধর্ম আমি মানি না। আমার কাছে ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা নয়। তবে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিতে আমি যেমন নেই তেমনি তথাকথিত ধর্মেও নেই। সুতরাং কোন ধর্মীয় সংস্থা কি করল না করল আমার তাতে কোন আগ্রহ নেই। মহৎ উদ্দেশ্যে, জাতির স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে তারা যদি আমার সহযোগিতা চায়, আমিও আদর্শগত ভাবে সেই সহযোগিতায় হাত বাড়াব।

প্রশ্ন: আপনাদের এই মিলিত শক্তি কি বি জে পি-কে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সমর্থন জানাবে? কেননা বি জে পি-র রাজ্য কমিটির বক্তব্য ভারতের ঐতিহ্য বহনকারী সকল ধর্মীয় সংস্থার অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

বালক ব্রহ্মচারী: বি জে পি, আনন্দমার্গী হল ভিন্ন মনের সংগঠন। এদের সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। অবশ্য তারা যদি মহৎ কাজে আমার সহযোগিতা চায়, আমিও এগিয়ে যাব। তাতো আগেই বলেছি। তবে এখানে লিখে রাখুন কিছু লোক আমার সঙ্গে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সি পি এম–এর সংঘর্ষ বাধাতে চাইছে। তা আমরা হতে দেব না। মনে রাখবেন জ্যোতি বসুর বাবা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। জ্যোতি বসুকেও আমি খুব স্নেহ করি।

প্রশ্ন: এ রাজ্যের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের জন্য বি জে পি পরিকল্পনা মাফিক আন্দোলনে নামছে। শোনা যাচ্ছে '৭৭-এর পর এমন ইতিবাচক পক্ষে আর কোন রাজনৈতিক দলকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় নি। পেছনে ধর্মীয় সংস্থাগুলির মিলিত শক্তির সমর্থন থাকলে রাজনৈতিক চিত্রটি কেমন দাঁড়াবে বলে আপনি মনে করেন?

বালক ব্রহ্মচারী: বি জে পি কি করছে না করছে আমি জানি না। তারা আমার কাছে এসেছিলেন এই যা। তবে আগামী নির্বাচনের পর বিরাট পরিবর্তন যে আসছে তা অস্বীকার করা যায় না।

বিশেষ প্রতিনিধি

ধর্মীয় সংস্থাগুলির অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে বি জে পি আন্দোলন চালাবে।

–তপন সিকদার

প্রশ্ন: এ রাজ্যের বামফ্রন্ট তথা সি পি এম–এর বিরুদ্ধে আন্দোলন বি জে পি কি একাই চালাবে নাকি কোন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা ভাবছে?

তপন সিকদার: যে কোন জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী দলের সঙ্গে ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলনে আমরা প্রস্তুত।

প্রশ্ন: সেই দল কি কংগ্রেস?

তপন সিকদার: মোটেই নয়। ওরা তো বি জে পি–কে সাম্প্রদায়িক মনে করে।

প্রশ্ন: তবে কি বি জে পি ধর্মীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নামছে?

তপন সিকদার: কোন ধর্মীয় সংস্থা কি করে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একই প্ল্যাটফর্মে নামতে পারে? আসলে আমরা মানবতাবাদে বিশ্বাসী। ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। মনুষ্যত্ব বিকাশের আদর্শই আমাদের কাছে ধর্ম। আর এটাই হলো হিন্দু ধর্ম। আমাদের নীতি ভারতীয় দর্শনের বাহক ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, যার জন্যই তারা বিপদে আপদে আমাদের শরণাপন্ন হচ্ছে। বি জে পি মনে করে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা মানেই ভারতীয় ভাবধারাকে রক্ষা করা।

প্রশ্ন: সেজন্যই কি বালক ব্রহ্মচারী বি জে পি'র 'হিন্দু রাষ্ট্র'কে সমর্থন করেছেন?

তপন সিকদার: বি জে পি তথাকথিত হিন্দু রাষ্ট্রের কথা বলেনা। হিন্দু রাষ্ট্রের নামে ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতাকে আঘাত দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াতে চায় না। বরং এর ঘোরতর বিরোধী। বি জে পি ধর্ম নিরপেক্ষতার প্রকৃত অর্থে বিশ্বাসী। আমাদের কাছে ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে সর্ব ধর্ম সমভাব। বি জে পি তাই হিন্দু কোড বিল ও মুসলিম বিলের বিরোধীতা করে। একটি ধর্ম নিরপেক্ষ দেশে কি করে ভিন্ন ধর্মের জন্য ভিন্ন আইন হয়। আর যদি করা হয় সেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যেভাবে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হয়েছে। তাই আমরা ইন্ডিয়ান কমন সিভিল অ্যান্ড ক্রিমিনাল কোর্ট চেয়েছি। তাই আমরা মাইনরিটি কমিশনের পরিবর্তে হিউম্যান রাইটস্ কমিশন চেয়েছি। এটাই বি জে পি–র হিন্দু রাষ্ট্রের কাঠামো। যার জন্য 'এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান'–এর আন্দোলন চালিয়েছিলেন। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বালক ব্রহ্মচারী এর সমর্থন করবেন তাই তো উচিত।

প্রশ্ন: এ রাজ্যে কি বামফ্রন্ট শাসনে ধর্মীয় সংস্থাগুলি তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে বলে মনে করছে?

তপন সিকদার: নিশ্চয়ই হচ্ছে। আর সেজন্যই ওরা আমাদের কাছে আসছে। এ রাজ্যে বামফ্রন্ট চেষ্টা করছে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে শেষ করে দিতে। তাই ওরা মঠ, আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশনের ওপর পরিকল্পনা মাফিক হামলা চালাচ্ছে। রাম ও বাবরের তুলনা করে বাবরকে বিরাট ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে বর্ণনা করছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে বিকৃত করে মার্কসবাদ (যা আজ বর্জিত) চালাবার চেষ্টা করছে।

প্রশ্ন: আনন্দমার্গীরাও কি বি জে পি–র সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়াতে চাইছে? এমন কথা অবশ্য শোনা যাচ্ছে।

তপন সিকদার: না। আগেই বলেছি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোন ধর্মীয় সংগঠন একই মঞ্চে দাঁড়াতে পারে না। তবে আনন্দমার্গীদের বিপদে বি জে পি সহযোগিতার হাত বাড়াবে।

সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এবার থেকে বি·জে·পি তাকে প্রতিরোধ করতে সর্বতোভাবে পথে নামবে। সি·পি·এমের বিরুদ্ধে গিয়ে এইভাবে সন্তানদলের পাশে দাঁড়ানোতে রাজ্যের অন্যান্য ধর্মীয় সংস্থাগুলি যাদের উপর স্থানীয় ভিত্তিতে রাজনৈতিক হামলা আসছিল তাদের মনে বি·জে·পির প্রতি আস্থা বেড়ে গেল। শুধু সন্তানদলই নয় ধর্মীয় সংগঠনগুলির সম্পর্কে সি·পি·এমের কিছু ধর্মীয় সংগঠন বিরোধী রণনীতির বহিঃপ্রকাশ বোঝা যায় আনন্দমার্গ, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, তারকেশ্বর মন্দির প্রভৃতি ধর্মস্থানে তাদের একের পর এক কার্যকলাপে—সর্বত্রই স্থানীয় ইস্যুকে কেন্দ্র করে চাঁদা আদায়, ইউনিয়ন তৈরি, পরিচালনায় মাতব্বরি এবং বিবাদ বিসংবাদের কারণে সি·পি·এমের ক্যাডারদের একাংশের সঙ্গে এসব সংগঠনগুলির বিচ্ছিন্ন বিরোধ কয়েক বছর ধরে বেড়েই চলেছিল। তারাও মনে মনে চাইছিল এর থেকে রেহাই পাওয়ার কথা। এছাড়াও ইস্‌কন ও আর এস·এস—এর সঙ্গে সি·পি·এম—এর সংঘাত সর্বজন বিদিত। ১৯৮২ সালে কলকাতার বিজন সেতুর ওপর ১৭ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীদের আগুনে পুড়িয়ে মারার ঘটনাই ছিল আনন্দমার্গের উপর সি·পি·এমের প্রথম তীব্র আক্রমণ। তখন হামলা হয় তাদের কলকাতা ও এমনকি কলকাতার বাইরের আশ্রমগুলিতে। সম্প্রতি পুরুলিয়ায় আনন্দমার্গীদের আশ্রমের ওপর সি·পি·এমের ভয়াবহ হামলার ঘটনায় সর্বভারতীয় মানবাধিকার সংগঠনের আগমন এক্ষেত্রে জ্বলন্ত প্রমাণ। আনন্দমার্গীদের কথায়, সি·পি·এমের হাতে আজ অবধি তাদের ২৪ জন সন্ন্যাসী মারা গিয়েছে।

সুতরাং এই সমস্ত ধর্মীয় সংস্থাগুলি নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে বি·জে·পির সাহায্য নিতে চাইবে তা সত্য। প্রশ্ন হল, রামকৃষ্ণ মিশন ও ভারত সেবাশ্রম সংঘও কি এই স্রোতে বি·জে·পিকে সমর্থন জানাবে? কারণ

বি জে পি ও সন্তান দলের সম্মেলনে কংগ্রেসের অজিত পাঁজা
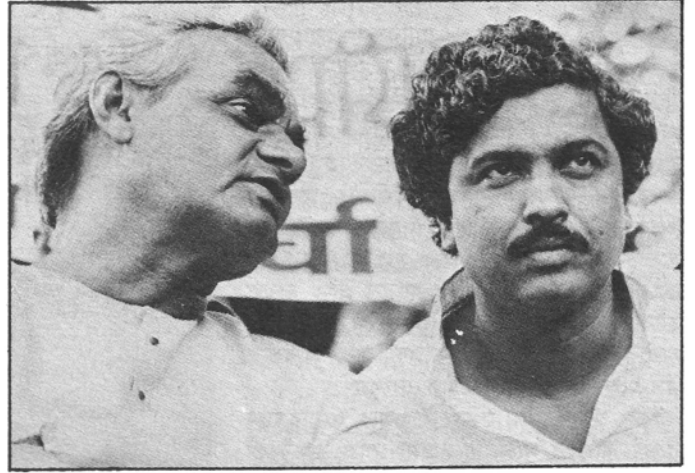
মহারাষ্ট্রে বি জে পি ও শিবসেনা আঁতাত

কলকাতার রাস্তায় বি জে পি-র মিছিল

সংঘবদ্ধভাবে না হলেও এ আসলে তাদের উপরও বিক্ষিপ্ত রাজনৈতিক হামলা হয়েছে। আর বামফ্রন্টের বিশাল ক্যাডার শক্তির মুখোমুখি হওয়ার জন্য এই সব শক্তিরও প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষ সমর্থন আদায়ে বি·জে·পিকেও আগ্রহী হতেই হবে। হয়তো তারা অদূর ভবিষ্যতে এই সব ধর্মীয় শক্তিকে জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে একটি সংযুক্ত প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করাতে চাইবে। সেদিকে ইংগিত দিয়ে বি·জে·পি সম্পাদক তপন শিকদার বলেছেন, 'যে শিবসেনাদের শ্লোগান ছিল 'মহারাষ্ট্র ফর মারাঠা', তাকেও বি·জে·পি জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির স্রোতে টেনে আনতে পেরেছে। তাহলে পশ্চিমবংগে বিদেশি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় শক্তিকে মাঠে নামাতে পারবেন না কেন?'

এ রাজ্যে বি·জে·পি কিভাবে সংগঠন বাড়াচ্ছে তা বলতে গিয়ে রাজ্য সম্পাদক তপন শিকদার বলেন, 'বি·জে·পির আদর্শগত শক্তি যতই থাক যে কোন লড়াই গণমুখী না করলে তার প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না। গত লোকসভা নির্বাচন থেকে এরাজ্যের জনগণের মনে সি·পি·এম·—বি·জে·পির ব্যাপারে গালগপ্প প্রচার করে যে ভ্রান্ত ধারণা খাড়া করতে চেয়েছে ভারতের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এবার নিশ্চয়ই বলা যায় তা সম্পূর্ণ

৩৩০ কোটি টাকাকে কেন্দ্র করে ইস্টার্ন কোলফিল্ডে গৃহযুদ্ধের নেপথে
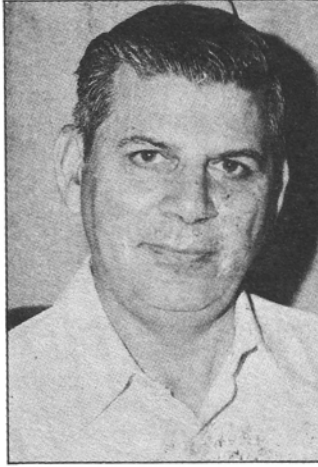
উৎপাদনে ব্যাপক কারচুপি, বেআইনী ঠিকাদার নিয়োগ ও স্বজনপোষণের অভিযোগ আক্রান্ত ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজি ডিরেকটর জে. এন. উপ্পলের বিরুদ্ধে তিনশ’ তিরিশ কোটি টাকা স্বস্বার্থে লোকসান করানোর দায় সারা খনি অঞ্চলকে উত্তপ্ত করে তুলেছে। কে এই উপ্পল ? কেনই বা তাকে কেন্দ্র করে এখানে গৃহযুদ্ধের আগুন ?

জে এন উপ্পল

১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রের নতুন শক্তিমন্ত্রী আরিফ মোহম্মদ খানের সবুজ সঙ্কেত পেয়ে কয়লা সচিব টি.ইউ. বিজয়-শেখরন পৃথক পৃথক ভাবে কোল ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান এম.পি. নারায়ণন এবং ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেডের (ই সি এল) চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেকটর জে এন উপ্পলকে ডেকে পাঠালেন দিল্লিতে। সেখানে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক হল : ১ জানুয়ারি ১৯৯০ থেকে উপ্পল ছুটিতে যাবেন এবং ভারত কোকিং কোল লিমিটেডের (বি.সি.সি.এল) ডাই-রেকটর (টেকনিক্যাল) নির্মলেন্দু সর অবিলম্বে ই.সি.এলে ডি(টি) পদে যোগ দেবেন।

কিন্তু দেখা গেল, কোল ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান কয়লা-সচিবের সঙ্গে আলোচনা শেষে কলকাতা ফিরে এলেও ই.সি.এল-সি.এস.ডি উপ্পল তাঁর কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসেন নি। এবং এরপরই দেখা গেল ১৯৯০ সালের প্রথম দিনটিতে ই সি এলের বুকে দাঁড়িয়ে উপ্পল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন কোল ইণ্ডিয়া ও তার চেয়ারম্যান এম.পি নারায়ণ-নের বিরুদ্ধে। তিনি স্পষ্টভাষায় জানালেন দেশের কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোল ইণ্ডিয়ার খবরদারির বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নেই’ !(নো সি আই

ইস্টার্ন কোলফিল্ডের অন্তর্গত একটি কয়লাখনি।

এল ইজ রিকোয়ার্ড')।

কিন্তু উপ্পল কেন এই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন?

১৯৭৩ সালে কয়লা শিল্প রাষ্ট্রায়ত্বের পর দেশের ৪২৫টি খনি ও ১৪টি ওয়াশারি সমৃদ্ধ ৭টি সহযোগী সংস্থার প্রশাসনিক ও উৎপাদনগত মহাপরিচালক হিসেবে কোল ইণ্ডিয়ার জন্ম হয়েছিল। তবু কোন্ সাহসে উপ্পল অন্যতম সহযোগী সংস্থা ই সি এলের সি.এম.ডি. হয়ে কোল ইণ্ডিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন!

এর উত্তর পেতে গেলে উপ্পলের কর্মকাণ্ডের আনুপূর্বিক বিবরণে আমাদের খানিকটা মনোনিবেশ করতে হবে। ১৯৮৭ সালের ১ এপ্রিল উপ্পল ই সি এলের তৎকালীন বিদায়ী সি এম ডি শিবনাথ সিং-এর কাছ থেকে সি এম ডি'র কার্যভার বুঝে নেন। এর আগে উপ্পল সি এম ডি শিবনাথ সিং-এর অধীনেই ডাইরেকটর (টেকনিক্যাল) পদে ছিলেন। অভিযোগ, ডি (টি) হিসেবে উপ্পল কোনদিনই সি এম ডি শিবনাথ সিং-এর কোন নির্দেশকে গ্রাহ্য করেন নি। এমনকি, শিবনাথ সিং-এর ডাকা বোর্ড মিটিংয়েও নাকি উপ্পল কখনোই হাজির হতেন না। উপ্পলের এই গরহাজিরার ব্যাপারটি নিয়ে ক্ষুব্ধ শিবনাথ সিং কোল ইণ্ডিয়ার তৎকালীন চেয়ারম্যান জি এল ট্যানডনের কাছে যথাযথভাবে জানিয়েছেন। কিন্তু উপ্পলের ক্ষেত্রে তার কোনও প্রভাব পড়েনি। কারণ উপ্পলের পরিচয় ছিল চেয়ারম্যান ট্যানডনের 'আঁতের লোক' হিসেবে।

তবু উপ্পল ই সি এলের সি এম ডি পদে বসার পর অনেকেই আশা করেছিলেন, ই সি এলের 'ঘুঘুর বাসা' বুঝিবা এবার ধূলিসাৎ হবে। কারণ তিনি অনমনীয় মনোভাবের কয়েকজন ব্যক্তিত্বকে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন। এঁরা হলেন ডাইরেকটর (টেকনিক্যাল) সনৎ কুমার মণ্ডল, ডাইরেকটর (পারসোন্যাল) জগন্নাথ সারণ এবং ডাইরেকটর (করপোরেট অ্যাণ্ড প্ল্যানিং) আর এ সিং। এঁদের মধ্যে সনৎ কুমার মণ্ডলের প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য তাঁকে নাকি 'লৌহমানব'ও বলা হত।

ই সি এল-এ 'ঘুঘুর বাসা'র প্রাথমিক বাসিন্দা বলে যাঁদের চিহ্নিত করা হয় সেই পে-ক্লার্ক, বিল-ক্লার্ক, ওয়েব্রিজ ক্লার্ক, স্টোরকিপার, সার্ভেয়ার প্রমুখদের বিরুদ্ধে কড়া মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন সনৎবাবু। সাতগ্রাম এরিয়ার জেনারেল ম্যানেজার তৎকালীন তিনি ক্যাশিয়ার, পে-ক্লার্ক, অফিস সুপারিনটেনডেন্ট, অ্যাসিস্টেন্ট ফোরম্যানপ্রমুখ১৯ জনকে তহবিল তছরূপ, জালিয়াতি প্রভৃতি কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। বিস্ফোরক পদার্থ ও কয়লা চুরির দায়ে ২ জনকে ডিসচার্জ করেন এবং অসাধুতা অবলম্বনের জন্য ৯ জনের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ ও পদাবনতি ঘটিয়ে দেন। এছাড়া, ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বছরে ৪২ জন অধঃস্তন কর্মীকে প্রশাসন ও উৎপাদনের স্বার্থে বিভিন্ন বিভাগে বদলি করেন। বদলি হওয়া কর্মীদের মধ্যে কয়েক জনের বদলি রুখতে নাকি খোদ জ্যোতিবাবু পর্যন্ত
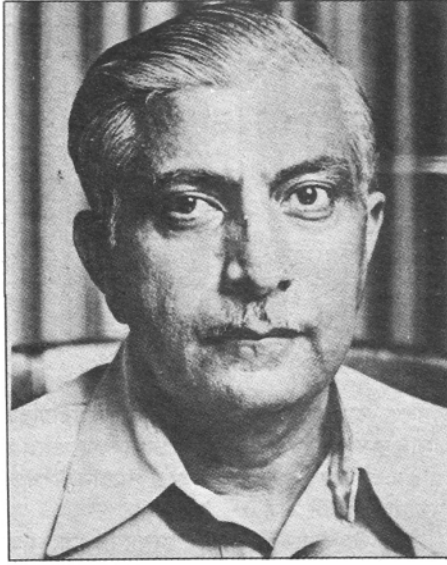
জি এল ট্যাণ্ডন: উপ্পলের শুভচিন্তক!

হস্তক্ষেপ করেছিলেন বলে শোনা যায়।

কিন্তু সনৎবাবু সেই হস্তক্ষেপের কাছে কোনরকম নতি স্বীকার করেননি বলেই জানা গেছে। উল্লেখ্য, সনৎবাবুর এহেন প্রশাসনিক ও উৎপাদনমুখী দৃঢ় সিদ্ধান্ত লক্ষ্য করেই ১৯৮১ সালে কোল ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান আর এন শর্মা এবং ১৯৮৩ সালে এম.কে. গুজরাল তাঁকে ই সি এলের ডি (টি) পদে বসাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ই সি এলের তৎকালীন সি এম ডি শিবনাথ সিং সনৎবাবুকে ই সি এলের ডি (টি) পদে কখনোই চাননি।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, এই ধরনের দক্ষ সহকর্মীর সংস্পর্শ পেয়েও উপ্পল তাঁর ৩৩ মাসের সি এম ডি রাজত্বে ই.সি এলের এক চুলও উন্নতি ঘটিয়ে যাননি। উল্টে স্বজনপোষণ, কারচুপি, জালিয়াতি প্রভৃতি দুর্নীতির অসংখ্য নজির রেখে গেছেন। এক কথায়, তিনি ই সি এলকে সমস্ত দিক দিয়ে ধ্বংসের শেষ সীমায় দাঁড় করিয়ে গেছেন।

২১.১.৮৭ তারিখে ডাইরেকটর (টেকনিক্যাল) হিসেবে যে উপ্পল তৎকালীন সি এম ডি শিবনাথ সিং-কে ই সি এলের খরচ কমানোর জন্য তৎকালীন ১৬টি এরিয়াকে ৮টি এরিয়ায় পরিণত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন (নোটিং শিট নং ই সি এল ডি (টি) কনফিডেনশিয়াল/৪৭৯) তিনি সি এম ডি পদে বসেই স্বজনপোষণের স্বার্থে ১৬টি এরিয়াকে ২৫টি এরিয়ায় পরিণত করেছেন। ফলে, কোম্পানির খরচ হ্রাসের পরিবর্তে তা বেড়েছে যেমন বহুগুণ, অপরদিকে সৃষ্টি হয়েছে প্রশাসনিক গোলমাল। কারণ ২৫টি এরিয়ার জন্য ২৫ জন জি এম নিয়োগ হলেও সকলকে অফিস দিতে পারেন নি উপ্পল। একাধিক জি এম-কে করণিকের টেবিলে বসে কাজ সারতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

প্রশ্ন ওঠে, উপ্পল তাহলে মুড়ি মুড়কির মত এত এরিয়া সৃষ্টি করলেন কেন? ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এর কারণ একটাই। উপ্পল চেয়েছিলেন ই সি এলকে 'লুঠের হাট' বানাতে। কিন্তু তাঁর অধঃস্তন অধিকাংশ জি এম ও ডাইরেকটররা সে প্রস্তাবে সায় দেননি। ফলে, সুষ্ঠ প্রশাসন ও দ্রুত উৎপাদনের দোহাই দিয়ে উপ্পল স্বল্প সময়ে হুহু করে এরিয়া সৃষ্টি করে একান্ত অনুগতদের জি এম করে আনলেন। অনুসন্ধান করে জানা গেছে, ২৫ জন জি এমের মধ্যে ১১ জনই উপ্পলের 'ইয়েসম্যান' হিসেবে পরিচিত। এঁরা হলেন এ. কে. কল্পন, এস এন সচদেব, এস এস ভট্টাচার্য, আর এন সিং, আর সি গোয়েল, ডি কে গুপ্ত, আর.কে. মহাজন, এম এল দুগর, এস ভট্টাচার্য, ওয়াই. পি হাণ্ডা এবং আর বি সিং। অভিযোগ, এঁদের দিয়ে উপ্পল নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বাস্তবায়িত করতে ই সি এলকে যথেচ্ছ দুর্নীতির মুক্তক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন?

নির্মলেন্দু সর

উপ্পলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই 'ইয়েসম্যান' জি এম-এরা কোম্পানির উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করায় মনোযোগ দেওয়া দূরে থাকুক, শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণই বিস্ময়করভাবে বাড়িয়ে গেছেন বলে অভিযোগ। উপ্পলের মৌখিক নির্দেশে এই 'জে হুজুর' জি এম'রা খাতা-কলমে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ দেখিয়েছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার অধিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার ধারেকাছেও উৎপাদন পৌঁছয় নি। ফলে, ই সি এলে উপ্পল জমানার প্রথম বছরেই অর্থাৎ ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে ই সি এলে লোকসানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬০ কোটি টাকার ওপর। ১৯৮৭-৮৮ সালে ই সি এলের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৭.৯৬ মিলিয়ন টন। কিন্তু কোল ইণ্ডিয়ার স্টক মেজারমেন্ট টিম সংশ্লিষ্ট উৎপাদন

বর্ষের শেষে কয়লার মজুত পরিমাপ করতে গিয়ে সর্বত্র ঘাটতি লক্ষ্য করেন। অথচ খাতা–কলমের হিসেবে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। স্টক মেজারমেন্ট টীম শুধু কুনুস্তোরিয়া এরিয়ার অন্তর্গত অমৃতনগর কোলিয়ারিতেই ২০ হাজার টন ঘাটতির হদিশ পেয়েছেন।

উপ্পলের সৃষ্ট নতুন এরিয়াগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কান্তা এরিয়া। পাণ্ডবেশ্বরকে ভেঙে এই এরিয়ার সৃষ্টি। ওয়েস্টার্ণ কোল-ফিল্ডসের একজন সাধারণ মাপের অফিসার অবতারকৃষ্ণ কল্পনকে উপ্পল কাঁকরতলায় সুপারিনটেনডেন্ট অব মাইনস করে এনে পরবর্তী সময়ে কান্তা এরিয়া সৃষ্টি করে তার জি এম পদে বসান। এবং স্বাভাবিক কারণেই ১৯৮৭–৮৮ সালে এই এরিয়ায় মজুত ঘাটতি ধরা পড়ে ১ লক্ষ টনের কাছাকাছি। নানাভাবে ছাড় দিয়েও এই ঘাটতি ৭৬ হাজার টনের নিচে নামানো যায়নি। যার তৎকালীন বাজার মূল্য ৩ কোটি টাকা।

১৯৮৮–৮৯ উৎপাদন বর্ষের চিত্রও এক। কান্তায় ঘাটতির পরিমাণ ৪৮ হাজার টন, কুনুস্তোরিয়ায় ৭ লক্ষ টন, পরাশিয়া ও সি পি ও ইনক্লাইনে ৬ লক্ষ্য টন, পাণ্ডবেশ্বরে ৫০ হাজার টন। এবং অপরাপর এরিয়াগুলি পরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বর্ষে মজুত ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ লক্ষ টন। এ তথ্য তথ্যাভিজ্ঞ মহলের। অথচ ১৯৮৮–৮৯ উৎপাদন বর্ষে ই সি এলের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা যেখানে ছিল ৩১.০৯ মিলিয়ন টন, উপ্পলের ইশারায় তাঁর 'ইয়েসম্যান' জি এম'রা অতি উৎসাহে খাতা–কলমে লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ২৮ লক্ষ টন বেশি উৎপাদন দেখান।

ই সি এলে এই উৎপাদন নিয়ে আসানসোল থেকে নির্বাচিত সাংসদ হারাধন রায় তাঁর ২০.১.৯০ তারিখের চিঠিতে কেন্দ্রের নতুন শক্তিমন্ত্রী আরিফ মহম্মদ খানকে লিখেছেন : মূল উৎপাদন গোপন করে খাতা–কলমে ফুলোনো–ফাঁপানো উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা দেখানো ই সি এলে একটি পুরনো ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এই ফুলোনো–ফাঁপানো উৎপাদন সংখ্যার অন্তরালে এবার বিস্ময়কর-ভাবে ৪০ লক্ষ টন ঘাটতি ধরা পড়েছে। এর মধ্যে কোন কোন কোলিয়ারিতে ১ লক্ষ টনের ওপর ঘাটতি।'

কোল ইন্ডিয়ার ডাইরেকটর (ফাইন্যান্স) বি স্বামীনাথনও ৫.৭.৮৯ তারিখে উপ্পলকে লেখা এক গোপন চিঠিতে (নং সি আই এল/ডি এফ ৪৮/৯১) জানিয়েছেন : ১.৪.৮৯ তারিখে পেশ করা কোল ইন্ডিয়ার স্টক মেজারমেন্ট টিমের রিপোর্ট অনুসারে, ই সি এলের শুধু মাত্র পরাশিয়া ও সি সি পি'তে কয়লা মজুত ঘাটতির পরিমাণ ৪.৩৫ লক্ষ টন।' স্বামীনাথনের এই চিঠির প্রতিলিপি 'কোল্ডফিল্ড টাইমস' নামে একটি সাপ্তাহিকে প্রকাশের পরই সি বি আই পরাশিয়া সহ ই সি এলের বিভিন্ন এরিয়ায় ব্যাপক তদন্ত শুরু করে।

এম পি নারায়ণন

সনৎ মণ্ডল

প্রসঙ্গত, ব্যাপক ঘাটতির দায় এড়াতে চিরাচরিত প্রথায় কয়লার প্রতিটি মজুত ভাণ্ডারে কিছু কয়লায় আগুন লাগিয়েও ঘাটতিমুক্ত হতে পারেনি উপ্পল-জমানার ই সি এল।

শুধু উৎপাদনে কারচুপি দেখানো নয়, লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষের বিনিময়ে উপ্পল ঠিকেদারদের হাতে ই সি এলকে তুলে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। দেশের ৮০ শতাংশ কয়লা যেখানে ভূগর্ভস্থ খনি থেকে উত্তোলন হয়,ই সি এল সেখানে তার ভূগর্ভস্থ ৭৮টি ইউনিটকে প্রায় পঙ্গু করে রেখেছে। এবং এটা হয়েছে উপ্পলের আমলে। বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ভূগর্ভস্থ খনিতে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। ভূগর্ভস্থ

NOTING SHEET

EASTERN COALFIELDS LIMITED

Department D(T)'s Sectt.

ECL/D(T)/Confidential/ 475

31-1-87

JB UPPAL
D(T)

Subject: Organisation Structure of Areas.

Ref: CMD's remarks on letter No.CIL/TS/113(A):1016 dt. 28-11-86

The matter has been seen by D(P) and D(CPP) and their remarks are enclosed.

In my opinion, the structure of the Area HQ is adequate and in line with the normal practice. However, in my view, in ECL we need to reduce the number of Areas, as the mines are contiguous and historically there were only 5 Areas in whole of ECL and we have 14 Areas. The coal production has also dropped down considerably specially from the underground mines by about 7 million tonnes.

My proposal is - total number of Areas be reduced to original five plus 1 for Jhanjra, 1 for Sonepur Bazari and 1 for Rajmahal Total = 8.

A group of senior officers of the rank E-8/E-7 may be formed to look into -

1) improvement on the loaders OMS to [illegible].

2) to ensure implementation of the sanctioned projects/schemes.

CMD may like to see and advise.

উপ্পলের একটি চিঠি

খনির কোন বিকাশ ঘটেনি উপ্পলের সময়ে। তিনি উৎপাদনের চমক দেখাতে চেয়েছেন ওপেন কাস্ট মাইনিং–এর সাহায্যে।

এই ওপেন কাস্ট মাইনিং–এ যে যন্ত্রটি সর্বাধিক প্রযোজন, তার নাম হেভি আর্থমুভিং মেশিনারি (এইচ ই এম এম)। ওপেন কাস্ট প্রজেক্ট থেকে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ই সি এল গত ৩/৪ বছরে প্রায় ৩৫০/৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই যন্ত্র কিনেছে। কিন্তু সেগুলিকে অকেজো করে রেখে প্রায় অধিকাংশ ও সি পি ঠিকেদারদের হাতে তুলে দিয়ে এইচ ই এম এম যন্ত্র ভাড়া বাবদ ৬ বছরে ২১০ কোটি টাকা ই সি এল ঠিকেদারি বিল মিটিয়েছেন। এর মধ্যে উপ্পলের আমলের ঠিকে-দাররা পেয়েছেন ১৫৯ কোটি টাকা।

কিন্তু ভূগর্ভস্থ খনিগুলিকে বসিয়ে রেখে এইভাবে ঠিকা প্রথায় ও সি পি চালানোর ফলে কোল ইন্ডিয়া যে প্রভূত লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে, তা ২৮।৫।৮৮ তারিখে এক বিবৃতিতে কোল ইন্ডিয়ার তৎকালীন চেয়ারম্যান জি এল ট্যান্ডন স্বীকার করে গেছেন। তবু উপ্পল তাঁর এই কর্মধারা অব্যাহত রাখলেন কিভাবে ?

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ট্যান্ডন উপ্পলকে ই সি এল থেকে লুঠের সবুজ সংকেত দিয়েই রেখেছিলেন। যে-কারণে চিন্না কোলিয়ারির কয়লাভাণ্ডার থেকে বনজেনিহারি রেলওয়ে সাইডিং পর্যন্ত কয়লা পরিবহনের জন্য ই সি এল এক ঠিকে-দারকে দিত টন প্রতি ৫৭ টাকা ৭০ পয়সা। (ঠিকা সূত্র নং ই সি এল /এস পি এস জি এম/ডবলু ও /সি টি ১–১১/২৩৫১ তাং ৭.১১.৮৮), উপ্পল ১৪।১০।৮৮ তারিখে কোন কারণ না দেখিয়ে পূর্বের ঠিকেদারকে বাতিল করে 'রুংতা প্রজেক্ট' নামে একটি ঠিকেদারি সংস্থাকে টন প্রতি ৬৬ টাকার বিনিময়ে সেই কাজ পাইয়ে দেন। এজন্য উপ্পলের বিরুদ্ধে ১৫ লক্ষ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

উপ্পলের ই সি এল–লুঠের আরেকটি প্রধান সূত্র ছিল কান্তা এরিয়া। এই কাজে সংশ্লিষ্ট এরিয়ার জি এম অবতারকৃষ্ণ কল্পন ছিলেন তাঁর সহায়ক। কল্পন কয়লার বিলিবন্টনে টন প্রতি ৩০/৪০ টাকা 'প্রণামী' নিতেন বলে প্রকাশ। তিনি ১৯৮৯–৯০ আর্থিক বর্ষে ই সি এলের সদর দফতর ও কোল ইন্ডিয়ার মার্কেটিং বিভাগের পূর্ব অনুমতি ছাড়াই ১ লক্ষ ৭০ হাজার টন কয়লা ফ্রি–সেলের মাধ্যমে ছাড়তে শুরু করেন। এবং এইভাবে ১,৭০,০০০ টন × ৪০ টাকা = ৬৮ লক্ষ টাকা নীট আমদানির ব্যবস্থা করেন বলে অভিযোগ।

১৯৮৯–এর মাঝামাঝি নাগাদ উপ্পল তৎকালীন কেন্দ্রিয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিংকে সন্তুষ্ট করতে এন ধীর নামে এক ব্যক্তিকে ই সি এলের 'উপদেষ্টা' হিসেবে নিয়োগ করেন। যদিও এই উপদেষ্টা নিয়োগ সম্বন্ধে ২২.৬.৮৯ তারিখে লেখা এক চিঠিতে ই সি এলের ডাইরেক্টর (ফাইন্যান্স)

পি কে সেনগুপ্ত মন্তব্য করেছেন যে একজন উপদেষ্টা নিয়োগে ই সি এলের বার্ষিক খরচ ন্যূনপক্ষে ১ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ৬০ হাজার টাকা আনুষঙ্গিক। কোন বিশেষ কাজ ছাড়া উপদেষ্টা নিয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়। তাছাড়া উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে কোল ইন্ডিয়ার পূর্বানুমতি অবশ্য জরুরি।

এ সত্ত্বেও কিন্তু উম্পল এন কে. ধীরকে 'উপদেষ্টা' পদে নিয়োগ করেন। উল্লেখ্য, উৎপাদনের স্বার্থে কোল ইন্ডিয়া যখন উম্পলকে ই সি এলের প্রাক্তন ডি (টি) সনৎকুমার মন্ডলকে 'উপদেষ্টা' নিয়োগের পরামর্শ দেন, উম্পল– সে–প্রস্তাব এক কথায় খারিজ করে দেন। কারণ, উম্পল সনৎবাবুর অনমনীয় প্রশাসনিক দক্ষতা সম্বন্ধে সবিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। অপরপক্ষে এন.কে. ধীর তাঁর 'আপনজন'। কারণ তিনি শুধু বুটা সিং–এর আশীর্বাদ পুষ্ট ব্যক্তিই নন, তিনি পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (ই) ইঞ্জিনিয়ারিং সেলের আহ্বায়ক এবং লুধিয়ানার 'সেন্ট্রাল মেশিনারি কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড'এর চেয়ারম্যান –কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

এ হেন ব্যক্তিত্বকে ই সি এলে উপদেষ্টা করে আনতে পেরে উম্পল নিশ্চয়ই লাভবান হয়েছিলেন। কারণ দেখা গেছে, ধীর অতি দ্রুতগতিতে তাঁর কোম্পানির লেটার হেড–এ ই সি এলের নামে লক্ষ লক্ষ টাকার কাজের বিল করছেন এবং তড়িৎগতিতে সেই পেমেন্ট হস্তগত করছেন (বিল নং এম সি/২৩৫।আর ডি ১৬৪৫।এম বি–৮ ৮৯।৮৯–৯০ তাং ২৫.১০.৮৯ এবং ই সি এল চালান্ নং ৮৯ ইউ আর ডবলু আর ওপি ৪৬১ তাং ৩.৯.৮৯)। আরও মজার ব্যাপার, ই এলের লেটার হেড–এ ফাঁকা ফরমে ধীরের সুপ্রাক্ষ উম্পল দস্তখত করে দিয়েছেন যেগুলি ধীর নিজের স্বার্থে খুশি মত ব্যবহার করতে পারবেন। এমনই কয়েকটি নমুনা হল : এন কে ডি /১৫৭৮৭/৫২ তাং ২৩/১০/৮৯, এন কে ডি ১৫.৭.৮৭ ৪৯ তারিখবিহীন এবং এন কে ডি/১৫৭৮৭/ ৫৩ তাং ২৪।১০।৮৯।

প্রসঙ্গত, ধীর উপদেষ্টা পদের জন্য প্রতি মাসে মাত্র ১ টাকা পারিশ্রমিক নিতেন! কিন্তু এইভাবে ই সি এলে ঠিকেদারি করা ছাড়াও বরাবর আসানসোল ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের মত জায়গায় ই সি এলের খরচে মিটিং করতেন। প্রতি মিটিংয়ে বিল হত ২০/২৫ হাজার টাকা। কিন্তু ডি (এফ) পি কে সেনগুপ্ত এই বিশাল অঙ্কের বিলের টাকা সময়োচিত হস্তক্ষেপে আটকে দেন।

উৎপাদনের ক্রমাগত কারচুপি এবং বেআইনি ঠিকা পাইয়ে দেওয়ার কাজ যাতে নিষ্কন্টক হয়, উম্পল সেজন্য প্রথম থেকেই ই সি এলের প্রশাসনকে সম্পূর্ণ নিজের মর্জির অধীনে নিয়ে এসেছেন। ডাইরেক্টররা মাস গেলে বেতন নেওয়া ছাড়া কোন কাজই করতে পারতেন না। ডাইরেক্টর (পারসোনেল) জগন্নাথ শরণকে ঠুটো জগন্নাথ করে

সারণী–১

উম্পল–রাজত্বে ই সি এলের সাংগঠনিক পরিকাঠামো

ক্রমিক নং	এরিয়ার নাম	এরিয়ার নাম	জি এম সি জি এসদের নাম
১)	পাণ্ডবেশ্বর	ক) কান্তা	ক) এ কে. কল্লন*
		খ) পাণ্ডবেশ্বর	খ) এস এন সচদেব*
২)	কেন্দা	ক) কেন্দা	ক) এস এস ভট্টাচার্য*
		খ) সোনপুর বাজারি	খ) এস এম ভাদুড়িয়া*
৩)	বাঁকোলা	ক) বাঁকোলা	ক) জে পি শর্মা
৪)	ঝাঁঝরা	ক) ঝাঁঝরা	ক) এস পি খেরা
		খ) লাউদোহা	খ) আর.কে. শ্রীবাস্তব
৫)	কাজোরা	ক) কাজোরা	ক) এস.এন. শর্মা
৬)	কুনুস্তোরিয়া	ক) কুনুস্তোরিয়া	ক) আর.এন.সিং/আর সি. গোয়েল
		খ) বাঁশরা	খ) ভি.কে. গুপ্ত
৭)	সাতগ্রাম	ক) সাতগ্রাম	ক) ডঃ এস.কে. দাস
		খ) সাতগ্রাম প্রজেক্ট	খ) হরকিরৎ সিং/ওয়াই পি. হাণ্ডা
		গ) কালিদাসপুর প্রজেক্ট	গ) এ.কে.ঝা/জি সি কর্মকার
৮)	শ্রীপুর	ক) শ্রীপুর	ক) বি কে দাস এ কে লায়েক
		খ) ঘুসিক প্রজেক্ট	খ) আর কে মহাজন
৯)	সীতারামপুর	ক) সীতারামপুর	ক) এম এল দুগর/বি কে.পাণ্ডে
		খ) ধেমোমেইন	খ) এস. ভট্টাচার্য
১০	সোদপুর	ক) সোদপুর	ক) এন.এন. গৌতম
১১)	সালানপুর	ক) সালানপুর	ক) এস শ্রীমানী
১২)	নিরসা	ক) নিরসা	ক) জি এস সিং
১৩)	কাপাসারা	ক) কাপাসারা	ক) এস চ্যাটার্জি
১৪)	চিত্রা	ক) চিত্রা(এ)	ক) আর এন উপাধ্যায়
		খ) চিত্রা (বি)	খ) জে এস গিল
১৫	রাজমহল	ক) রাজমহল	ক) ওয়াই পি হাণ্ডা/এইচ পি সিনহা
১৬)	জে.কে. রোপওয়েজ	ক) জে কে রোপওয়েজ	ক) এ দত্ত
		ক) উখরা রিজিওন্যাল ওয়ার্কশপ (সম্পূর্ণ নতুন এরিয়া)	ক) আর বি সিং*

* চিহ্নিত নামগুলি উম্পলের 'ইয়েস ম্যান' হিসেবে পরিচিত।

NOTING SHEET

EASTERN COALFIELDS LIMITED

DEPARTMENT ____________ NKD/15787/4

Subject :

OFFICE ORDER

Shri ____________ designated as G.M.(Segment) has been deputed to get the Machinery Ledger implemented. The Officer will get implemented the breakdown [illegible] also and start action at once.

Undersigned would like to check the [illegible] position from the Ledger on next visit. The work may be completed in 15 days and in reference to this Order please intimate my Office through [illegible] that you are ready for inspection.

All the General Managers and Project Officers may take the guidance of the Officer and effect the compliance.

Chairman-cum-Managing Director

নামের জায়গাটি খালি !

শক্তিমন্ত্রী, আরিফ মহম্মদ খান

EASTERN COALFIELDS LIMITED
CMD'S SECRETARIAT.
SANCTORIA.

Ref.No.CMD/ECL/MU/ 1324 4 1.1.1990.

Wireless M/s

From: J.N. Uppal, CMD, ECL, Sanctoria.
All General Managers/CGMs.

Sharan, Ex-Director (Personnel),

He is relieved of any assignment that might have been given to him by ECL.

(J.N. Uppal),
Chairman-cum-Mg.Director.

উপ্পলের আরেকটি বিতর্কিত চিঠি

সেই বিভাগের কাজকর্ম চালাতেন তাঁরই 'হাতের পুতুল' বলে পরিচিতি জেনারেল ম্যানেজার (পারসোনেল) এস এম সিং-কে দিয়ে। তাঁকে উপ্পল এনেছিলেন ওয়েস্টার্ন কোলফিল্ডস থেকে। ওয়াকিবহাল মহলের দেওয়া তথ্য অনুসারে, এস এম সিং ছিলেন ই সি এলের একাধারে ডি–ফ্যাক্টো ডি (পি) এবং সি এম ডি। তাঁর অঙ্গুলি হেলনেই ই সি এলে ট্রান্সফার–পোস্টিং হত। এমনও অভিযোগ আছে, তাঁর সুযোগ্য পুত্র রাকেশ সিং ট্রান্সফার, পোস্টিং, ভি আর ছাড়াও কয়লার বেআইনি ডি. ও বিল করে পিতার ক্ষমতা বলে দু–হাতে টাকা রোজগার করতেন!

কোল ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান পদ থেকে টি এল ট্যানডনের বিদায়ের পর এম পি নারায়ণন সেই পদে যোগদান করলে উপ্পলের এই সমস্ত দুর্নীতি বিষয়ে নারায়ণনকে প্রথম আলোকপাত করেন ই সি এলের তৎকালীন চিপ ভিজিলেন্স অফিসার এ.কে. পট্টনায়ক, আই পি এস। উপ্পল তা জানতে পেরে পট্টনায়কের অবসরের পর ই সি এলের ভিজিলেন্স দফতরে আর কোন আই পি এস অফিসারকে আনেন নি। কিন্তু নারায়ণের কাছে পট্টনায়কের মাধ্যমে যে তথ্য পৌঁছেছিল তার ভিত্তিতেই তিনি উপ্পলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে শুরু করেন। প্রথমেই তিনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ই সি এলের জি এম (পি) এস এস সিং এবং সাঁকতোরিয়া হাসপাতালের অ্যাকটিং সি এম ও ডাঃ পি.কে. রায়কে যথাক্রমে সাউথ–ইস্টার্ণ কোলফিল্ডস এবং ই সি এলেরই কাল্লা হাসপাতালে বদলি করেন। এবং ই সি এলে উৎপাদনের কারচুপির সঠিক চিত্র পেতে কোল ইণ্ডিয়া থেকে একটি
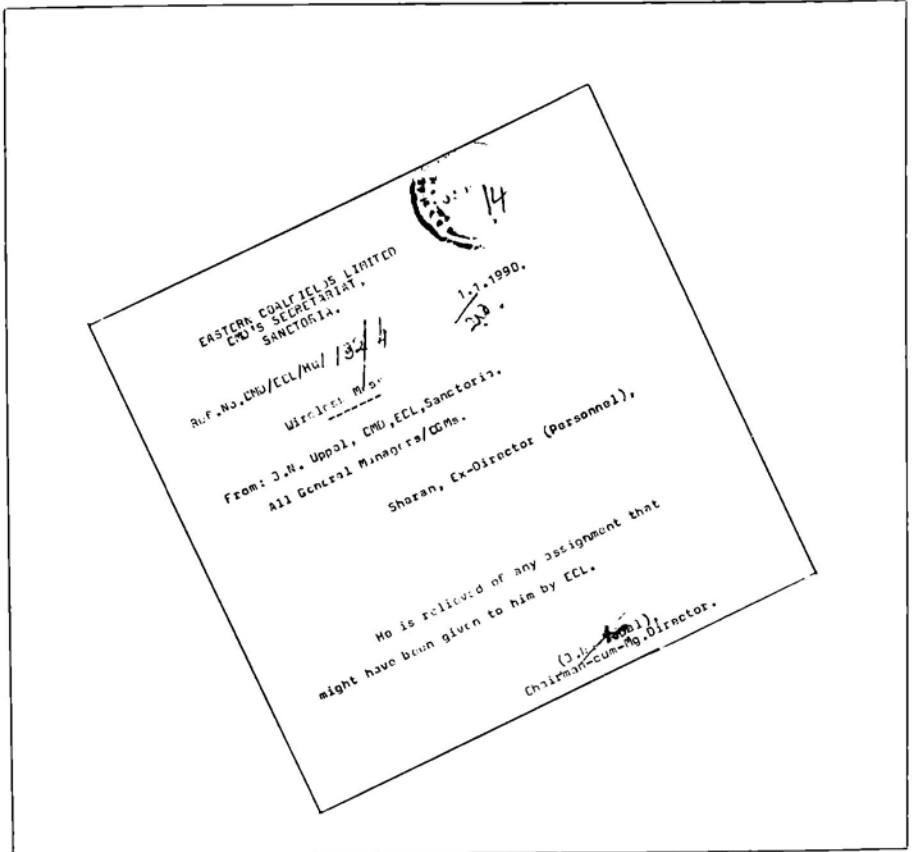
সারণী–২

নিজেদের যন্ত্রপাতি অকেজো করে রেখে ওপেন কাস্ট প্রজেক্ট চালাতে হেভি আর্থ মুভিং মেশিনারি (এইচ ই এম এস) ভাড়া বাবদ ঠিকেদারদের ই সি এল ৬ বছরে যে–টাকা দিয়েছে।

বর্ষ	টাকার পরিমাণ (কোটিতে)
১৯৮৫–৮৬	১৮.০০ (আনু)
১৯৮৬–৮৭	৩৩.০০ আনু)
১৯৮৭–৮৮ (উপ্পলের রাজত্বকাল শুরু)	৪২.০০ (আনু)
১৯৮৮–৮৯	৩৭.০০ (আনু)
১৯৮৯–৯০	৩৭.০০ (আনু)
১৯৯০–৯১ (উপ্পল যাঁদের ঠিকা মঞ্জুর করে গেছেন)	৫০.০০ (আনু)
	২১০.০০ কোটি টাকা

উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মেজারমেন্ট টিম পাঠান। যদিও দিল্লি থেকে প্রাপ্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে নারায়ণন কোল ইন্ডিয়ার অধীনস্থ যে–কোন সহযোগী সংস্থার সি এম ডি ও ডিরেকটরদের পর্যন্ত উৎপাদন ও প্রশাসনের স্বার্থে বদলি নির্দেশ দেবার অধিকারী হয়েছিলেন।

কিন্তু এস.এস. সিং এবং ডাঃ পি কে. রায়ের সূত্র ধরেই উপ্পলের সঙ্গে নারায়ণনের সংঘাত শুরু হল। এস এস সিং-কে বদলি–আটকানোর পথ বাতলে দিয়ে উপ্পল ডাঃ পি.কে. রায়ের বদলির আদেশকে সরাসরি অগ্রাহ্য করে তাঁকে সাঁকতোরিয়ায় রেখে দিয়ে ছিলেন (আদেশ নং ই সি এল সি–৫ (ডি) ১৯৬২৪ (বি) তাং ৮/৭/৮৯)।

ইতিমধ্যে অক্টোবর ১৯৮৯–এ কেন্দ্রিয় কয়লা দফতর উপ্পলের ৩০/৩১ মাসের উৎপাদন ও প্রশাসনের চূড়ান্ত ব্যর্থতা পর্যালোচনা করে তাঁকে ই সি এল থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ অন্যান্য বছর ছাড়াও ১৯৮৯–৯০ উৎপাদন বর্ষে ই সি এলের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা যেখানে ছিল ৩০ মিলিয়ন টন, বেশ কয়েক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও দেখা গেছে বাস্তবিক উৎপাদন হয়েছে মাত্র ১৫ মিলিয়ন টন। কিন্তু ঠিক সেই সময় দেশের লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষিত হওয়ায় ই সি এল থেকে উপ্পল–অপসার-

অন্তর্তদন্ত

ণের সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে পারেনি ।

ইতিমধ্যে ১৩ নভেম্বর ১৯৮৯ তারিখে ই সি এলে ঘটে গেল অভিশপ্ত মহাবীর কোলিয়ারি দুর্ঘটনা । ৭১ জন শ্রমিক অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন তাঁদের উদ্ধার ইত্যাদির কাজে দিন কয়েক কেটে গেল। অবরোধমুক্ত শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কাজের দায়িত্বে কোল ইণ্ডিয়া উপদেষ্টা হিসেবে নিয়ে এলেন ই সি এলের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ডি (পি) জগন্নাথ সরণকে ।

ঠিক সেই সময় কেন্দ্রের নতুন শক্তিমন্ত্রী আরিফ মহম্মদ খানের দৃষ্টি আকর্ষিত হল উৎপলের যাবতীয় দুর্নীতির প্রতি । তিনি সচিবকে নির্দেশ দিলেন অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। কয়লা মন্ত্রকের নির্দেশে কোল ইণ্ডিয়া বি সি সি এল থেকে নির্মলেন্দু সরকে ডি (টি) ই সি এল পদে যোগ দিতে বললেন এবং উৎপলকে ছুটিতে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন ।

শুরু হয়ে গেল উৎপলের নেতৃত্বে প্রকাশ্য গৃহযুদ্ধ ! ১ জানুয়ারি ১৯৯০ তারিখে গভীর রাতে দিল্লি থেকে ফিরেই ই সি এল–এ তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সাহায্যে ওয়ারলেসের মারফৎ কয়েকটি প্রশাসন–বিরোধী সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যবস্থা নেন । সেগুলি হল (১) নির্মলেন্দু সরকে ই সি এলে ডি (টি) হিসেবে যোগদান করতে দেওয়া হবে না । (২) ই সি এলের প্রাক্তন ডি (পি) জগন্নাথ সরণকে কোল ইণ্ডিয়া উপদেষ্টা নিয়োগ করলেও ই সি এলের কোন দফতরে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হবে না । (৩) কোল ইণ্ডিয়ার কোন নির্দেশ বা উপদেশকে ই সি এল গ্রাহ্য করবে না। এবং সেখানে থেকে কোন ফোন বা চিঠি এলে সে–সবের প্রাপ্তি স্বীকার করা হবে না । (৫) এস এম সিং ডাঃ পি.কে. রায় প্রমুখ যাঁদের কোল ইণ্ডিয়া বদলি করেছেন, ই সি এল তাঁদের স্বপক্ষে এবং স্বস্থানে পুণর্বহাল করবে ।

এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এস এম সিং এবং ডাঃ পি.কে. রায় পূর্বস্থানে এবং পূর্বপদে তৎক্ষণাৎ বহাল হয়েছেন । কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েও গৃহযুদ্ধের নায়ক উৎপল মোটেই নিশ্চিন্ত ছিলেন না । তাঁর ভাবনা ছিল নিজের অস্তিত্ব নিয়ে । জানা গেছে, রুংতা প্রজেক্টের স্নেহভাজন রুংতা সহ বেশ কিছু ব্যবসায়ীর আর্থিক সহায়তায় তিনি ততোধিক স্নেহভাজন এস এম সিং–কে পাটনার রিজিওন্যাল সেলস ম্যানেজার বি মিশ্রকে সঙ্গী হিসেবে দিয়ে দিল্লি পাঠিয়ে ছিলেন লবি করতে । আরও জানা গেছে, তিনি নিজে সাংসদ হারাধন রায়ের চিঠি নিয়ে ৫.১.৯০ তারিখে মহাকরণে ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বিনয় চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন । পরদিন বিনয়বাবুই তাঁকে নিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবুর কাছে । তখন দুপুর ১২টা । উৎপলের আশা ছিল : জ্যোতিবাবুর বন্ধু ভি পি সিংকে দিয়ে তাঁর একটা 'হিল্লে' করাবেন ।

কিন্তু জ্যোতিবাবু উৎপলকে উৎসাহিত করেন নি । অগত্যা বিফল মনোরথ উৎপল কয়লা শিল্পের ইতিহাসে চূড়ান্ত বেয়াদপির ছাপ রেখে ৬.১.৯০ তারিখের অপরাহ্নে সি আই এস পি ডি এল এর সি এম ডি পদে যোগ দিতে রাঁচির উদ্দেশ্যে রওনা হন ।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, গৃহযুদ্ধের পরাজিত নায়ক উৎপল চূড়ান্ত দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারের দায় মাথায় নিয়ে অপসারিত হলেও গত ৩৩ মাসে তিনি ই সি এলকে ৩৩০ কোটি টোকার লোকসানের সম্মুখীন করে গেছেন । খনিগুলিকে এমন সংকটজনক অবস্থায় এনে রেখে গেছেন যে, সেগুলিকে চাঙ্গা করে তুলতে ন্যূনপক্ষে ২ বছর সময় লাগবে । কিন্তু এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হাল ধরবে কে ? বর্তমান সি এম ডি এস পি মাথুরকেও দেখা যাচ্ছে, উৎপলের ঘনিষ্ঠজনকে গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দায়িত্বে বসাচ্ছেন ।

মাধবানন্দ ভট্টাচার্য

বিস্ময় যুবক কিবরিয়া

কিবরিয়া, পাই-ই যার হাত

কিবরিয়া, এক দুর্জয় সাহসী কিম্বা এক একনিষ্ঠ ঈশ্বরবিশ্বাসীর অন্য নাম। হাতহীন কিবরিয়া ছিল তার খেলার সাথীদের হাসির পাত্র। এই হাসিই তাকে করে তুলেছে অসম্ভব জেদী এবং ঈশ্বর-প্রাণ। আর তা থেকেই আজ সে সকলের নয়নমণি। সে প্রমাণ করেছে--হাতই মানুষের সব নয়। পা দিয়েই পুরিয়ে নেওয়া যায় তার অভাব। ভাল হয়ে ওঠা যায় লেখা পড়া, চিত্রকলা এবং খেলাধুলোয়। এবারের প্রেরণা পর্বে সেই বিস্ময় যুবকেরই কথকতা।

সেদিনটা রবিবার। দক্ষিণ ২৪-- পরগণার মহেশতলার দৌলতপুরের ফুটবল মাঠ ভিড়ে উপচে পড়েছে। স্থানীয় এক প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা হচ্ছে এই অঞ্চলেরই মিতালী সংঘের সঙ্গে বাইরের এক টিমের। নাম, নবারুণ সংঘ। স্বাভাবিক কারণেই দর্শকদের বড় অংশটাই প্রবল হর্ষধ্বনিতে উৎসাহিত করছে স্থানীয় ক্লাবটিকে। কিন্তু তা হলে হবে কি, নবারুণ সঙ্ঘের ফরোয়ার্ড লাইন এত শক্তিশালী যে তারা মুহুর্মুহু মিতালী সঙ্ঘের ডিফেন্সে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রতিবারই তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিচ্ছে হাফলাইনে চীনের প্রাচীরের মত দাঁড়ানো কিবরিয়া হোসেনের বুলেটের মত তীব্র শট। এক এক সময় তার দেহটা শূন্যে লাফিয়ে উঠছে জ্যামুক্ত তীরের মত, তারপর জোরালো হেডে সে বল ফেলছে বিপক্ষ সীমানার কাছে। গোটা টিমটাকে উজ্জীবিত করছে ও একাই। তাই স্থানীয় দর্শকদের উল্লাসের প্রায় সবটাই বর্ষিত হচ্ছে কিবরিয়াকে ঘিরে। মাঠ জুড়ে কেবল কিবরিয়া, কিবরিয়া, কিবরিয়া। বহু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত নবারুণ সংঘ মিতালী সংঘকে হারাতে পারল না। শেষ পর্যন্ত এক গোলে হেরে গেল তারাই। খেলা শেষ হলে দলের সব খেলোয়াড়ই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল কিবরিয়াকে। প্রত্যুত্তরে কিবরিয়া কিন্তু তাদের জড়িয়ে ধরতে পারল না। পারবেই বা কি করে? সে যে দুটি হাত ছাড়াই পৃথিবীর আলো দেখেছে। আজ পর্যন্ত দুই হাত হীন কোন ফুটবল খেলোয়াড়ের কথা শোনা যায়নি দেশে বা বিদেশে। তবু তাকে দাবিয়ে রাখা যায়নি। যদি তার দুই হাত থাকত, তবে সে কলকাতার তথাকথিত বহু নামী ফুটবলারের মাথা হেঁট করিয়ে ফুটবল মাঠে দাবিয়ে বেড়াত বলে তার বন্ধুদের বিশ্বাস। হয়তো এমনও হতে পরে কিবরিয়ার দুটি হাত নেই বলেই সে এতটা জেদী হয়ে উঠেছে। লেখাপড়া, খেলাধুলো কোন কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারে নি, কিবরিয়াকে বিধাতার না দেওয়া দুটি হাত। এবছরই তো সে বি·এ· পরীক্ষা দিয়েছে। পা দুটিই কিবরিয়ার প্রিয় সাথী। তার শ্রেষ্ঠরত্ন। এই পায়েই যেন তার কথা বলা, কাজ করা, ছবি আঁকা। সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক তার এই এক জোড়া পা।

হাত না থাকায় অনেকে ছেলেবেলায় কিবরিয়াকে জগন্নাথ বলে ঠাট্টাও করেছে। ঠাকুর জগন্নাথের আর সব আছে, কিন্তু নেই তাঁর দুটি হাত। কিন্তু তিনি তো পৃথিবীকে সচল রেখেছেন। তাহলে কিবরিয়ার চিন্তা কিসের? সহজ সরল নম্র স্বভাবের কিবরিয়ার প্রথম প্রথম দু'চোখ বেয়ে অভিমানে জল ঝরে পড়ত। আল্লাহর কাছে সে জল ভরা দুটি চোখ তুলে বলত, প্রভু তুমি আমার বেলায় কেন এত কৃপণতা করলে? সবই যখন দিতে পারলে, হাত দুটি দিতে পারলে না? কোন কোন সময় কিবরিয়ার মনে হত আল্লাহ যেন তাকে অভয়

আহাররত কিবরিয়া, পাশে মা

বাণী দিচ্ছেন, তোকে গড়ার সময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, তাই ভুলটা হয়ে গেল। ভয় নেই, তোর পা-ই হাতের অভাব পূরণ করবে। তুই অনেক বড় হবি। রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে কিবরিয়া যেন করুণাময় আল্লাহর এই অভয় বাণী শুনত। তার মনে হত, দুনিয়াতে অনেক কান্না, সেটা হচ্ছে সংবাদ, কিন্তু অনেক কান্না ছাপিয়ে শুনতে পাওয়া যায় একটি হাসির শব্দ, সেটাই হচ্ছে সত্য। দুনিয়ায় এত মৃত্যু সেটা হচ্ছে সংবাদ, কিন্তু সমস্ত পূতিগন্ধ ছাপিয়ে ঘ্রাণে ভেসে আসে এক পুষ্প সৌরভ, সেটিই সত্য। দুনিয়ায় আছে অনেক তৃষ্ণা, বঞ্চনা, সেটা সংবাদ, কিন্তু সেই ক্ষুধা ও বঞ্চনার উর্দ্ধে দেখা যায় একটি ক্ষুধাময়, অতলস্পর্শ তৃপ্তি, সেটিই সত্য। তাই কিবরিয়া ভেবেছে, জীবন শুধু ক্ষুধা আর বঞ্চনার হাহাকারই হবে না, জীবন দেখাবে একটি অনির্বচনীয় প্রসন্নতা, সহজলভ্যের মধ্যে এক দুর্লভ আর্বিভাবকে। তাই কিবরিয়া বুঝেছে, আল্লাহ একবেলার কাঙালী ভোজের আসরে মানুষকে ডাক দিয়ে ফেরেন না, ডাকেন অনন্তকালের অমৃত ভোজের নিমন্ত্রণে। এই বোধটা হাল্কাভাবে কিবরিয়ার মনে হলেও তাতে একটি সুস্পষ্ট রূপ দিয়েছেন, তার শিক্ষাগুরু মৌলবী জামদেশ ওস্তাদজী। কিবরিয়ার কাছে তিনি যেন আল্লাহর প্রতিনিধি।

কিবরিয়ার মাস্টারমশাই ধীরে ধীরে তার জ্ঞানের বর্তিকায় অগ্নিসংযোগ করেছেন, শিখিয়েছেন কি করে ইচ্ছা থাকলে সফল হওয়া যায়। তাই ওস্তাদজী কিবরিয়াকে শুধু পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করার কাজেই ক্ষান্ত থাকেননি। দিয়েছেন মহাজীবনের সন্ধান। গুরুর কৃপায় পঙ্গুও গিরি লংঘন করতে পারে, সেটা যে নিছক কথার কথা নয়, তা জামশেদজীকে দেখে কিবরিয়া উপলব্ধি করেছে। তাই জামশেদজীর প্রতি কিবরিয়ার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাঁর কথা ভাবলেই কিবরিয়ার মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে। মৌলবী সাহেবই কিবরিয়াকে শিখিয়েছেন, আল্লাহ কাউকেই সব দিক দিয়ে পরিপূর্ণ করে পৃথিবীতে পাঠান না। অপূর্ণতা থাকে হয় তার দেহে অথবা মনে। যে এই অপূর্ণতা পূর্ণ করে নিতে পারে, সেই আল্লাহর কৃপা পায়। এই মৌলবী সাহেব যদি কিবরিয়ার মনকে পূর্ণ করার সহায়তা করে থাকেন তবে তার হাতের অভাব পূরণ করার কাজে সহায়তা করেছেন তার করুণাময়ী মা। বছর চার পাঁচ আগেই যার এন্তেকাল হয়েছে। আজ মার কথা মনে পড়লে কিবরিয়ার দু-চোখ জলে ভরে ওঠে। স্বল্প শিক্ষিত তার মা যে কত ত্যাগী, বুদ্ধিমতী ও মহিয়সী তা অল্প কথায় বোঝানো সম্ভব নয় কিবরিয়ার। কিবরিয়া এক এক সময় উদাস হয়ে যায়। ভাবে, একদিন সে মানুষের মত মানুষ হবে, কিন্তু সে তার আর করুণাঘন প্রসন্ন দৃষ্টি দেখতে পাবে না। মা-ই কিবরিয়াকে হাতের পরিপূরক হিসাবে পায়ের ব্যবহার করতে শিখিয়েছিলেন। এটা ছিল তার কাছে চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা তিনি যে কি করে করেছিলেন, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। আজ লেখা, ছবি আঁকা, খাওয়া-দাওয়া খেলাধুলো সব কিছুই স্বচ্ছন্দে করতে পারে কিবরিয়া। তার সবই আছে, কেবল নেই মাকে নিয়ে গড়া পৃথিবীটা।

স্মৃতির পাতা নাড়তে নাড়তে কিবরিয়া এক সময় ফিরে যায় পুরনো দিনে। মার ছবিটা জ্বল জ্বল করতে থাকে মনের মধ্যে। চোখের পাতা ঝাপসা হয়ে আসে। কিবরিয়া বলে, আমার ভবিষ্যত নিয়েও অভিভাবকদের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় ছিল। শেষ পর্যন্ত মার নিরলস প্রচেষ্টাই অভিভাবকদের অনেকটা আশঙ্কা মুক্ত করল। আমাকে খাইয়ে না দিয়ে মাখা ভাতের থালায় একটা চামচ ফেলে দিয়ে মা দরজার আড়ালে লুকিয়ে পড়তেন। আড়াল থেকে দেখতেন শিশু কি করে। একমুঠো ভাত মুখে দিতে শিশু কিবরিয়া ব্যাকুল হয়ে উঠত। চামচ করে ভাত তুলতে গেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ত। মুখে যেত না, এক দানাও। শিশু কিবরিয়া ব্যাকুল হয়ে শেষ পর্যন্ত কাঁদতে শুরু করত। কিছুক্ষণ পর বিপন্ন শিশুর কষ্ট দেখে মা ছুটে আসতেন। চামচটা পায়ে আটকিয়ে মুখে গ্রাস তোলার সহযোগিতা করতেন। তবু হাতে করে খাইয়ে দিতেন না। এমনি করেই ধাপে ধাপে একদিন পায়ের সাহায্যে খাওয়ার অভ্যাসটা কিবরিয়া রপ্ত করে ফেলল।

এরপর আস্তে আস্তে কিবরিয়া যত বড় হতে লাগল, ততই পৃথিবীটা তার কাছে নানান রঙে নানান বৈচিত্র্যে ধরা দিতে লাগল। বাড়ির দাওয়ায় বসে দেখত পৃথিবীর রূপ। সে বুঝল পৃথিবীকে শুধু দেখলেই চলবে না, উপলব্ধি করতে হবে, তার জন্য লেখাপড়া করা দরকার। সে যখন সকাল হতেই তার বন্ধুদের বই হাতে প্রাইভেট ট্যুইসন অথবা একটু পরে স্কুলে যেতে দেখত, তখন তার মনটা ছটফট করে উঠত। তাছাড়া বাড়িতে বসে বসে সময় কাটাবেই বা সে কি করে? একটা কিছুর মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে হবে তো। কাজ আর দায়িত্ব ছাড়া তো পাগলরাই বেঁচে থাকে। অপরে করুণা দেখাবে, একথাটা কল্পনাও করতে পারে না কিবরিয়া। খেলাধুলো করতে হলে প্রধান যে জিনিসটা দরকার অর্থাৎ হাত দুটোও তার নেই। কিবরিয়া শেষে সংকল্প করে তাকে পড়াশুনো করতে হবেই। তারপর আবার তার মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়। পড়া না হয় গেল, কিন্তু লিখতে না পারলে সবই তো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। লিখবে সে কি করে? সাতকাহন এভাবে ভেবে আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে একদিন সে তার আব্বাজানকে বলে, আমি স্কুলে যাব। ছেলের কথা শুনে আব্বাজানের চোখ কপালে উঠে যায়। এ যেন ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, অনেকটা নিধিরাম সর্দ্দারের কথা। আব্বাজান মনে করেন, এ নেহাৎই ছেলেমানুষী। তাই অনেকটা নিস্পৃহ হয়েই জবাব দেন, আচ্ছা দেখা যাবে। এখন খেলাধুলো কর। খেলাধুলোর কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে তার গলাটা একটু কেঁপে ওঠে। ছেলেকে হ্যাঁ, বা না কোনটাই স্পষ্ট করে না বলতে পারার জন্য মনটা তাঁর বেদনায় ভরে ওঠে বৈকি। কিবরিয়ার অভিমান হয়, সে ভাবে তার আব্বাজানের বোধহয় সায় নেই। তাই অগতির গতি সে মায়ের কাছে গিয়েই দাঁড়ায়। মুস্কিল আসান তো সেই মা-ই। কোন দ্বিধা না করে মাকেই সরাসরি স্কুলে যাবার কথা বলে কিবরিয়া। মা রান্নাঘরে কড়াইয়ে খুন্তি নাড়তে নাড়তে কথাটা শোনায়,

প্রথমে বুঝতে পারেন নি ছেলে কি বলছে। ভেবেছিলেন, ছেলে বোধহয় কোন কিছুর জন্য বায়না ধরেছে। কিবরিয়ার হাতদুটো না থাকায় তার প্রতি মায়ের মমতা এমনিতেই সহস্র গুণ বেড়েছিল, তাই ছেলে কোন কিছুর জন্য আব্দার করলে তিনি সাধ্যমত তা পূরণের চেষ্টা করতেন। খুন্তি নাড়তে নাড়তে কিবরিয়ার অসম্পূর্ণ কথা কানে যেতেই তিনি ছেলেকে বললেন, কি বলছিস! কিবরিয়া বলে, আম্মা, আমি ইস্কুলে যাব। কিবরিয়ার দু চোখ আনন্দে আর উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে। মা চাইলেন না, তার চোখের ওই ঝলকটুকু কেড়ে নিতে। দয়াময়ী মা, তাই বিস্ময়ের ভাবটুকু গোপন রেখে ছেলেকে বললেন, তোর আব্বাকে বল। এবার কিবরিয়া হতাশার সুরে বলল, বলেছিলাম, আব্বা কিছু বলছে না। এবার ছেলের সঙ্গে মায়ের জেদ চেপে যায়। মা বলেন, ঠিক আছে, আমি কালই তোকে ইস্কুলে নিয়ে যাব। পরের দিন থেকেই মা ছেলেকে নিয়ে একটার পর একটা প্রাইমারি স্কুলে ঘুরতে থাকেন। কিন্তু প্রতিটি স্কুল থেকেই বাধা আসে। ছাত্র লিখতে না পারলে, কোন নীতিতে স্কুলে ভর্তি করবেন কর্তৃপক্ষ? যার হাতই নেই সে লিখবে কি করে? বিকলাঙ্গ ছেলেদের পড়াবার কোন স্কুল ওই অঞ্চলেই নেই। ছেলে মাঝে মাঝে হতাশ হয়, কিন্তু মা হলে ছাড়েন না। ছেলেকে উৎসাহ দেন। দিনের পর দিন গড়িয়ে যায়। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এক হৃদয়বান মানুষের সামনে এসে পড়ল মা ও ছেলে। হাতহীন এক কিশোরকে তার মার সঙ্গে ঘুরতে দেখে তিনি ভেবেছিলেন, ওরা বোধহয় ঘুরতে দেখে তিনি ভেবেছিলেন, ওরা বোধহয় সাহায্যপ্রার্থী। ছেলেটির মুখ শুকনো, তার ওপর তার হাত দুটি নেই দেখে তাঁর মন করুণায় ভরে উঠল। তিনি এগিয়ে এসে কিবরিয়ার মাকে সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিসের জন্য ঘুরছ মা? মা ওই বৃদ্ধ মৌলবীকে তার প্রচেষ্টা ও হতাশার কথা বলতেই, তিনি বললেন, ভেব না, আল্লাহ মেহেরবান, একটা উপায় হবেই। ইনিই মৌলবী জামশেদ ওস্তাদজী। ওস্তাদজী অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাতে কিবরিয়াকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। তারই কৃপায় কিবরিয়া পঙ্গু হয়েও গিরি লঙ্ঘন করতে সক্ষম হয়েছিল।

চা-পানে ব্যস্ত কিবরিয়া

ওস্তাদজীর প্রতিশ্রুতিতে এক ঝটকায় হতাশার জগদ্দল পাথরটা সরিয়ে দিয়ে ফিরে গেল কিবরিয়া ও তার মা। যাবার আগে কিবরিয়ার মা ওস্তাদজীকে সেলাম জানিয়ে বলে গেলেন, কালই তিনি ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করতে আনবেন।

ওস্তাদজীর বাড়ি কাছেই, নন্দরামপুরে। হাত না থাকলেও শিক্ষা মানুষকে বাধা দেয় না, এই চিন্তা ওস্তাদজীর মনে গভীর দাগ কেটেছিল। তিনি কিবরিয়াকে অমাবস্যায় চাঁদের আলোই দেখতে চেয়েছিলেন। ওস্তাদজী বলেছিলেন, অন্ধ হলে না হয় একটা কথা ছিল কিন্তু কিবরিয়ার হাত ছাড়া সবই তো আছে। তাই কিবরিয়াকে শিক্ষা দানের ব্যাপারটা আমার কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিল। আমি তাই বিনা দ্বিধায় আল্লাহর দোয়া মেঙে কিবরিয়াকে কাছে টেনে নিয়েছিলাম। তাছাড়া ওর সরল ও নম্র কথাবার্তা আমায় গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল।

ওস্তাদজীর উদ্যোগেই কিবরিয়াকে চিংড়িপোতা প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করা হল, বেশ ক'জন শিক্ষকের আপত্তি সত্ত্বেও। এই অঞ্চলে ওস্তাদজীর যথেষ্ট প্রভাব ও সম্মান থাকায়, তার কথা শেষ পর্যন্ত ঠেলা গেল না। দিনরাত ভাবতে লাগলেন ওস্তাদজী, কি করে শুরু করবেন তাঁর সাধনা। একদিন তিনি ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন, এক পাখি একটা কাঠি মুখে নিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটছে। আস্তে আস্তে পাখির মুখটি কিবরিয়ার মুখে পরিণত হল। আনন্দে ধড়ফড়িয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়লেন ওস্তাদজী। ইনসাল্লা, কি অপার করুণা তোমার! খোদা মেহেরবান। সেদিন সকালে তিনি কিবরিয়াকে ডেকে গ্রামের মেঠো স্কুলের ভেজা মাটির মেঝেয় অ-আ বর্ণ ছকে দিলেন। এরপর কিবরিয়ার পায়ে একটা কাঠি গুঁজে বললেন, বর্ণগুলোর ওপর বোলাতে। প্রথম প্রথম হয় কাঠি ভেঙে যেতে লাগল না হয় কিবরিয়ার পা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাটিতে পড়ে যেতে লাগল। কিবরিয়ার দুচোখ বেয়ে জল পড়তে শুরু করল। এই বুঝি তার স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে গেল। ওস্তাদজী হাল ছাড়ার পাত্র নন। তিনি ছাত্রকে দ্বিগুণ উৎসাহিত করতে বলে চললেন,—সাবাস, সাবাস, এই তো 'অ'টা কত সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আ-টাও তো হয়ে গেল। আমি হাতেও এত ভাল লিখতে পারি না। মাস ৩-৪ বাদে ওস্তাদজী কিবরিয়ার পায়ে ধরালেন কলম, নিচে কাগজ। পরীক্ষায় দ্রুত সফল হল কিবরিয়া। ওস্তাদজী একদিন রঙ মাখানো তুলি ধরালে কিবরিয়ার পায়ে। কয়েক মিনিট পরেই কিবরিয়া এক লাল পদ্ম গুরুদক্ষিণা দিল ওস্তাদজীকে। পায়ে আঁকা ওই ছবি গুরুদেব বুকে তুলে নিলেন। এরপর যতদিন যেতে লাগল কিবরিয়া পা দিয়ে গড়গড় করে সব কিছু লিখতে আরম্ভ করল। অঙ্ক, ইংরাজি, ইতিহাস, ভূগোল কোন কিছুই আটকালো না। একটার পর একটা ক্লাস ডিঙিয়ে

কিবরিয়া ভর্তি হল, মাধ্যমিকে, তারপর কলেজে। পথ প্রদর্শক সেই ওস্তাদজী।এ যেন কিবরিয়ার পাশ করা নয়, পাশ করেছেন যেন খোদ ওস্তাদজী। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি লাড্ডু বিতরণ করতে লাগলেন ছাত্র, মাস্টারমশাই ও প্রতিবেশীদের। তবে কিবরিয়া জানিয়েছে, সে পড়াশুনোর ব্যাপারে অন্যান্য যাদের নানাভাবে সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছে তাদের মধ্যে আছেন স্থানীয় বিধায়ক ক্ষিতিভূষণ রায় বর্মন, শ্রমিক নেতা আবুল বাসার, রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডঃ অসীম দাশগুপ্ত ও তার এক মামা বিয়াসুদ্দিন মল্লিক। কিবরিয়া যাতে বিনা বেতনে পড়তে পারে, তাকে যাতে বিনা মূল্যে বই সরবরাহ করা হয়, সে যাতে কলেজে ভর্তি হতে পারে, তার জন্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ছোটাছুটি করেছেন ক্ষিতিভূষণ বাবুই।

স্কুলেই একটু ওপরের ক্লাসে পড়ার সময় কিবরিয়া দেখ'ত তার সমবয়সী বন্ধুরা সকাল বিকাল দুবেলা ফুটবলে লাথি মারে। মাঝে মাঝে ওর পা দুটোও বলের স্পর্শ পাবার জন্য ছটফট করত। একদিন মনের অস্থিরতা চাপতে না পেরে কিবরিয়া আব্বার কাছে ফুটবল খেলার অনুমতি চাইল। লেখাপড়ার অনুমতি চাইতে গেলে আব্বা যেমন উদাস হয়ে পড়েছিলেন, এবার আর হলেন না। তিনি কিবরিয়া আর তার মার কাছে দারুণভাবে হেরে গিয়েছিলেন। অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছিলেন তিনি। কিছুটা অসহায় দৃষ্টি মেলে তিনি ছেলেকে বললেন, তোমার আম্মাকে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যা বলবেন, তাই হবে। আম্মা'র অনুমতির ব্যাপারে কিবরিয়ার কোন চিন্তা ছিল না। মা বললেন, খেল, তবে সাবধানে। ভুলে যেও না তোমার পা দুটি গেলে আর কিছু থাকবে না। ওস্তাদজীর কাছেও অনুমতি চাইল কিবরিয়া। তিনি এক ধাপ এগিয়ে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন, কিবরিয়া তুই যাতেই পা দিবি তাতেই সফল হবি। ভয় কি, আল্লাহর করুণা তোর ওপর আছে। আমি হলফ করে বলতে পারি, একদিন তুই এই অঞ্চলের ডাকসাইটে খেলোয়াড় হবি। মা আর গুরুজীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে একদিন কিবরিয়া সবুজ মাঠে এসে দাঁড়াল। এরপর আস্তে অআস্তে পা দিয়ে বল ঠেলল। সেই শুরু।

এরপর বছর খানেকের ভেতর মহেশতলা দৌলতপুরের মিতালী সংঘের ডিফেন্স হাফ হিসাবে কিবরিয়া হোসেনের নাম ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশের অঞ্চলে। কথায় কথায় কিবরিয়া বলছিল, হাতদুটো যদি থাকত তাহলে আরো ভাল খেলতে পারতাম। হাত দুটোর অনুপস্থিতিতে ব্যালান্সের একটু অসুবিধা হয়। মুভমেন্টের সময় প্লেয়ারদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ায় একটু বাধা আসে। সদাই মনে হয় কোন অখেলোয়াড় সুলভ মনোভাবের খেলোয়াড় পায়ে আঘাত না করে। তাহলে শেষ সম্বল পা দুটোই চলে যাবে। দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার গ্রামীণ ফুটবলে বেশ নাম আছে। কিবরিয়া প্রথম প্রথম ফরোয়ার্ডে খেলত। কিন্তু প্রচণ্ড দম আর
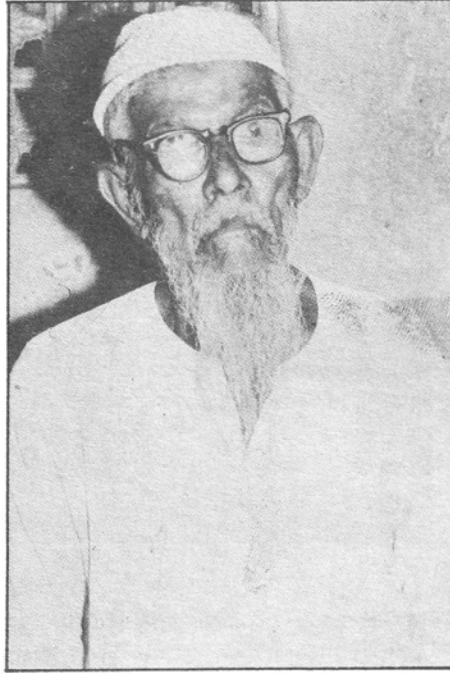
কিবরিয়ার শিক্ষাগুরু, প্রেরণা,জামশেদ ওস্তাদজী

শারীরিক ভারসাম্য রাখা সবসময় সম্ভব নয় বলে সে পরে হাফ লাইনে খেলার সিদ্ধান্ত নেয়। সে তার স্কুল ও কলেজকে বহু সম্মান ও পুরস্কার এনে দিয়েছে। কিবরিয়া বি·এ· পরীক্ষা দেয় বজবজ কলেজ থেকে। ভাল খেলার সুবাদে তার প্রাইভেট টিউটর অনেকটা ছাড় দিয়েছেন তাকে।

বল নিয়ে দ্রুত ছোটার মুখে কিবিরিয়া সমস্ত দেহটা বস্তুত শূন্যে ভাসিয়ে দেয়। এতে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। এ মন্তব্য করায় সে বলেছিল। খোদা মেহেরবান, আমি জানি আমার কোন বিপদ হবে না। আর আল্লাহ তো আমায় পাঠিয়েছেন লড়াই করে বেঁচে থাকার জন্যে। তবে কেন আমি ভয় পাব? তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ফুটবল খেলার অনুপ্রেরণা তুমি কোথায় পেলে? জবাবে সলজ্জ হাসি হেসে কিবরিয়া বলেছিল, অতীতের খ্যাত কীর্তি ফুটবলার গোষ্ঠ পাল আমার আদর্শ ও প্রেরণার উৎস। তাই হয়তো খেলার বিভিন্ন পত্র পত্রিকা পড়ে সে গোষ্ঠপালকে দ্রোণাচার্যের মত গুরুর আসনে বসিয়েছে। তবে সে বলেছিল, স্কুলের কেউই প্রথম তাকে খেলার সুযোগ করে দেয়নি। দায়িত্বের কথা ভেবে। পরে সতীর্থদের সঙ্গে লুকিয়ে মাঠে যেতে যেতে সে উজ্জীবিত হয়। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে ওঠে। তারপর ক্রমপর্যায়ে সে কি করে বড় স্কোরার আর ডিফেণ্ডার হয়েছিল সে নিজেই জানে না।

কিবরিয়া এবার ১২ জানুয়ারি ২১ বছরে পড়বে। পঙ্গু জড় জীবনের অভিশাপে সে ভেঙে পড়েনি। বরং বাঁচার সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহকে সে বলছে এই দেখ, আমিও পারি। সে বলে, নাই বা থাকল আমার হাত। বাঁচার অধিকার কেউ তো কেড়ে নেয়নি। দু'পায়ে এতটা এগিয়ে যে এলাম, তারজন্যও ঈশ্বরের দান কম নয়। এই আত্মতুষ্টি আর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে দুর্বার গতিতে কিবরিয়া এগিয়ে চলেছে।

তবু এর মধ্যে নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে কিবরিয়া কিছুটা সংশয়াচ্ছন্ন। ভবিষ্যতে কি হবে, কে দেখবে প্রতিবন্ধী জীবনের এসব ভাবনা তাকে পেয়ে বসেছে। তার ইচ্ছা—তিন ধরনের কাজের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া। এক, কোন প্রতিষ্ঠানের ঘোষক। দুই, কোন সংস্থার রিসেপশনিস্ট। তিন শিক্ষকতা। সে সব কিছু থেকে বেশি গুরুত্ব দেয় খেলাধূলাকে। সে ক্ষেত্রেও বাধা। মেডিকেলি ফিট্ আনফিটের প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেয়। তাই পেশাগত জীবনে বড় খেলোয়াড় হবার দুঃস্বপ্ন সে দেখে না। তবে বাঙলা-র ফুটবলের অগ্রগতিতে আশাবাদী কিবরিয়া বলে, গ্রামভিত্তিক খেলা-গুলোকে যেভাবে বাম ক্রীড়া ও যুব দপ্তর গুরুত্ব দিচ্ছেন তাতে তরুণরা ভীষণভাবে অনুপ্রেরণা পাচ্ছে। নিজের প্রমাণ দিয়েই একথা জানিয়েছে। তবে সে কেন অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আতঙ্কিত হবে? সরকার তো প্রতিবন্ধীদের জন্য গালভরা নানান প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে কিবরিয়ার মত প্রতিভাবান ছেলে কেন বঞ্চিত হবে? হতাশা যখন মনকে গ্রাস করে তখন কিবরিয়া সেই আল্লাহ মেহেরবানকেই ডাকে। বলে, আমি জানি না কোথায় তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। আমি যে একা যাচ্ছি না, পায়ে পায়ে তুমি যে আমার সঙ্গে আছ এইটুকুই আমার সাহস, এইটুকুই আমার সান্ত্বনা। দারুণ খরতাপের মধ্য দিয়ে চলেছি, চলছি একটানা——জানি না কোথায় তোমার রক্ষ-ছায়া। তুমি আমার কাছে ছায়া হয়ে আসো নি, এসেছ রৌদ্র হয়ে। শান্তি হয়ে আসো নি, এসেছ ক্লান্তি হয়ে। তোমার কৃপা দেখা দিয়েছে কষ্টের মূর্তিতে। প্রত্যেক ছন্দোবদ্ধ কবিতার একজন কবি আছে আর এ সৃষ্ট কবিতার একজন কাব্যকর্তা নেই? নেই তো এত ছন্দ কেন, এত ঐক্য কেন, বৈচিত্র্যের মধ্যেও কেন এত পারম্পর্য? এই ঋতুর পর্যায়, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, আবার শীতের পর মধুমাস। এই বয়সের ক্রমান্বয়, বাল্যের পর কৈশোর, কৈশোরের পর যৌবন। কেন বা একটি অবধারিত অবসান! যেখানে এমন একটি রীতির দৃঢ়তা সেখানে একজন নিয়ন্তা নেই? সে গৃহে আমরা সহজেই একজন গৃহস্বামী কল্পনা করি, যে গৃহে আলো জ্বলে, যে গৃহের ঘর সাজানো গোছানো। তবে এই বিশ্বসৃষ্টির ঘরে যে আলো জ্বলছে, সূর্যে-চন্দ্রে আর নক্ষত্রে, সে ঘরের কি একজন কেউ কর্তা নেই? যেখানে এত সৌষ্ঠব এত পরিপাট্য সেখানে কি নেই কোন কারিগর? গ্রন্থ আছে, প্রণেতা নেই, চিত্র আছে শিল্পী নেই, কাজ আছে কিবরিয়ার মত কর্মী নেই, একথা বিশ্বাস করা যায়?

— চন্দন নিয়োগী

ছবি : অশোক পাটোয়ারি

মৃত সেই বাঘ

অবিস্মরণীয় শিকার-পর্ব

একই শিকারপর্বে পরপর বেশ ক'য়টি স্মরণীয় ঘটনা প্রায়শই ঘটে না। এই বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটেছিল এই শিকারকথার কথাকারের জীবনে এবং তা সেই একবারই।

যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে শিকার করে বেড়িয়েছেন, তাঁদের জীবনে কখনো কোনো বিচিত্র স্থানে বা অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে নানারকম বিস্ময়কর সব ঘটনা ঘটে থাকতে পারে, কিন্তু একবারের একটা শিকারের পর্বেই পরপর বেশ কটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে যাওয়াটা সত্যিই দ্বিতীয়বার ঘটে না। আমার জীবনে এরকম হয়েছিল একবার।

নিউইয়র্ক থেকে সদ্যআগত সঙ্গীর সঙ্গে সেবার হাজারীবাগের জঙ্গলে শিকারে বেরিয়েছি। ওর নাম বব, তখনো ভাল করে আলাপই হয়নি, পরে এগারোবার একসঙ্গে শিকারে বেরিয়ে দুজনে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। কিন্তু, প্রথম শিকারে বেরিয়েই আমরা মারতে গেছি চিতা। চিতা শিকার সহজ ব্যাপার না। সূর্য ডোবার প্রায় ঘন্টাখানেক আগে আমাদেরকে মাচানে তুলে দিয়ে গেলেন বাবা আর অমর সিংহ। অমর সিংহ বাবার বিশেষ বন্ধু এবং যে অঞ্চলে আমরা শিকার করছি সে অঞ্চলের রাজা। বাবা আর অমর সিংহ জীপ যেদিকে গেছে সেদিকে চলে গেলেন অন্যান্যদের সঙ্গে। বাবার একটা বিশেষ পদ্ধতি ছিল শিকারের, সেটা হচ্ছে, কুকুরের মত চীৎকার করে শিকারকে বিভ্রান্ত করা। জীপটা তখন শ'খানেক গজ দূরে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে। ক্যাম্পবয় শিবনা গাড়ির মধ্যে বাবাদের জন্য কফি বানাচ্ছিল। চিতাটির অর্ধভুক্ত যে জীবটির দিকে লক্ষ্য স্থির করে বসে আছি, সেটা একটা বেশ বড় সাদা গরু। শুনতে পেলাম, বাবা অমর সিংহের সঙ্গে বাজী ধরছেন এই বলে যে, চিতাটা ওই মড়িতেই আসবে এবং মরবে।

জঙ্গলের মধ্যে সময় যেন কাটতেই চায় না। বব আর আমি মাচানের ওপর পা ছড়িয়ে বসেছিলাম। পেছনেও অনেকটা জায়গা। মোটমাট, কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না। আমাদের এই মাচানটা বাঁধা হয়েছে একটা গাছে এবং প্রায় ১৫ ফুট ওপরে। পাশে একটা শুকনো নালা। আমাদের নিচে বড় বড় গোল গোল নুড়ির বিছানা। মরা গরুটার আশে পাশে চিতাটার পায়ের ছাপ দেখতে পাইনি।

মাচানে বসে থাকতে হয় একেবারে নিঃশব্দে, স্থির হয়ে। আমার আর ববের মাঝখানে বন্দুক দুটো রাখা। ববেরটা পয়েন্ট ৪৬৫ হল্যাণ্ড বক্সলক, আমারটা পয়েন্ট ৪৭০ ম্যান্টন। অনেকক্ষণ পর, হঠাৎ নালাটার ওপারে খসখস শব্দ। গাছপাতার ফাঁকে একটা চলমান কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করছি। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সাড়ে আট ফুটের মতন লম্বা প্যান্থারটি দৃশ্যমান হল। কি চমৎকার এবং রাজকীয় তার ভঙ্গী।

ববের হাত রাইফেলের ওপর যেতে না যেতেই আমি ওটা চেপে ধরে রেখেছি। প্যান্থারটা রয়েছে বড়জোর কুড়ি ফুট দূরে। চিতাটা আমাদের উপস্থিতি টেরই পায়নি। বাবার ঐ 'কুকুর-চীৎকার পদ্ধতিতে' ঠকেছে বাঘটা। বিন্দুমাত্র দেরি না করে দেখতে এসেছে তার নিজের খাবারে আবার কোন আহাম্মক শেয়াল কুকুর মুখ দিচ্ছে! নালার ভেতর মুখ বাড়িয়ে সে একবার নিজের খাবারটায় চোখ বুলিয়ে নিল চট করে। এবং অসাধারণ গতি ও ভঙ্গীতে সে চলল নিঃশব্দে শিকারে কামড় দিতে। শরীরটা যেন পাকানো স্প্রিং!

বব যে খুব উত্তেজিত বুঝতে পারলাম। মানহাটান থেকে কতশত মাইল দূরে সে আজ একটা জীবনের মত সুযোগ পেতে চলেছে, কিন্তু তবু আমি ওকে সম্মতি দিলাম না। আরেকটু অপেক্ষা করা দরকার। একমিনিটও হয়নি, হলুদ বেড়ালটি ঘনঝোপঝাড় পার হয়ে মরা গরুটার ওপর গিয়ে হামলে পড়ল। গরুটার গলার বড় ঘন্টাটা আমি

আগেই খুলে ওটার রাং-এর একজায়গায় পরিয়ে দিয়েছি। ঘন্টাটার আওয়াজ শুনতে পেলাম পরিষ্কার—সঙ্গে সঙ্গে ববকে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত দিলাম, রাইফেলের ওপর থেকে তুলে নিলাম হাত। লক্ষ্য স্থির করে বব গুলি ছুঁড়ল। শক্তিশালী সেই গুলিতে বাঘটির কাঁধের হাড়ের মাঝামাঝি জায়গাটা উড়ে গেল একেবারে। বাবা আর অমর সিংহের নাকি তখনো কফি খাওয়া শেষ হয়নি। মিনিট পাঁচেক লেগেছিল সবমিলিয়ে। অর্থাৎ গল্পটা বলতে যতক্ষণ লাগল, তারচেয়েও কম সময়ে ঘটেছিল শিকার-পর্বটা। বাবা বাজী জিতেছিলেন দশটাকার।

প্রথম শিকার ভাগ্যটা ববের ভালই বলতে হবে। আমরা এরমধ্যে খবর পেলাম, একটা উপত্যকামতন জায়গায় সম্বরদের একটা দল এসেছে। ঐ অঞ্চল থেকেই আরেকটা বাঘেরও খবর পেলাম। বাঘটা নাকি একটা গরু ইতিমধ্যেই মেরে ফেলেছে। আমরা রাইফেল ও শটগান দুরকম অস্ত্রই নিলাম সঙ্গে। অমর সিংহ নিলেন তাঁর রিগবি পয়েন্ট ২৭৫। আমরা অকুস্থলে পৌঁছে 'গেমট্রেইল'-এর সারি তৈরি করে এগোতে থাকলাম। প্রথমে আমি, তারপর অমর সিংহ, তারপর বাবা, সবশেষে বব। আমরা উপরে উঠতে থাকলাম পাহাড়ের। জীপে রেখে এসেছি ইউসুফ আলিকে। ইউসুফ আলি বৃদ্ধ হলে কি হবে, অত্যন্ত সদাশয় এবং টোপফেলার ব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ। হরিণের মাংস ভালোবাসেন বলে একটা ছুরিও এনেছেন সঙ্গে করে ভদ্রলোক। ইউসুফ আলি স্থানীয় লোক, কাছেই তাঁর গ্রাম।

যাইহোক, আমাদের 'গেমট্রেইল' বা লাইনটি পাহাড়ের মাথায় পৌঁছল। বাবা ছোট একটা ছুরি দিয়ে ডালপালা কেটে একটা চমৎকার 'ক্যামুফ্লেজ' তৈরি করলেন। বীট শুরু হতেই খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেশ বড়সড় একটা বাঘ আমাদের কাছাকাছি পাহাড়ের উপরে উঠে এল এবং একটু দাঁড়াল। বাবা যে 'ক্যামুফ্লেজ' তৈরি করেছিলেন সেটায় ছিল বব। বাঘটা সোজা সেদিকে তাকিয়ে থাকল—কিছুটা যেন অন্যমনস্ক ভাবেই। বব জীবনে এই প্রথম এত সামনে জঙ্গলের বাঘ দেখল। বাঘটা পাশফিরতেই বব গুলি করল। সেটা লাগল বাঘটার পাঁজর ও জঙ্ঘার মাঝখানে। দ্বিতীয় গুলিও সে ছুঁড়ল, কিন্তু বাঘটা ততক্ষণে গড়িয়ে ববের ও আমার বাবার মাঝামাঝি জায়গায় এসে পড়েছে এবং নিচের দিকেই যেন চলে গেল।

পেছন থেকে একটা চীৎকার শুনতে পেলাম। কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না, দৌড়ে চলে গেলাম বীটার এবং অন্য শিকারীরা যেদিকে সেদিকে। গিয়ে দেখি, ভয়ার্ত ইউসুফ আলি আর তার সামনে একটা বাঘের মৃতদেহ পড়ে আছে। সেই বাঘটাই। কিন্তু ব্যাপারটা কী! ঝোপঝাড়ের আড়ালে গুলিবিদ্ধ মৃতপ্রায় বাঘটিকে ইউসুফ উপর থেকে গড়িয়ে পড়তে দেখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি সেটিকে

শিকারের পর

হরিণ ভেবে ভুল করে তার ওপর লাফিয়ে পড়েছিলেন। কি অবস্থা। আমরা তো জানি ইউসুফ আলি জীপে বসে আছেন।

ববের সঙ্গে শিকারের এই পর্বে আরো দুটো স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করবো। সেদিন সারাদিন মাচানে বসে কাটিয়ে বাঘের দেখা পেলাম না। সন্ধ্যের মুখে খবর পেলাম, নিকটবর্তী গ্রামের ক্ষেতের ফসল শেষ করে দিচ্ছে শুয়োরে আর ভালুকে। গিয়ে দেখি, সবই প্রায় আখের ক্ষেত, এতে জন্তুজানোয়ার খোঁজা বেশ শক্ত, তবু ভাবলাম, চেষ্টা করা যাক। জীপ দাঁড় করালাম একটা বড় গাছের তলায়। কাজের ছেলেটি সেখানেই রাতের খাওয়ার বন্দোবস্ত শুরু করে দিল।

ঘনকালো শীতের রাত্রি। আমাদের সঙ্গে ছিল জিতন নামের একটি নবীন শিকারী যুবক। সে এবার কাজে নামল। একটা লম্বা দড়িতে সে ডজন খানেক ক্যানেস্তারা বেঁধে কয়েকজন গ্রামবাসীকে ডেকে তাদের সাহায্যে ঐ দড়িটা আখগাছের মাথায় মাথায় ঝুলিয়ে দিল। ব্যস্। এবার, একজনের মাথায় জীপের ব্যাটারিটা খুলে রাখা হল। ছ' ভোল্টের স্পটলাইটের সঙ্গে সেটাকে যুক্ত করা হল। বব এবং অমর সিংহ বন্দুক নিয়ে রেডি থাকলেন। আমি ধরলাম স্পটলাইট।

আখের ক্ষেত ও জঙ্গলের মাঝখানে আমরা পজিশন নিলাম, যেখান দিয়ে শুয়োর বা ভালুক যাকেই হোক পার হতে হবে। গভীর রাত্রে আখ গাছের মাথায় বেঁধে রাখা দড়ির দু'প্রান্ত ধরে টানাটানি করে শুরু হল বীটপর্ব। আমরা স্পষ্ট বুঝলাম, জন্তুগুলি জঙ্গলের বাইরে এসে পড়েছে। আমি স্পটলাইট জ্বালিয়ে দিলাম। ষাটগজের মত দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মস্ত ভালুক। ববকে নির্দেশ দিতেই সে প্রথম ভালুকটিকে গুলি করল। জন্তুটি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গীকেই আক্রমণ করল। বব এবার পেছনেরটাকেও গুলি করল। দুই ভালুকে একেবারে জড়াজড়ি করে মারপিট শুরু করল। আসলে সরল বোকা ভালুক দুটোর ধারণা, একজনের আঘাতের জন্য অপরজনই দায়ী। হঠাৎ আলোর দিকে চোখ পড়ায় ভালুক দুটো বুঝল, আঘাত আসছে অন্য জায়গা থেকে। ওরা আক্রমণ করতে এদিকে ছুটে এল। যে কুলীটির মাথায় ব্যাটারি রাখা ছিল সে ব্যাটা ভয়ে ব্যাটারি ফেলে পালাতে গিয়ে অমর সিংহের বন্দুকের খোঁচা খেয়ে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। ভালুক দুটো আলাদা আলাদা ছুটে আসছিল, আমি প্রথমে একটার ওপর স্পটলাইট ফেললাম, তারপর আরেকটা। বব সুন্দরভাবে নিজের রাইফেলটা কাজে লাগিয়ে যাচ্ছিল। ভারতীয় শ্লথ ভালুকের জীবনীশক্তি দুর্দান্ত। অমর সিংহ শেষমুহূর্তে তাঁর রিগবি'র খেল না দেখালে কি যে হত, ভাবলেও ভয় করে। ভালুক দুটো গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মুখ থুবড়ে পড়েছিল একেবারে আমাদের পায়ের কাছে এসে। অমর সিংহ শুধু যে তাঁর চমৎকার রিগবি'র ক্ষমতাই দেখালেন তা নয়, তিনি ব্যাটারি মাথায় কুলিটাকে না সামলালে একটা লণ্ডভণ্ড ব্যাপার ঘটে যেত। আমি এই প্রথম একজন রাজা এবং একজন কুলীকে এত কাছাকাছি পরস্পরের চোখে চোখ রেখে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

সবশেষে ঘটল চারনম্বর ঘটনাটা। এই কাহিনীর আপাতত শেষ ব্যাপারটা। রাত্রের ভোজন পর্ব কোনো রকমে সেরে আমরা ফের রওনা হলাম। তখন অনেক রাত। আমরা চলেছি ফসলে ভরা ক্ষেত পার হয়ে হয়ে। হঠাৎ একটা বিরাট ভাল্লুক দেখতে পেয়ে ড্রাইভারকে জীপের মুখ সেদিকে ঘোরাতে বললাম। হেডলাইটের আলোয় ভালুকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমাদের জীপের ক্যানভাসের ছাদ আমরা তুলে ফেলেছিলাম। লোহার পাত গুলোর ওপর দিয়ে বব গুলি করার জন্য রেডি হল। ওদিকে ভাল্লুকটা সোজা ছুটে এসে জীপের সামনের মাডগার্ডটায় গুঁতো মেরে ফের মারবার জন্য পিছোতে লাগল। বব ঠিক সেমুহূর্তে ছুঁড়ল গুলি। ভাল্লুকটা দ্রুত ছুটে এল জীপের পেছন দিকটায় এবং পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। নিথর হয়ে গেল ওর বিরাট দেহখানা।

মজার ব্যাপার হচ্ছে পরে আমরা পরীক্ষা করে দেখলাম, ববের গুলিতে ভালুকটা মরেনি। ভালুকটার গায়ে কোনো গুলিই লাগেনি, ভালুকটার মাথায় একটুকরো ছুঁচলো লোহা ঢুকে গিয়ে ওটার মৃত্যু ঘটিয়েছিল। কিন্তু কীভাবে ঢুকল লোহার টুকরোটা? আসলে ফোল্ডেড উইণ্ডশীল্ডের লোহার নাটের শেষ অংশটা পয়েন্ট ৪৬৫ বুলেটে উড়ে গিয়ে সাজা ঢুকে গেছে ভালুকটার মাথায়।

প্রকৃতির বিস্ময়কর ভাণ্ডারে এইসব অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করেছি। এবং অবিস্মরণীয় সেসব ঘটনা আজো সমান আগ্রহে শোনাই সবাইকে।

এ আর এইচ বুলুইমাম

রোরি কেনেডি : অন্যতর জীবন!

রোরি, নামিবিয়ার ক্যাম্পে

রবার্ট কেনেডির মেয়ে রোরি এখন নামিবিয়ায়–শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাতার ভূমিকায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেনেডি পরিবারের বিলাস আশ্রয় ছেড়ে তিনি রৌদ্রতপ্ত মরুভূমিতে কি করছেন!

নীলাভ দুই চোখ। এমন কি চেহারায় অদ্ভুত সাদৃশ্যের পরিচিতির ছাপ। একুশ বছর আগে লস এঞ্জেলসে রবার্ট কেনেডি আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর ইমেজ যে তাঁর মেয়ের চেহারায় বেঁচে থাকতে পারে তা তিনি জেনে যেতে পারেননি, দেখে যেতে পারেননি, শুনেও যেতে পারেননি। কেননা ববি কেনেডির এগারোটি সন্তানের শেষতম সন্তান রোরি জন্মেছিলেন তাঁর বাবার মৃত্যুর ছ'মাস পরে। তাই রোরি কোনোদিন দেখেননি তাঁর বাবা গ্রীষ্মের দিনগুলোতে কিভাবে বোটিং করতেন নান্টুকেটে, তিনি চলমান বোটের একপাশে বসে ছেলেমেয়েদের দু বাহুতে বেঁধে নিতেন কি ভাবে, বা রোরির আর ১০ ভাইবোনের উপর কেমন ছিলো তাঁর ভালবাসা, এইসব।

কিন্তু রবার্ট কেনেডির মেয়ে রোরি আজ কি করছেন আর যা করছেন তা করছেনই বা কেন?

রোরি এখন নামিবিয়ায়। কাজ করেন ডোবরা নামে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন নোংরা বালুময় ক্যাম্পে। যেখানে হাজারাখানেক শরণার্থী পরিবার এক খোলা তাঁবুতে নতুন করে সংসার পেতেছে। শরণার্থীদের মধ্যে কাজ করার অবকাশে ক্যাম্প থেকে দূরে এসে তিনি শান্তভাবে হয়ত বলবেন, 'তিনি (তাঁর বাবা) মানবাধিকার নিয়ে সংগ্রাম করে গেছেন। যে কথাটা আমি ছেলেবেলা থেকেই জানতাম। আমার মা আমাদের জোর করেননি কখনও, কিন্তু ঐ ব্যাপারটা মনে রাখার জন্যে উৎসাহিত করতেন। আমরা কেউই তাঁকে ভুলিনি। তিনি তাঁর আদর্শ নিয়ে সর্বদাই আমাদের মনে বিরাজ করছেন।'

ক্যাম্পের মধ্যে কিন্তু তাঁর কথা বলার সময় নেই। ভিড়ের মধ্যে তাঁর মাথার সোনালী চুল শুধু ভেসে থাকে। বাচ্চাদের দঙ্গলে হাঁটু মুড়ে বসে খেলা করেন ক্যাম্পে। যারা নতুন এসেছে তাদের জন্যে বিছানার বান্ডিল নিয়ে ছুটোছুটি করেন। চেষ্টা করেন অসুস্থ লোককে নোংরা বালি থেকে তুলে খালি তাঁবুতে নিয়ে যেতে, যে তাঁবুগুলি হয়ে উঠবে তাদের তপ্ত দিন আর শীতল রাত্রির আশ্রয়।

এসব দেখেশুনে রোরি কেনেডির ওপর এই ধারণা হওয়াটাও কঠিন নয় যে তাঁর মতো ধনীর দুলালীর গরীবদের জন্যে কাজ করাটা নেহাতই একটা সাময়িক শখের ব্যাপার। রোরি তো ইচ্ছা করলেই হায়ানিস পোর্টে কেনেডি পরিবারে সামার প্লেগ্রাউণ্ডে আড়ম্বরে দিনযাপন করতে পারেন। রোরি, যাঁর অবাধ যাতায়াত সম্ভব মাসিমা-বিশ্বের

শরণার্থী শিশুদের মধ্যে রোরি

প্রধানতম ধনী মহিলা জ্যাকি ওনাসিস-এর বাড়িতে এবং যিনি প্রতিটি ক্রিসমাস বা প্রতিটি উৎসবে কাটাতে পারেন তাবৎ পৃথিবীর উজ্জ্বল পরিবারগুলির সঙ্গে, তিনি জানেন যে এই প্রশ্নগুলি তাঁকে অবশ্যম্ভাবী ভাবে করা হবেই। তিনি তাঁর লম্বা দুই আঙুলের ফাঁকে একটি ক্যামেল সিগারেট ধরালেন, বললেন, 'না, আমি নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ছিলাম এটা বলতে পারি না। এতগুলো ভাইবোনের সঙ্গে থেকে বিলাস কি করে সম্ভব? এবং এখন এখানেও আমি বিলাসিতায় থাকিনা। আমি পথচলতি গাড়িতে হিচ হাইকিং করে বিনা ভাড়ায় সারা দেশ ঘুরেছি। আমি থাকি রিফিউজি ক্যাম্পের একটা ডর্মিটারিতে। আমাকে ডোবরা ক্যাম্পের সমস্ত কিছুই দেখতে হচ্ছে। কোনও শিশু ম্যালেরিয়ায় মারা গেছে বা কোনও শিশু সেখানে জন্মগ্রহণ করেছে-সবই…।'

রোরির এই জীবন ছাড়া আর একটা জীবন আছে সেটা হলো রোড আইল্যান্ড ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের জীবন, যেখানে তিনি আমেরিকার ইতিহাস ও মানবাধিকার বিষয়ে পড়াশোনা করছেন। তিনি তাঁর সেই অন্য জীবনের কথা বলতে ইতস্তত করেন।

'দেখুন, সেখানে আমি একজন ছাত্রী-এক তরুণী মাত্র। সেখানে আমার একটা এ্যাপার্টমেন্ট আছে। আমি স্কী টিমে আছি-খেলাধুলো করি বলেই। তার মানে বলতে পারবেন না যে সেখানেও আমি আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করি।' তাঁর বন্ধু সুজানে, যিনি তাঁর সঙ্গে নামিবিয়ায় রয়েছেন, তিনি অতি বিশ্বস্তভাবেই বললেন, 'আমার বাবা ট্রেন চালান। কিন্তু আমার জীবনযাপন রোরির থেকে আলাদা কিছু নয়, বেশির মধ্যে তার-যা একটা গাড়ি আছে।'

তবে এটা ঠিকই যে, রোরি কেনেডি কেনেডি পরিবারের মেয়ে বলেই আমেরিকার আর দশটা সাধারণ ছাত্রীর পর্যায়ে পড়েন না। তাঁকে, তাঁর পরিবারকে ঘিরে প্রচারের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'আমি এই ব্যাপারটা ব্যবহার করে বহু কাজ পেয়েছি যেটা অন্যভাবে কল্পনাও করতে পারিনা।' তাঁর বরফ-নীল চোখে ও শান্ত মুখে সচেতনতার বেশি উচ্ছ্বাসের স্ফুলিঙ্গ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা দেখা করেছেন তাঁরা বলেন—কেনেডিদের মেয়ে বলে তাঁকে মনেই হয়না। যখন তিনি কাউকে তাঁর মা এথেলের অভাববোধের কথা বলেন, বা কতো কষ্টে তিনি নামিবিয়াতে যোগ দিতে পেরেছেন তার কথা বলেন, তখন তাঁর ছেলেমানুষী স্পষ্ট টের পাওয়া যায়।

কিন্তু এসবের আড়ালে আছে এক বিয়োগব্যথা। তাঁর জন্মের আগেই সেই একুশ বছর আগে যে ট্র্যাজেডি ঘটেছিলো এই পরিবারে, তা তিনি কখনই ভুলতে পারেন না।

-মেরি রিডেল

গোমুখ, গঙ্গার উৎপত্তিস্থল

গঙ্গার উৎসমুখে

পুণ্যাত্মা ভগীরথের ডাকে সাড়া দিয়ে পুরাণ কথিত গঙ্গা যেখানে প্রথম পতিত হয়েছিল সেই উৎসমুখ 'গোমুখ' নিয়ে হিমালয়ের অন্যধর্মী হাতছানির গল্প শুনিয়েছেন ভ্রমণপিপাসু লেখক।

সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানের নশ্বর দেহে প্রাণ সঞ্চারের জন্যে ভগীরথ দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করে-ছিলেন মা গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়নের উদ্দেশ্যে। মহাদেব সেই আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর জটা থেকে নেমেছেন গঙ্গা। হিমালয়ের গোমুখে হয়েছে তাঁর জন্ম। সেখান থেকে গঙ্গাকে শাঁখ বাজাতে বাজাতে ভগীরথ নিয়ে গিয়েছেন নিচে, বহু পথ অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের কপিলমুনির আশ্রম পর্যন্ত। এরপর পুণ্যসলিলা গঙ্গা বিলীন হন সাগরে।

গিয়েছিলাম হিমালয়ের সেই উদ্যানে। গঙ্গার উৎসমুখে। চারদিক জুড়ে বরফ আর বরফ। সামনে বিশাল পাথুরে দেওয়াল। তুষারের আস্তরণে ঢাকা। নিচে কালো গহ্বর, বরফ–গলা জল আসছে ভেতর থেকে। ঠিক তার সামনে ভাগীরথী শিখরমালা। আরো দূরে দাঁড়িয়ে শিখর শিবলিঙ্গ (মহাদেব) ভাগীরথীর উৎস মুখে দাঁড়িয়ে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করেছি মহাদেবের জটা থেকে গঙ্গার অবতরণকে।

হিমালয়ের গোমুখ থেকে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত গঙ্গার পরিচয় ভাগীরথী নামে। দেবপ্রয়াগে এর সাথে মহামিলন হয়েছে অলকানন্দার। এরপর থেকে তাঁর গঙ্গা নাম নিয়ে নিচে অবতরণ।

গাড়োয়াল হিমালয়ের গঙ্গোত্রী গোমুখ হিমালয়প্রেমীদের কাছে স্বর্গ। গঙ্গোত্রী পর্যন্ত পাকা রাস্তা। মরসুমে হরিদ্বার, হৃষিকেশ এবং উত্তরকাশী থেকে বাস যাতায়াত করে। নৈসর্গিক রূপ ছড়িয়ে আছে পথের দু'ধারে, সমস্ত হিমালয়ের অঙ্গন জুড়ে। প্রবেশদ্বার হরিদ্বার। ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাবভূমি। হিন্দু তীর্থক্ষেত্র। এরপর হৃষিকেশ। হিন্দুমন্দির, আশ্রম এবং ধর্মশালার শহর এই হৃষিকেশ। হিমালয় থেকে গঙ্গা সমতলে নেমেছে হৃষিকেশ এবং হরিদ্বার হয়ে।

হৃষিকেশ থেকে গঙ্গোত্রী। দূরত্ব ২৬০ কিলোমিটার। মাঝে পাহাড়ি উপনগরী, জেলাসদর উত্তরকাশী। দুই পাহাড়ি নদীর একটুকরো পাহাড়ি উপত্যকাকে ঘিরে পরিচ্ছন্ন ছোট একটি লোকালয়, উত্তরকাশী। মনে হয় প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া কোন উদ্যান। বাজার দোকানপাট, হোটেল, বাস আড্ডা সহ আধুনিক শহরের সমস্ত কিছুই রয়েছে; তবু এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা সর্বদা বিরাজ করছে এই পাহাড়ি লোকালয়টিতে। এখানকার উচ্চতা ৩৮০০ ফুট। উত্তরকাশীতে দেখা কলকাতা থেকে আগত একটি

হি মা ল য়ে র হা ত ছা নি
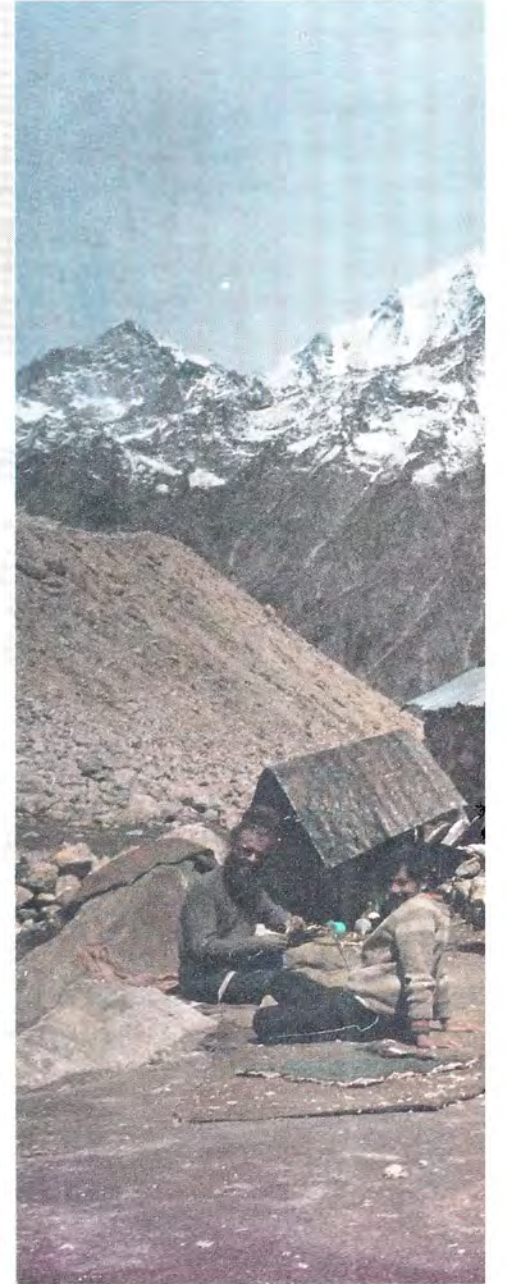
অভিযাত্রী দলের সাথে। ছেলেমেয়ে নিয়ে যৌথ অভিযাত্রী দলটি যাচ্ছেন জানোলি শিখর জয়ের উদ্দেশ্যে। ওদের কয়েকজনের সাথে পরিচয় কলকাতাতেই হয়েছিল। অবাক লাগল একটি সংবাদে। উত্তরকাশীতে দলের সহনেত্রী (সদস্যা) জানালেন উনি বিয়ে করছেন একটি ছেলেকে। দলেরই সদস্য, ছিপছিপে, উচ্চতায় মেয়েটিরই সমান হবে। অভিযানে আমার কৌতূহলের উত্তর দিল মেয়েটিই। কলকাতায় আরেকটি মেয়ে ওকে ভালবাসে। সে সুযোগ আর ওকে দেবেন না। ফেরার সময়ে হরিদ্বারে সহনেত্রী সেরে নেবেন বিয়ের ঝামেলাটা।

উত্তরকাশী থেকে পাকা রাস্তা পাহাড়ের ঢাল দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে গঙ্গোত্রীর দিকে। গাংনানী, সুখী, হরসিল, লঙ্কা, ভৈরবঘাটি হয়ে গঙ্গোত্রী। গঙ্গোত্রীর উচ্চতা ১০,৩০০ ফুট।

গঙ্গোত্রীতে ভগীরথ মহাদেবের আরাধনা করেছিলেন। কথিত আছে, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পর যুদ্ধে নিহত আত্মীয় পরিজনদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পাণ্ডবেরা এখানে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। গঙ্গোত্রীতে প্রবহমান গঙ্গার পাড়ে গঙ্গোত্রী মন্দির। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অমর সিং থাপা এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। পূজা হয় মাতা গঙ্গার। মন্দিরে এক স্বর্গীয় পবিত্রতা সর্বদা বিরাজ করে।
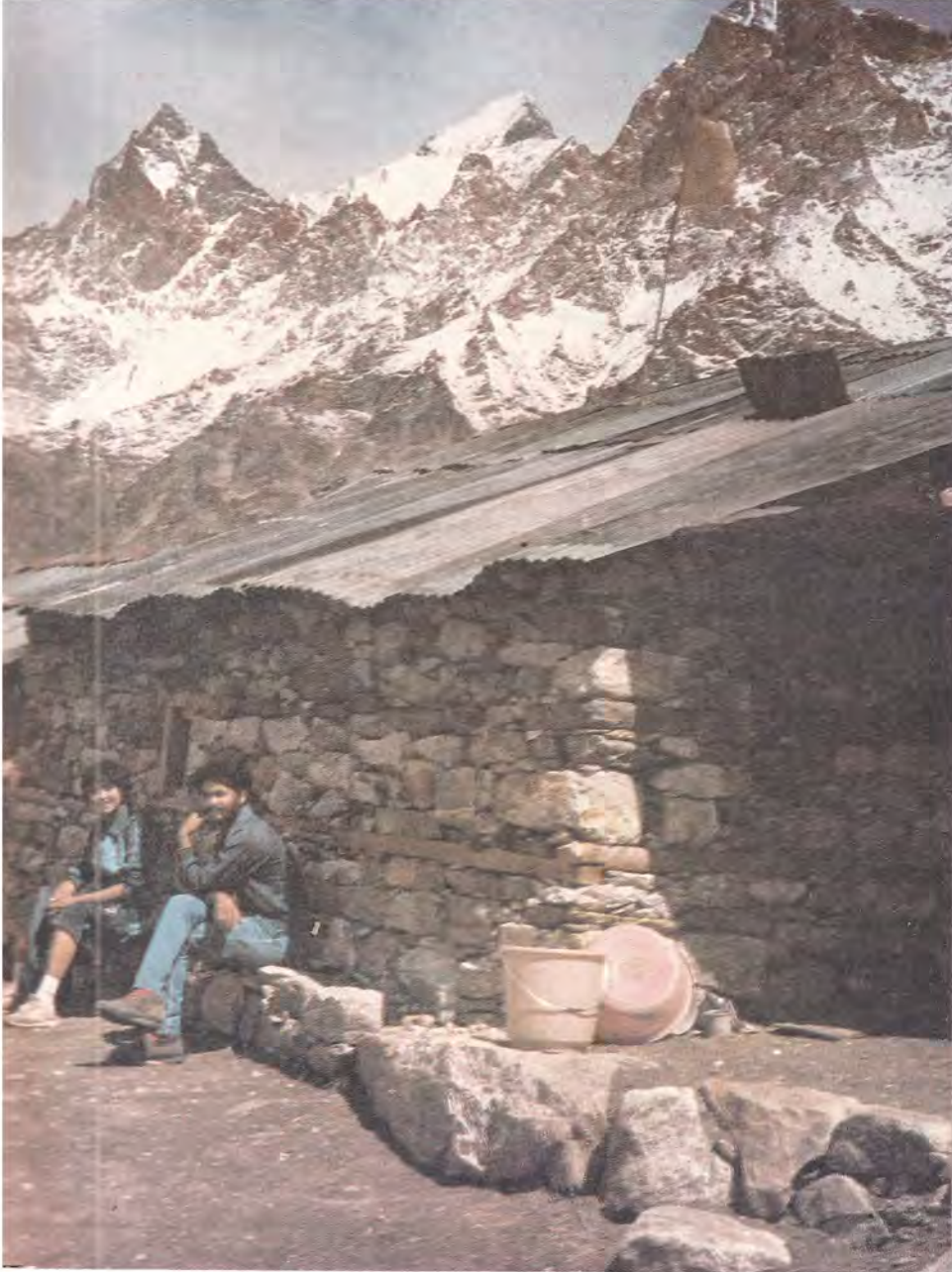
তপবনে সিমলাবাবার আশ্রম

গঙ্গোত্রীতে পরিচয় হল নিউজিল্যাণ্ড থেকে আগত একটি পরিবারের সাথে। মিস্টার এবং মিসেস। সাহেবের ডান হাঁটুর নিচে থেকে পা কাটা। কৃত্রিম পা লাগিয়ে চলছেন আর দশজনের মত। এসেছেন এখানে সাত সমুদ্দুর পাড়ি দিয়ে। হিমালয়ের সৌন্দর্য পানের আশায়। ওঁরাও যাচ্ছেন সেই পরম বিস্ময় হিমালয় অঙ্গন গোমুখে।

গঙ্গোত্রী থেকে ১৯ কি·মি· দূরত্বে গোমুখ। পায়ে হেঁটে যেতে হবে সারাটা রাস্তা। পাহাড়ের গা বেয়ে সরু পথ। মাঝে মাঝে বেশ চড়াই এবং দুর্গম। হিমালয়ের নৈসর্গিক অপরূপ সৌন্দর্য পথশ্রমের ক্লান্তিকে সহজেই ভুলিয়ে দেয়। ভাগীরথী বয়ে চলেছে প্রায় পাশাপাশি।

গঙ্গোত্রী থেকে ১০ কিমি· দূরে চিরবাসা। চিরবাসায় চির বা পাইন গাছের সমারোহ। সেখানে মিশে আছে ভূজবৃক্ষ। ভাগীরথীর পাড়ে ছোট অববাহিকা জুড়ে এই চিরবাসা, চমৎকার জায়গা। এরপর ৫ কিমি· এগিয়ে ভূজবাসা। ভূজবাসায় রয়েছে লালবাবার আশ্রম। হিমালয়প্রেমীদের জন্যে রাতে থাকবার এবং খাবার ব্যবস্থা আছে এই আশ্রমে।

ভূজবাসা থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে গোমুখ। সারাটা পথ চড়াই এবং দুর্গম। মাঝে মাঝে বেশ বিপজ্জনক। ছোট বড় পাথর পড়তে থাকে উপর থেকে, হঠাৎ হঠাৎ। এ পথে যেতে হলে সঙ্গে গাইড নেওয়া উচিত।

গোমুখ। গ্লেশিয়ার পয়েন্ট। সামনে দাঁড়িয়ে পরপর কয়েকটি বিশাল আয়তনের বরফের দেওয়াল। পেছনে ভাগীরথী পর্বতশৃঙ্গরাজি। বরফের হিমবাহ শুরু হয়েছে এখানে। প্রচণ্ড স্রোতে বয়ে চলেছে গঙ্গা। অদূরে বরফের দেওয়ালের নিচে এক কোণে কাল গুহা। ওই গুহা থেকে গঙ্গার জন্ম।

গোমুখ থেকে ৪ কিমি উপরে গঙ্গোত্রী হিমবাহের উপর তপোবন। তুষার আর বরফে মোড়া হিম উদ্যানে রংবেরংয়ের পাথর আর কিছু নাম না জানা পাহাড়ি ফুলের সমারোহ। এখানে রয়েছে সিমলাবাবার আশ্রম।

গোমুখের উচ্চতা ১৪০০০ ফুট। আসেন হিমালয় প্রেমী থেকে সাধুসন্ন্যাসী। কেউ আসেন দর্শনে, কেউ বা তপস্যায়, কেউ বা অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়। চারদিক জুড়ে বিরাজমান শুভ্র তুষারশৃঙ্গরাজি।

হিমালয়ের অলৌকিকতার সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আস্তে আস্তে নিজেকে বুঝি সমর্পণ করলাম ওই পবিত্র পুণ্যসলিলার উদ্দেশ্যে।

– রসিক পাল।

ছবি : অরিন্দম দেবনাথ

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার

ডাম্পিং গ্রাউণ্ড

প্রাক্তন কেন্দ্রিয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার আগামী ক' মাসের মধ্যেই ভারতকে ঋণভারে জর্জরিত করে ফেলবে। কারণ, তাঁর মতে, বর্তমান প্রধান মন্ত্রী ভি.পি.সিং নির্বাচনে জেতার জন্য মধ্যবিত্ত ও বিত্তবান শ্রেণীর লোকেদের গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এদের খুশি করতে গেলে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে ব্যাপক হারে ঋণ নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই অবস্থায় উন্নত দেশগুলি তাদের বাতিল মালপত্র এদেশে বেচতে চাইবে। ফলে ভারতবর্ষ হবে সব থেকে বড় ডাম্পিং গ্রাউন্ড। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার টাকা দিলে লেজের ঝাপটা দেবেই। প্রকারান্তরে ভারতবর্ষ ঝিমিয়ে যাবে। প্রণব মুখার্জির এই অভিমত বেশ তাৎপর্যপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই, কারণ তিনি শুধু ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীই নন, বর্তমানে ভারতীয় কংগ্রেসের অর্থনৈতিক সেলের চেয়ারম্যানও।

স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া

বই–ব্যাংকিং

বইমেলার ১০৬ নং স্টলে এবারে প্রকাশিত হল স্নিগ্ধা পালের নৃত্ত–নৃত্য–নাট্য' বইটি। বের করেছেন স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া। ভারতীয় নৃত্য বিষয়ে অতি সরল সাবলীল অথচ সুন্দর ভাষায় এই বইটির নির্মাণকার্যে শ্রীমতী পালকে যা একান্তভাবে সাহায্য করেছে তা হল লেখিকার দীর্ঘ নৃত্যানুশীলনের ও নৃত্যচর্চার অভিজ্ঞতা। লেখিকা মণিপুরী নৃত্যের অনুশীলন করেছেন গুরু কলাবন্ত সিংহের কাছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার লেখিকাকে হায়দ্রাবাদে পাঠান যন্ত্র-সঙ্গীত নাটক একাডেমির অধীনে নৃত্য-পরিচালিকা হিসেবে কাজ করার জন্য। হায়দ্রাবাদে রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর মূল অনুষ্ঠানে ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এবং ডঃ গোপাল রেড্ডির উপস্থিতিতে স্নিগ্ধার পরিচালনায় তিনটি রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হয়। '৬২ সালে গুরু মারুআপ্পম পিল্লাইয়ের কাছে ভরতনাট্যম শিক্ষা শুরু করেন এবং সি এল টি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে নৃত্যশিক্ষা দিতে শুরু করেন। লেখিকা মেদিনীপুর এবং খড়গপুরে দু'টি নৃত্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন এবং গত পঁচিশ বছর ধরে এদেরকে একনিষ্ঠ নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দিয়ে তিল তিল করে বড় করে তুলছেন। 'রবিসপ্তক' নৃত্য-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানটি আজ মেদিনীপুরের গর্ব। দীর্ঘ নৃত্যানুশীলনের অভিজ্ঞতায় 'নৃত্ত–নৃত্য–নাট্য' বইটিকে শ্রীমতী স্নিগ্ধা সারবান করে তুলেছেন। পঞ্চাশটাকা মূল্যের এই বইটি নৃত্য–গবেষক, নৃত্য শিক্ষার্থী এবং আগ্রহী সকলের কাছেই সমাদৃত হবে, আর এই বইটির প্রকাশের জন্য স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়াও অবশ্যই প্রশংসার্হ।

কোল ইণ্ডিয়া

ডকটরেট কেনা ?

কোল ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান এম.পি. নারায়ণন কোল ইণ্ডিয়ার পক্ষ থেকে কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে ২৫ হাজার টাকার একটি চেক দিয়েছেন, এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। এরপরই তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডক্টরেট–ডিগ্রি পাওয়ায় অনেকে দুই ঘটনার মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন। এই ঘটনায় যাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করছেন, তাঁদের বক্তব্য শ্রীনারায়ণনের বিরুদ্ধে বেশ কিছু দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। দুটি কেসে সি বি আই তদন্ত হচ্ছে। এর একটি টিকমান মামলা কেলেঙ্কারী। তিনি বিহারের এক মন্ত্রীকে দামী কয়লা দিয়েছিলেন। এজন্য সংসদে প্রশ্ন ওঠে। কেন্দ্রিয় শক্তিমন্ত্রী আরিফ মহম্মদ খানের কানেও একথা উঠেছে। শোনা যাচ্ছে, শ্রী নারায়ণনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি ব্যবস্থা নেবেন। এই অবস্থায় সব ধামাচাপা দেবার জন্য নিজেকে প্রতিভাবান এগ্‌জিকিউটিভ হিসাবে প্রমাণ করার জন্যই কি তাঁর ডিগ্রির দরকার হয়েছে ?

দার্জিলিং হিল কাউন্সিল

আলটিমেটাম

জি এন.এল.এফের সভাপতি সুবাস ঘিসিং সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, দার্জিলিং চুক্তি সম্পাদনের সময় কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এবং রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার দু'পক্ষই পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা দেবে বলে কথা দিয়েছিল। এখন সে কথার অনেকটাই রাখা হচ্ছে না। তিনি বলেছেন, যদি এ ব্যাপারে বাধা আসে তবে আমাদেরই রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে। শ্রী ঘিসিং সাফ বলে দিয়েছেন, আগামী বাজেট অধিবেশনের মধ্যে কেন্দ্রের নতুন সরকার যদি দার্জিলিঙের উন্নয়নের জন্য পাওনা টাকা না দেয় তবে আমিও ছেড়ে কথা বলব না। টাকা তাদের দিতেই হবে। এই টাকা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। আমি আমাদের প্রাপ্য টাকার হিসাব বুঝে নেবই। আমার নাম সুবাস ঘিসিং। আমি জানি কিভাবে কোথায় কখন কার ওপর চাপ দিয়ে টাকা আদায় করতে হয়।

জেমিনি সার্কাস

লম্বা–বেঁটে

গত দু'যুগ ধরে শীতের মরশুমে কলকাতায় প্রখ্যাত জেমিনি সার্কাসের আসর বসেনি, এমন ঘটনা ঘটেনি। প্রতি বছর নতুন রোমহর্ষক খেলার আমদানি তার সঙ্গে হরেক রকম জন্তু জানোয়ারের সমারোহ এই প্রতিষ্ঠানকে সারা দেশে জনপ্রিয় করে তুলেছে। তবে এবছর জেমিনি সার্কাসের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হল ২১ বছর বয়সী ১৮ ইঞ্চি উচ্চতার বামন জোকার শিবরাম চিদানন্দ। বর্তমানে সে-ই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম জোকার। ফলে তার খাতির বামনাবতারের মত। তার বাড়ি কর্ণাটকের দিজাপুরে। বছর কয়েক আগে সে শোলাপুরে ভাম্বো সার্কাস দেখে উজ্জীবিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়। তারপর চলে আসে জেমিনিতে। তার ভাই ভীমা এবং বোন শান্তা ও মাধবী স্কুলে পড়লেও সে স্কুলের মুখ দেখেনি। মিষ্টভাষী সদা হাসিখুশি চিদানন্দ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাক্টিশ করে। সে নিজে বেঁটে হলে কি হবে, তার পছন্দের তালিকায় প্রথমেই আছেন দীর্ঘদেহী সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন। সে বলে অমিতাভ সব সময় তাকে আনন্দে রাখে। সুযোগ পেলেই সে ভি.ডি.ও.তে অমিতাভ'র ছবি দেখতে বসে যায়। 'জাদুগর' ও 'তুফানে' অমিতাভ নাকি তারই মত তামাশা দেখিয়েছিল।

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রী থেকেই শিক্ষিকা

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি স্নাতকোত্তর বিভাগের ফাইন্যাল ইয়ারের ছোট খাট চেহারার ছাত্রীটিকে দেখে স্বপ্নেও কল্পনা করা যাবে না যে সে এখনই স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। তার নাম ইন্দু খুরানা। শুধু স্বাবলম্বী নয়, অসম্ভব মেধার অধিকারিনী ইন্দু নিজে একটি কোর্স চালান। স্কুলের নাম প্রফেশনাল এফেকটিভনেস এন্ড ডিটারমিনেশন। ১৩৯/বি রাসবিহারী অ্যাভেন্যুতে ছাত্রী থেকেই শিক্ষিতা হয়ে ওঠা ইন্দুর সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় একইসঙ্গে চলে স্পোকেন ইংলিশ এবং পার্সোন্যালিটি কোর্স। কর্মক্ষেত্রে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যাঁরা শুধুমাত্র ইংরাজি বলার অসহায়তার কারণে তুমুল অসুবিধার মুখোমুখি হন তাঁদেরকে প্রত্যয়ী করে তোলাই ইন্দুর এই ইনস্টিটিউশন চালাবার উদ্দেশ্য। স্পোকেন ইংলিশের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করারও কোর্স চালাচ্ছেন তিনি। মাত্র দুবছরের মধ্যে ইন্দু খুরানার ছাত্রছাত্রী সংখ্যাই শুধু বাড়েনি, অনেকেই কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পেয়েছেন। বাঁধা স্কুল-শিক্ষকের চাকুরি, বিমান সেবিকার চাকুরি, ফিলিপস্-এর সেলসগার্লের চাকুরি ছেড়ে ইন্দু বেছে নিয়েছেন স্বাধীন শিক্ষকতার পেশা। লক্ষ্য, কর্মনিষ্ঠা, আর পরিশ্রম দিয়ে এই স্কুলের মাধ্যমেই মানুষকে মানুষ করে তোলা। ইংরেজি না জানার জন্য জীবনের প্রথম দিকে ইন্দুকে যেভাবে অপমানিত হতে হয়েছিল সেই অপমানকে অনুপ্রেরণা করে ইন্দু এ বয়সেই এতখানি এগোতে পেরেছেন, সবেগে এগিয়ে চলেছেন।

এস.পি.জি.

কি বিচিত্র এই দেশ !

প্রধানমন্ত্রী ভি.পি. সিং যখন তাঁর পূর্বসূরী রাজীব গান্ধীর নিরাপত্তার জন্য বিশেষ রক্ষী বাহিনীর (স্পেশাল প্রটেকশন গ্রুপ) দরকার নেই বলে তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, তখন কলকাতায় মে ফেয়ার রোডে অবস্থানরতা এবং লা রোডের ইন্টার ন্যাশানাল স্কুলে পাঠরতা ভি.পি.র দুই নাতনীর নিরাপত্তার কাজে কেন এস.পি.জি.কে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা বিস্ময়ের ব্যাপার। সম্প্রতি কলকাতায় এস.পি.জির কয়েকজন অফিসার এসেছিলেন। তাঁরা কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশের বিশেষ সেলের সঙ্গে এক বৈঠক করে, প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর নাতনীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে একটি ব্লু-প্রিন্ট দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, এস.পি.জি. সরাসরি – প্রধানমন্ত্রীর নাতনীদের নিরাপত্তার দায়িত্বে না থাকলেও কলকাতা পুলিশের কমান্ডো বাহিনীর মাধ্যমে তাঁরাই পরোক্ষভাবে একাজ করবেন। বর্তমানে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর বেয়াই প্রতাপ সিং এর (অজয় সিং এর শ্বশুর) কাছে থেকেই তাঁর নাতনীরা পড়াশুনো করে।

কলকাতা পুরসভা

হেরফের

কলকাতা পুরসভার কয়েকজন কংগ্রেস (ই) কাউন্সিলার অভিযোগ করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বোন এবং সি. পি. আই. এম সাংসদ অমল দত্তের মা শুভ্রদেবী তাঁর হিন্দুস্থান পার্কের বাড়ি ভাড়া বাবদ দু' জায়গায় দু'রকম হিসাব দেখিয়েছেন। এই বাড়িতে কেন্দ্রিয় রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার এক বড় কর্তা থাকেন। ভাড়া দেন ১৮০০ টাকা। অথচ কলকাতা পুরসভাকে শুভ্রা দেবীর তরফে জানানো হয়েছে তাঁর ভাড়াটে ভাড়া দেন ৮০০ টাকা। এভাবে বছরের পর বছর কলকাতা পুরসভাকে হাজার হাজার টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মেয়র কমল বসুর কাছে অভিযোগ গেলেও পাছে তিনি মুখ্য মন্ত্রীর অপ্রিয় হন, তাই উদাসীন হয়ে রয়েছেন বলে, অভিযোগ। এছাড়াও অমল দত্তের একটি এস্টেট ব্যবসার সঙ্গে যোগাযোগ আছে জেনেও তিনি নাকি উচ্চবাচ্য করছেন না।

বিশ্ব ব্যাঙ্ক

চিকিৎসার টাকা যাত্রায়

বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকা খরচ করে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার যাত্রা দেখানর অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, আই. পি.পি. ফোরের (ইতিহাস পপুলেশন প্রজেক্ট ফোর) আওতায়। অনুন্নত এবং পিছিয়ে পড়া অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত চার জেলায়. যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে প্রাইমারি হেলথ সেন্টার সম্প্রসারণ সহ আধুনিক ও নতুন কিছু হেলথ সেন্টার তৈরি করাই হচ্ছে এই বিভাগের কাজ। এজন্য স্বাস্থ্য দপ্তর একজন স্পেশাল সেক্রেটারিও নিযুক্ত করেছেন। ১৯৯২ সালের মধ্যে কাজ শেষ হবার কথা, এজন্য বাজেট বরাদ্দ হয়েছে। কাজের তদারকি করতে প্রায়শই বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা কলকাতায় আসছেন। ইতিমধ্যে শুধু প্রচার খাতেই ১ কোটি টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। যাত্রা বাবদ বাঁকুড়া থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার একটি বিল পাঠান হয়েছে এবং তা পাশও হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক অফিসার মন্তব্য করেছেন, যাত্রার বিল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা, অদ্ভুত ব্যাপার ! স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূর এ ব্যাপারে কি উদাসীন রয়েছেন ?

চন্দন নিয়োগী ও গুরুপ্রসাদ মহান্তি

সন্ধে হতে একটু বাকি। পৌষের সূর্য গোলাকার কমলালেবুর মত একটু একটু করে সোনারঙ বালু প্রান্তরের একেবারে শেষ নিশানায় ডুবে যাচ্ছে। পশ্চিম দিগন্তে সোজাসুজি হেঁটে গেলে বুঝিবা তাকে ছোঁয়া যায়। আর বালুচর যেখানে নীলাকাশের সাথে মিশে একাকার তার ওপারে বুঝি রাজপুতানায় হারিয়ে যাওয়া সব রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের স্বপ্ন সংসার– কারুকার্যময় অলিন্দের সারি, ঝলমলে প্রাসাদ, অলংকৃত খিলান শ্রেণী, সোনারঙ পাথরের হাভেলি, সুউচ্চ কেল্লা আর অপরূপ রমণীরা।

জিপটা খানিক দূরে দাঁড় করিয়ে আমরা দুজন চুপচাপ বসে পৃথিবীর রঙ বদল দেখছিলাম। গুলাবী মুখ নিচু করে বসেছিল। ওর কাল ঘাগরার মত সন্ধ্যার অন্ধকার যে কোন মুহূর্তে নিস্তব্ধ চরাচরকে গ্রাস করতে উদ্যত। অবশ্য পৃথিবী তখনও লাল ছায়ায় মাখামাখি।

গুলাবীর মেকাপহীন শ্যামবর্ণ মুখের সূক্ষ্ম রেখাগুলি অস্পষ্ট আলোয় অদ্ভুত রহস্যময় লাগছিল। জিপে সারাটা রাস্তা ও অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল। আজ সন্ধ্যায় জয়সালমীর থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে মরুগ্রাম খুড়িতে ওর নাচের প্রোগ্রাম।

পাঁচদিন ব্যাপী মরু উৎসব উপলক্ষে অসংখ্য পর্যটক জয়সালমীর ও আশেপাশের গ্রামগুলিকে ছেয়ে ফেলেছে। নির্জন মরুশহরের রাতের আকাশ আতসবাজি ও বিজলি বাতির আলোয় অসম্ভব উজ্জ্বল। মরু উৎসবের এক প্রযোজক দুপুরের আগে গুলাবীকে নিয়ে আমার ট্যুরিস্ট বাংলোয় এসে উপস্থিত। আলাপ করিয়ে দিয়ে প্রযোজক ভদ্রলোক বললেন, 'গুলাবীকে যদি আপনি আপনার গাড়িতে দুপুরে খুড়িগ্রামে পৌঁছে দেন তাহলে খুব উপকৃত হব। ওর নাচগানের সঙ্গী-সাথীরা সকালে রওনা দিয়েছে। কিন্তু গুলাবী একটু বিশ্রাম নিয়ে দুপুর নাগাদ যেতে চায়। ট্যুরিজমের তিনটে গাড়ি যাচ্ছে। বাকি দুটো একদম ভর্তি। আপনারটাই বরং খালি।' একটু ইতস্তত করে রাজী হয়ে গেলাম।

গুলাবী রাজস্থানের পুরাতন যাযাবর রাখালি সম্প্রদায়ের শেষ বংশধর। ওরা মরুরাজ্যের বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়াত। যেখানেই যেত বিশাল তাঁবু পড়ত। দলের মরদরা কানোরা গীত গাইত, খরতালে ঢোলক বাজাত ও মেয়েরা সাপের নাচ নাচত। তারপর একদিন উটের পিঠে চড়ে হঠাৎই উধাও হয়ে যেত যাযাবর দল। মরুভূমির বুক বেয়ে সারিবদ্ধ উট দিনের পর দিন শ্লথ গতিতে এক

জয়সলমীরের মরুভূমিতে রাজস্থানী লোকনৃত্য

এক অন্য নিসর্গে

শহরের নৈমিত্তিক যান্ত্রিকতার বাইরে রাজস্থানের এক মরুশহরে কেমন করে লেখকের কেটে গেল গুটিকয় উৎসব মুখরিত দিন, ছন্দময়ী গুলাবী কেমন করে বেদনাময় করল তাঁকে এবং মার্কিন দুহিতা শিশিলির ভারত-দর্শন নিয়েই এই লিপিকথা।
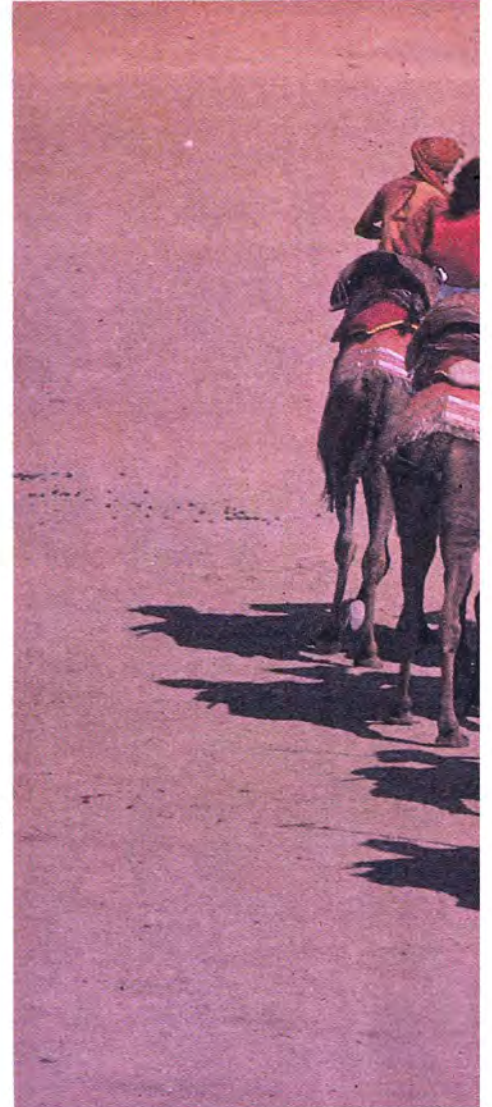
উটে চড়ে পোলো খেলা

অজানা গন্তব্যের সন্ধানে হেঁটে বেড়াত। পথে কোন গ্রাম পছন্দ হলে আবার তাঁবু পড়ত। কিন্তু আস্তে আস্তে দল ভাঙ্গতে শুরু করে। একসময় গুলাবীর দলে রয়ে যায় কেবল কয়েকজন বৃদ্ধ গায়ক। নওজওয়ানরা এখন মজুরির কাজ করে। মেয়েরা কবে দল ছেড়ে চলে গেছে তাদের মরদদের সাথে।

'তুম খুশ হো?' ইয়ে নাচা গানা ঔর বনজারা আয়শে জিন্দেগী?' ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে ওকে প্রশ্ন করি।

'হাঁ সাব।' ছোট্ট করে জবাব দেয় গুলাবী। তারপর হঠাৎ চুপ করে যায়। অলসভাবে বালু খুঁড়তে থাকে। ওর এক হাত কাচের চুড়ির মৃদু আওয়াজ নিস্তব্ধ মরু বুকে সন্ধ্যার ছোট ছোট আওয়াজের সাথে মিশে যায়।

'গুলাবী?'

'জি?'
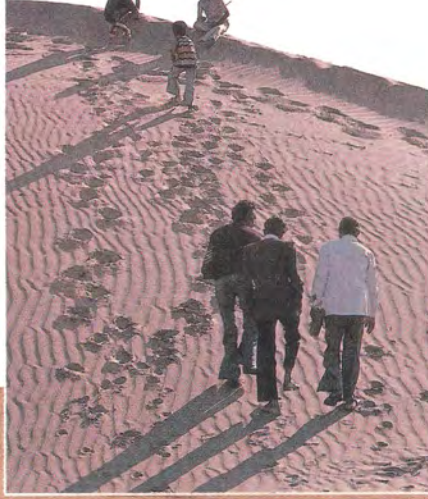
'আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না?'

অন্যমনস্ক হয়ে ও বলে, 'হমলোগ তো সাপেড়া থে। বেবজা ঘুমতে থে ইহা উহা। জিন্দেগী কা কোই খাশ মতলব নহি থা।'

'আর এখন?'

'জানি না। আপনারা আমার নাচ পছন্দ করেন। সরকারও করে। তাই বিভিন্ন জায়গা থেকে নিমন্ত্রণ আসে। নাচি। পয়সা পাই। ভাল লাগে।'

'গতবছর নিউইয়র্কে একটা প্রোগ্রাম করেছিলে, তাই না?'

'আপনি কি করে জানলেন?' অবাক চোখে ও প্রশ্ন করে।

'আমার এক প্রবাসী বাঙালী বন্ধুর কাছে তোমার ছবি দেখেছিলাম। ' রাজস্থানে এসেছিল।

বালিয়াড়ির নকশা

তোমার সাথে দেখা করারও খুব চেষ্টা করেছিল। তুমি বোধহয় তখন ছিলে না।'

গুলাবী কাঁধ ঝাঁকায়।

'আর কোন কোন দেশে নেচেছ?'

'কানাডা, ফ্রান্স, জাপান।' ভাঙা ভাঙা দেহাতী উচ্চারণে জবাব দেয় গুলাবী।

'আলোকজ্জ্বল মঞ্চে নাচতে কেমন লাগে?'

'মন্দ নয়। অসংখ্য বাবুরা অবাক চোখে আমার নাচ দেখে। অনেকে আমায় নানা উপহার দেয়। ডিনারে নিমন্ত্রণ করে। বিদেশে তো খুব মজা। ওরা তো কখনও এমনটি নাচ দেখেনি। একবার ফ্রান্সে একদল যুবক দূর থেকে আমায় চুম্বন করে।' গুলাবীর সারল্যে না হেসে পারলাম না।

'আগের সেই ঠিকানাহীন জীবনের থেকে এ অনেক ভাল, তাই না?'

'জানি না।' সামান্য ইতস্তত করে জবাব দেয় গুলাবী, 'বোধহয় না।'

'কেন?'

'সেই ঠিকানাহীন জীবনেও নিরাপত্তা ছিল। আমাদের দলের সেই বড় বড় তাঁবু, চৌদ্দটি উট, ওরা সব আমার আপনজনের মত ছিল…'

অতীতকে ছুঁতে চায় গুলাবী।

'কাউকে ভালবাসতে?'

মুখ নিচু করে মাথা নাড়ে গুলাবী।

'সে এখন কোথায়?'

'শহরে, শুনেছি দিল্লিতে ব্যবসা করে।'

'তার খোঁজ করোনি?'

'কি হবে? দল তো কবে ভেঙে গেছে। সেও সাদী করেছে হয়ত। আর আমি তো নাচিয়ে। দেখেননি কাল সন্ধ্যেবেলায় আমার নাচের সময় সবাই কেমন সিটি বাজাচ্ছিল। শহরের বাবুরা আমায় খারাপ মেয়ে মনে করে। দলে যখন নাচতাম, গাঁয়ের লোকে কিন্তু আমায় খুব ইজ্জৎ করত।' গুলাবী কথাগুলি বলেই মুখ ফিরিয়ে নিল। হঠাৎ মনে হল ওকে ওসব না জিজ্ঞেস করলেই ভাল হত। ওর কালো ওড়নার ঘোমটার ফাঁকে যে মুখ তা যেন আমার খুব পরিচিত। হয়ত সুদেষ্ণা কিংবা তৃণার…।

জয়সলমীর শহর থেকে পনেরো কিলোমিটার দূরে, সীমাহীন মরুভূমির এক পরিত্যক্ত কোণায় আমরা দুজন অপরিচিত নরনারী যাদের ভাষা, সামাজিক সম্বন্ধ ও আচার আচরণ একে অন্যের থেকে পৃথক,এক অদ্ভুত আবেগময় স্মৃতি বিনিময়ে বিভোর।

হঠাৎ বিক্ষিপ্তভাবে গুলাবী জিজ্ঞেস করে, 'মগর আপ মুঝে জয়সলমীর সে ইতনা দূর ইহা কিউ লে আয়ে?' আমি কি বলব ভেবে পেলাম না, খুব ইচ্ছা হল ওকে সত্যি কথা বলে দিই। 'গুলাবী তুমি আমায় মোহিত করেছ।' কিন্তু সংকোচে মুখ খুলতে পারলাম না। তৃণাকে হয়ত আমি জনসমক্ষে প্রেম নিবেদন করতে সংকোচ বোধ করতাম না। কিন্তু এইসুদূর রাজস্থানে, মরুভূমির অলস নিস্তব্ধতায় একটি যুবতী সাপুড়ে নর্তকী মেয়ের কাছে আমি বয়ঃসন্ধির কিশোরের মত গুটিয়ে গেলাম।

'তোমার সাথে একটু নিরিবিলিতে আলাপ করতে চেয়েছিলাম। জয়সলমীরে তোমার প্রোগ্রামের সময় তো সম্ভব নয়। একগাদা লোক সবসময় তোমায় ঘিরে থাকে। আর আমার ট্যুরিস্ট বাংলোর ঘরে তো তুমি আসতে চাওনি।'

গুলাবী আমার চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে বলল, 'তুমি কিন্তু খুব চালাক সাহেব।'

অকস্মাৎ ও আমার হাত টেনে ধরে বলল, 'এখন চল সাহেব। নয়ত পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে। প্রোগ্রামের জন্য সাজগোজও করতে হবে।' অদ্ভুত আকর্ষণ মেয়েটার চেহারায়। কালো পাথরে খোদাই করা চেহারায় যেন জলপ্রপাত নেমেছে। মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম লাস্যময় ছন্দে ও একপা দুপা করে বালি কেটে কেটে গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার এত ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী হতে পারে এখানে না এলে কোনদিন অনুভব করতে পারতাম না। নক্ষত্রখচিত এক বিশাল মানচিত্রের মত আকাশের মুখোমুখি বালির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে মনে হচ্ছিল আকাশ ও মৃদু বাতাসে দোদুল্যমান অন্ধকার ক্রমশ আমার উপর নেমে আসছে। ইচ্ছা হচ্ছিল বাকি রাতটা ওইভাবেই কাটিয়ে দিই। আড়চোখে দেখলাম গুলাবী ততক্ষণে জিপের কাছে পৌঁছে গেছে। অগত্যা উঠতে হল।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে গুলাবীকে বললাম, 'একটা গান শোনাও। তোমাদের দেশওয়ালি গান।'

'আপ তো শুনে হ্যায়।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন একটা গাও। ওই যে আরে-রে-রে…'

গুলাবী সামান্য দুলে দুলে গাইতে আরম্ভ করে। ওর দেশের একটা প্রচলিত গীত।

'আরে-রে-রে-রে-রা। আয়ে হিচিকি,

মেরে পারনেও চিতায়েরে আয়ে হিচকি…'

(আমার হঠাৎ হেঁচকি উঠেছে। পরদেশী প্রেমিক স্বামী আমায় স্মরণ করেছে)।

গাইতে গাইতে আলতো করে ও আমার কাঁধে মাথা রাখে।

নিস্তব্ধ অন্ধকারের বুক কেটে মরু এবড়োখেবড়ো পিচের রাস্তা ধরে জিপ গাড়ির তীব্র হেডলাইটের আলো গুলাবীর আদিম গানের তালে তালে নাচতে নাচতে একসময় খুড়িগ্রামের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছোয়। সে রাতে সারেঙ্গী, বাঁশি এবং গুলাবীর ঘুঙরুর উন্মত্ততা কয়েক হাজার দর্শককে

চাঁদনী রাতে ক্যাম্পফায়ার
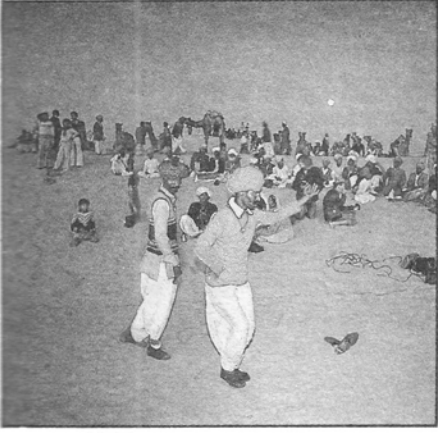
সাপুড়েদের নাচ

মন্ত্রমুগ্ধ করে। উল্লাসে ফেটে পড়ে বিদেশী পর্যটকের দল।

মরু উৎসব উপলক্ষে জয়সলমীর ও তার আশেপাশের গ্রামগুলি তাদের বর্ষব্যাপী নিদ্রা থেকে হঠাৎ যেন কয়েকদিনের জন্য জেগে ওঠে। বিদেশী পর্যটকদের ভীড়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের বেশ কিছু উপরি রোজগাও হয়। মরু উৎসবের অপেক্ষায় পশ্চিম রাজস্থানের এই শহরটি সারাবছর উন্মুখ হয়ে থাকে। দারিদ্র্য ও জলকষ্টে পীড়িত বাসিন্দাদের একমাত্র আকর্ষণ এই উৎসব। বহু শিল্পী আশেপাশের গ্রাম থেকে ভিড় করে জয়সলমীরে। রাজস্থান ট্যুরিজম গান বাজনার জন্য তাদের মোটা পারিশ্রমিকও দিয়ে থাকে। সমস্ত উৎসবটির ব্যবস্থাপক, ট্যুরিস্ট অফিসার তৃপ্তি সিংহ বললেন, 'বহুবছর আগে আমি একবার অস্ট্রিয়া গেছিলাম। সেখানে সেলিমবার্গ উৎসব দেখে আমি খুব প্রভাবিত হই। ফিরে এসে রাজস্থান সরকারকে অনুরোধ করি যে দেশের অবহেলিত এই অঞ্চলটিতেও একটি উৎসবের আয়োজন করা উচিত। যদিও এই উৎসবটি প্রচলিত নয় তবুও আমরা চেষ্টা করেছি যতদূর সম্ভব স্থানীয় শিল্পীদের উৎসাহ দেওয়া। এবং স্থানীয় জীবনের সংস্কৃতি তুলে ধরতে, যাতে পর্যটকেরা থর মরুভূমির সমগ্র সংগীতের হেরিটেজটিকে পাঁচ দিনের উৎসবের মধ্য দিয়ে অনুভব করতে পারে।' তৃপ্তি সিংহ অবশ্য স্বীকার করলেন যে উৎসবটি পর্যটকধর্মী। উৎসবটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল দেশ বিদেশের পর্যটকদের কাছে জয়সলমীরকে আকর্ষণীয় করে তোলা। 'কোন নামী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার বদলে সেই সমান অর্থ যদি উৎসবটির শোভা বাড়াতে খরচ করা হয় তাহলে আমার মনে হয় তা বেশি ফলপ্রসূ হয়।' বললেন তৃপ্তি সিংহ।

জানুয়ারি মাসের নরম রৌদ্রে গা ভাসিয়ে কয়েক হাজার লোক অলসভাবে অপেক্ষা করছিল পুনম স্টেডিয়ামে। সকাল সাড়ে নটায় উৎসব শুরু হওয়ার কথা। ঘড়িতে দশটা বাজতে চলেছে। সবাই উন্মুখ হয়ে বসে ছিল। হঠাৎ কয়েক ডজন রাজস্থানী মেয়ে লাল নীল সবুজ পোশাক পরে নাচতে নাচতে নেমে আসে স্টেডিয়ামের মেঠো জমির মাঝে। যেন একরাশ আবিরের রঙে স্টেডিয়ামের নিষ্প্রভ সকাল হঠাৎই রঙিন হয়ে উঠছে। গানের তালে তালে নাচতে নাচতে ওরা সমস্ত স্টেডিয়ামটিকে ঝুমুরের আওয়াজে, দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্যে, ছন্দে সুরে ইতিহাসের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া কোন এক রাজার অভিনব রাজদরবারে পরিণত করে। তারপর দলবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেয়েরা একে একে নানারকম নাচ দেখায়। সমস্ত নাচেরই পিছনে আছে এক অদ্ভুত পটভূমি। উৎসবের এক সন্ধ্যায় দেখলাম কচ্চী ঘোড়ী নাচ। রাজস্থানে, বিয়ে সাদি উপলক্ষে বাভারা, কুমহারা, অরগরা জাতের লোকেরা পারস্পরিক ভাবে এই নাচ নেচে থাকে। এই নাচের মুখ্য আকর্ষণ হল বর ও বউ পক্ষের লোকেরা বিয়ের আসরে এক কল্পিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। রোমহর্ষক সেই লড়াই! ঘোড়ায় চড়ে, খোলা তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ। বীরের দেশ তো। লড়াই ওদের সংস্কৃতির অঙ্গ।

এমনই এক নাচের আসরে আলাপ হল মার্কিন তনয়া, সিসিলির সঙ্গে। স্টেজের উপর কয়েকটি ভাওআই উপজাতির মেয়ে মাথার উপর নটি পেতলের কলসি সাজয়ে অদ্ভুত কায়দায় কয়েকটি ধারালো খোলা তরোয়ালের উপর রাজস্থানী লোকগীতির তালে তালে নাচছিল।

হঠাৎ চাপাকণ্ঠে ইংরাজীতে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে সচকিত হয়ে ফিরে দেখি আমেরিকান যুবতীটি তার দায়গ্রহ ভারতীয় গাইডটিকে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে এই নাচটি খুব সাংঘাতিক।

পরদিন সকালে সিসিলির সঙ্গে আবার দেখা হল পাগড়ি বাঁধা প্রতিযোগিতার মাঠে। বিশাল সব পাগড়ি ও মিস্টার ডেসার্টের ভীষণ লম্বা ও মোটা গোঁফ দেখে তো হতবাক।

সিসিলি হাত পা, মাথা ঝাঁকিয়ে আমাকে বোঝাতে চাইল যে এদের নাম নিশ্চয় বিশ্বরেকর্ডের বইয়ে স্থান পাওয়া উচিৎ। সিসিলি এসব কিছুই কোনদিন দেখেনি। নিউইয়র্ক শহরের যান্ত্রিক রোমাঞ্চের বাইরে তার দেখা পৃথিবীটা খুব ছোট। সুইজারল্যাণ্ডের বরফ ঢাকা পর্বতমালায় সে স্কিইং করেছে বটে, অস্ট্রিয়ার ফেস্টিভ্যাল ও দেখেছে কিন্তু সুদূর এশিয়ার এক অজানা মরুঅঞ্চলের অদ্ভুত পোশাক পরিহিত মানুষদের নাচ, ভয়ঙ্কর সব খেলা, মনভোলানো সুরের গান তাকে বিহ্বল করেছে।

পাঁচদিনের উৎসবে (জানুয়ারি ৭ তারিখ থেকে ১১ তারিখ) কোথাও কিন্তু বাংলাদেশের মত মেলা বসেনি। ট্যুরিস্টরা অবশ্য সারা দিন শহরের বাজারে ঘুরে বেড়ায় দুর্লভ মূর্তি, নকশা করা কাপড়, রঙীন পাথর, চামড়ার জুতো এইসব কেনার উদ্দেশ্যে। বিদেশী পর্যটকেদের ভিড়ের চোটে জিনিসের দামও দ্বিগুণ। অবশ্য ভারতীয় পর্যটকেদের মধ্যে সবথেকে বেশি চোখে পড়ে বাঙালি ও গুজরাটী। একদিন স্টেডিয়ামে ভীড়ের মাঝে বাংলা শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। একজন ভদ্রলোক তার অত্যধিক কৌতূহলী শিশু পুত্রটিকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে উট দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ-কারী প্রাণীগুলি যেহেতু ঘোড়ার থেকে লম্বা ও উঁচু তাই ওদের উট বলা হয়।

উৎসবের দ্বিতীয় রাত্রে ট্যুরিস্ট বাংলোর চত্বরে, নীলিমা জোহারী, রাজস্থান ট্যুরিজিমের ডাই-রেকটর, উপস্থিত লেখক সাংবাদিক ও বিশিষ্ট বিদেশী অতিথিদের নৈশ ভোজনে নিমন্ত্রণ করেন। অবশ্য জয়সালমীরে থাকাকালীন প্রত্যেকদিনই স্থানীয় কর্তারা খাওয়া দাওয়ার ও ড্রিংকসের আসরে নিমন্ত্রণ করতেন। যেন বছরে একবার অতিথি আপ্যায়ণের এই সুযোগ তারা ছাড়তে চান না। আর ওখানে নৈশ ভোজনের বৈশিষ্ট হল খোলা আকাশের নিচে ক্যাম্পফায়ার জ্বালিয়ে খাওয়া-দাওয়া। বেশ লৌকিকতা বর্জিত আপ্যায়ণ। আর জানুয়ারির হাল্কা শীতে, ঠাণ্ডা বালিতে পা ডুবিয়ে, ক্যাম্পফায়ারের তাপ নিতে নিতে গল্পগুজব করতে মন্দ লাগে না। খাওয়া দাওয়ার সাথে নাচগানেরও আসর বসে। এমনি এক নাচগানের আসরে গুলাবীর সাথে আমার প্রথম দেখা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরু হয় মটকা বাদন দিয়ে। সাধারণ মাটির কলসিকে রাজস্থানী ভাষায় 'মটকা' বলা হয়। মরু প্রদেশে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের গ্রামগুলিতে মেঘাওয়াল গোষ্ঠির লোক বসবাস করে। ওরা মটকাকে বাদ্য হিসেবে প্রয়োগ করে। মটকার মুখে ফুঁ দিয়ে এক অদ্ভুত সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

সবার শেষে গুলাবীর নাচ। ও আসার সঙ্গে সঙ্গে ভিডিও ক্যামেরা আর চোখ ধাঁধানো আলোয় মুহূর্তে চত্বরটি উদ্ভাসিত হয়ে যায়। কাজুমিয়ারা আমার জাপানী সাংবাদিক বন্ধু কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল, 'ও কালো কাপড় পরে আছে কেন?' আমি হেসে উত্তর দিলাম, 'এদেশে সাপুড়ে মেয়েরা এরকমই পোশাক পরে।' পরে শুতে যাওয়ার আগে কাজুমিয়ারা আমার ঘরে এসে বলে গেল, ও গুলাবীর ছবি কালই বিশ্ব ফটোগ্রাফি কমপিটিশানে পাঠিয়ে দেবে। ছবি তুলতে পারিনি বলে মিয়ারার উপর খুব হিংসা হল।

নীলিমা জোহারী, সুন্দরী ডাকসাইটে ট্যুরিস্ট অফিসার। দিল্লিতে পড়াশুনা। তারপর রাজস্থান ক্যাডারে বহুদিন ধরে চাকরি করছেন। বিয়ে করেননি। জয়পুরে একাই থাকেন। অবশ্য বেশিরভাগ সময়ই তিনি রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। মরু অঞ্চলের মানুষের সুখ দুঃখ ও আনন্দ উৎসবের সাথে তিনি নিজেকে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে ফেলেছেন। খুব উৎসাহী অফিসার। উৎসবটি আয়োজন করার জন্য একমাস ধরে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু নীলিমা দুঃখ করে

বললেন, 'এতসত্বেও সরকারের পক্ষ থেকে খুব সামান্যই উৎসাহ দেখানো হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে বিদেশে এই উৎসবটির কোন প্রচারই নেই। দেশেও অল্প টাকা খরচ করা হয় পাবলিসিটির জন্য। উৎসবটি আন্তর্জাতক না হতে পারে কিন্তু স্থানীয় লোকদের উৎসাহ দেখুন। আসলে দেশের এই অঞ্চলটা বছরের বাকি সময়টা গরমে ও দারিদ্রে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। এদের জীবনে আনন্দ উৎসব বলে কিছুই নেই। সারাবছর এরা যেন এক অন্তহীন যুদ্ধের গ্লানি নিয়ে শুধুই বেঁচে আছে বেঁচে থাকার জন্যে।'

ভাবতে খুব অবাক লাগছিল যে সুদূর রাজস্থানের এই দুই অল্পবয়স্কা মহিলা ট্যুরিস্ট অফিসার, নীলিমা জোহারী ও তৃপ্তি সিংহ, কি সাবলীল ভাবে এইসব দেহাতী মানুষগুলির সাথে মিশে গিয়ে তাদের সুখ দুঃখের সাথী হয়ে গেছেন। ওরা দুজনেই দিল্লির আকর্ষণীয় জীবন ছেড়ে বহুবছর ধরে রাজস্থানে পড়ে আছেন। তৃপ্তি সিংহ এমনিতেই খুব সৌখিন মহিলা। নিখুঁত সাজগোজ। কিন্তু তিনি যখন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তখন যেন ওদেরই একজন হয়ে যান। এমনিভাবেই তিনি একদিন রাস্তার ধারে গুলাবীকে আবিষ্কার করেন। তখন ও রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়াত। ওর নাচ দেখে তৃপ্তি অবাক হয়ে যান। তারপর গুলাবীকে অনেক বুঝিয়ে উৎসবে নাচার জন্য জয়সলমীরে নিয়ে আসেন। 'ও কোনদিন নাচার তালিম পায়নি, একেবারে অবিমিশ্রিত শিল্পী। অথচ কি দারুণ কুশলী।' তৃপ্তি সিংহের গলায় গর্ব। 'গুলাবী এখন অবশ্য অনেক বদলে গেছে। স্বীকৃতি মানুষকে বদলে দেয়। এবং তা খুব স্বাভাবিক।'

প্রায় প্রত্যেকদিনই মরু উৎসবের অঙ্গ হিসেবে পর্যটকদের জয়সলমীরের মুখ্য আকর্ষণ সোনার কেল্লা ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয়। এই কয়েকদিন, দেশ বিদেশের পর্যটক সোনার কেল্লার আশেপাশে সকাল থেকেই ভীড় করে থাকত। ২৫০ ফিট উঁচু একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত কেল্লাটিকে রাত্রিবেলায় অসংখ্য বৈদ্যুতিক আলোয় সাজানো হয়েছিল। দূর থেকে কেল্লাটিকে দেখলে মনে হত এই বুঝি রাজা ভীম সিংহ কোন যুদ্ধে জিতে ফিরেছেন। এবং সেই উপলক্ষে আনন্দ উৎসবের আয়োজন হয়েছে। আর কেল্লাটিকে পশ্চাৎপটে রেখে পুনম স্টেডিয়ামে যে রাতে নাচ গানের আসর চলছিল, গ্যালারি থেকে বসে মনে হচ্ছিল আশেপাশের অধুনিক দর্শকদের বাদ দিয়ে বুঝিবা পাঁচশো বছর পেছনে অনায়াসে হেঁটে ফিরে যাওয়া যায়।

দেখতে দেখতে চারটে দিন কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারিনি। পঞ্চম দিনে সন্ধ্যায় শহর থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে মরুভূমির মধ্যখানে, স্যান্ড ডিউনে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়। মরুভূমির এই অঞ্চলটি ছোট ছোট বালির উঁচু নিচু পাহাড়ে ঘেরা। কোথাও সমতল জমি নেই। কেবল বালির পাহাড়। সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছে দেখি অসংখ্য উট, ট্যুরিস্ট বাস, জিপগাড়ি জায়গাটিকে ছেয়ে ফেলেছে। কিছু খাবার দাবারের দোকানও বসেছে। পর্যটকরা উটের পিঠে চড়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত। অদূরে একটি বালির পাহাড়ের উপর স্টেজ বানানো হয়েছে। অবশ্য স্টেজ বলতে একটা কাঠের তক্তপোশ মাত্র। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই জায়গাটা বিশালাকার বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বালির পাহাড় হাজার হাজার ওয়াটের আলোয় সোনার মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কয়েকহাজার মানুষের কল্লোলকে স্তব্ধ করে বেজে ওঠে রাজস্থানী সঙ্গীত। পি পি খানের সারেঙ্গী, সারখ খানের কানাইচা (ভায়োলিন), জুহর খানের ভাপসুখ—এবং আরো কত নাম না-জানা বাদ্যের মোহময় সঙ্গীতে মুখর হয়ে ওঠে অন্যদিনের নিঃসঙ্গ মরুপ্রান্তর। খোলা আকাশের নীচে বসে মনে হচ্ছিল হিমেল হাওয়ার ছোয়ায় নারহা বাঁশির মন ভোলানো সুরে বিশালাকার মরুভূমি রাজকন্যার মত জাদু কাঠির ছোঁয়ায় হাজার বছরের নিদ্রা ছেড়ে আস্তে আস্তে জেগে উঠছিল।

তারপর একসময় প্রদেশি গানের তালে তালে নাচতে নাচতে এক ঝাঁক রাজকন্যা নেমে আসে স্টেজের উপরে। চোখ ঝলসানো আতসবাজির আলোয় শান্ত মরুভূমির নিকষ কালো আকাশ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। প্রেম ও বিরহের এক অনন্য গীতিনাট্যের পাত্রপাত্রীরা মন্ত্রমুগ্ধ দর্শকদের কয়েক ঘন্টার জন্য কয়েকশো বছর পুরানো এক বিয়োগান্তক ইতিহাসের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়।

সেদিন রাত্রে ট্যুরিস্ট বাংলোয় ফিরে দেখি সিসিলি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার ঠিকানা কোথায় পেলে?'

ও একরাশ সোনালী চুল ঝাঁকিয়ে বলল, 'তুমি যে সাংবাদিক তা আগেই জানতাম। তাই ট্যুরিস্ট গাইডের কাছ থেকে খুঁজে বার করতে অসুবিধা হয়নি।'

'তুমি আজকে ডিউনসে যাওনি?'

'হ্যাঁ, দারুণ লেগেছে। অবশ্য নাটকের ভাষা বুঝতে পারিনি, তাই একটু অসুবিধা হচ্ছিল।'

'কবে ফিরছ?'

'জয়সলমীর ছেড়ে একটুও যেতে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু কালকেই সকালে দিল্লি রওনা দিতে হবে। তুমি?'

'আমিও কাল যাচ্ছি। আমার সাথে চলো। একসঙ্গে বেশ মজা করা যাবে।'

চকিতে সিসিলির গোলাপী ঠোঁটের কোণে দুষ্টু হাসি খেলে গেল।

'মরুভূমির মধ্যে আমরা যদি হারিয়ে যাই?'

'বেশ হবে। বাকি জীবনটা যাযাবর লোকেদের মত বালিয়াড়ির মধ্যেই কাটিয়ে দেব।'

'আমার কিন্তু আমেরিকায় ফিরে যেতে একটুও মন চাইছে না। তোমাদের দেশের প্রেমে পড়ে গেছি। কি সুন্দর এখানকার লোকেরা। কত বৈচিত্র!'

'আমায় বিয়ে করে থেকে যাও না।'

'ঠাট্টা করছ?'

গম্ভীর হয়ে বললাম, 'সিসিলি বাইরে থেকে সবকিছু নিখুঁত সুন্দর ও রোমাঞ্চকর মনে হয় কিন্তু গ্রীষ্মের তাপে ও জলকষ্টে যদি বন্দী অবস্থায় এই প্রদেশের কোন এক বিচ্ছিন্ন গ্রামে দিনের পর দিন থাকতে হয় তাহলে আমাদের বিলাসী রোমান্স কর্পূরের মত উড়ে যাবে।'

সিসিলি আমার আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আলতো করে আমার হাত ছুঁয়ে বলে, 'শুনেছি তোমার রাজ্যে কম্যুনিস্টদের শাসন। সব বাঙালিরাই কি সাম্যবাদী?'

হেসে বললাম, 'যেমন আমি শুনেছি সব আমেরিকানরাই নাকি জড়বাদী।'

সিসিলির সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা মারলাম। নিউইয়র্কে সিসিলি ও তার বয়ফ্রেণ্ড একটি ডেয়ারি ফার্ম চালায়। আর প্রত্যেক বছর ক্রিস্টমাসের সময় কয়েকদিন ছুটি নিয়ে ওরা দুজনে বেরিয়ে পড়ে পৃথিবীর দুদিকে। সিসিলি এবার এসেছিল এক মাসের জন্য এশিয়া ভ্রমণে। ওর ইচ্ছা ছিল একদিনের ট্যুরে মরুভূমি দেখে দিল্লি ফিরে যাবে। সেখান থেকে ফ্লাইটে বম্বে ও কলকাতা হয়ে সোজা ঢাকা। কিন্তু বেচারী রাজস্থানের মরু উৎসব দেখে এত অভিভূত হয়ে যায় যে একদিনের জায়গায় চারদিন রয়ে যায় জয়সালমীরে। কখনও বা জিপে করে বেরিয়ে পড়ত আশেপাশের গ্রাম দেখার উদ্দেশ্যে। অজস্র পাথর, পেন্টিং, ঐতিহাসিক বইপত্র কিনে সন্ধ্যে বেলায় ঘরে ফিরত। সে রাতে কাচ বসানো কালো ঘাগরা, মাথায় লাল চুনি ও গলায় পুঁথির মালা পরে ওকে চেনাই যাচ্ছিল না। দুধসাদা ফরসা রঙের সাথে কালো পোশাকে ভারি সুন্দর মানিয়েছিল। রাত্রে বিদায় নেবার আগে আমায় বলে গেল ওর বয়ফ্রেন্ডের সাথে পরের বছর ও আবার রাজস্থানে ফিরে আসবে। এবং গ্রীষ্মে।

সিসিলি বলল, 'দিল্লি থেকে তোমাকেও ধরে নিয়ে আসব।'

আমি ব্যঙ্গ করে বললাম, 'যদি আমায় মনে থাকে।'

ও হেসে বলল, 'তোমায় হয়ত ভুলে যাব। রাজস্থানকে নয়।'

মধ্যরাতের একটু পরে সোরগোলে ঘুম ভেঙে গেল। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, গুলাবী একগাদা লোকের সঙ্গে ট্যুরিস্ট বাংলোর পেছনে খোলা জায়গায় ক্যাম্প ফায়ার করে নাচছে। নিচে নেমে দেখি মাতাল অবস্থায় গুলাবীকে জড়িয়ে ধরে কয়েকজন শহুরে বাবু খুব নোংরা ভাবে হাত পা ছুঁড়ে নাচার চেষ্টা করছে। গুলাবী মদের নেশায় চুর। শহরের কয়েকজন সৌখিন মহিলাও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হঠাৎ গুলাবীর উপর খুব ঘৃণা হল। মরুভূমির মাঝে, সন্ধ্যেবেলায়, সেই যে নস্টালজিক মেয়েটাকে আবিষ্কার করেছিলাম এ যে কিছুতেই সে গুলাবী নয়!

রাজন গুহ

ছবি: এস· পাল

বিশ্বকাপ ফুটবল : আগামী দিনগুলোর মহাসংগ্রাম !

ইউরোপিয় আর লাতিন আমেরিকান ফুটবলশৈলীর মধ্যে বিশ্বকাপের ফাইনাল কি হবে ?

মারাদোনার আর্জেন্তিনা : বিশ্বকাপের অন্যতম দাবীদার।

আগামী জুন মাসে শুরু হতে চলেছে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াজগতের উত্তেজনাময় পর্ব বিশ্বকাপ ফুটবলের আন্তর্জাতিক লড়াই। রোম থেকে পাঠানো বিবরণ।

১৯৯০ এর জুনে সমস্ত রাস্তাই যাবে রোমের দিকে। ওই মাসের আট তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ ফুটবল ট্রফির খেলা। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ২৪টি জাতীয় দল যোগ দিচ্ছে, এই প্রেস্টি-জিয়াস টুর্নামেন্টে–চলবে তাদের সর্বোচ্চ সম্মানটি ছিনিয়ে নেবার লড়াই। প্রকৃতপক্ষে গোটা ইতালিতেই ফুটবলপ্রেমীদের ঢল নামবে–কেননা ইতালির সব-কটা নাম করা শহরেই টিমগুলো খেলছে। বিশেষজ্ঞ-দের ধারণা–'এবার 'ইতালিতে একটা ফুটবল

উৎসব হতে যাচ্ছে।' মাসভর চলা এই উৎসব ফুটবলপ্রেমীদের কাছে হয়ে উঠবে অভূতপূর্ব এক উপহারস্বরূপ।

যদিও এই ফুটবল নিয়ে আগ্রহ মাধ্যম এবং সাধারণ মানুষের একরকম নয়। যে ঢঙে বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি চলছে তাতে মনে হয় অবশ্যই কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। এই সময়টা গ্ল্যামারের আতিশয্যও খুবই জরুরী। রোমের স্পোর্টস প্যালেসে সম্প্রতি হয়ে যাওয়া বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সুন্দরী ও জনপ্রিয় অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেন একটা আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিলেন। ঘন্টাখানেকের এই উৎসব টি.ভি.র মাধ্যমে সরাসরি প্রচার করা হয়েছিলো প্রায় ৮০টি দেশে। ইতালিয়ান অপেরার বিখ্যাত তারকা লুসিয়ানো পাভারোত্তিও ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি ছিলো সেই শিহরণ জাগানো বিশ্বকাপগীতি, 'টু বি নাম্বার ওয়ান'—যা কম্পোজ করেছিলেন বিখ্যাত ইতালিয়ান মিউজিসিয়ান গিও—গিও মর্দের। অনুষ্ঠান সমাপ্তির আগে বিশাল স্পোর্টস প্যালেসের ইলেকট্রনিক্স বোর্ডে ভেসে উঠলো বিভিন্ন গ্রুপের টিমগুলোর নাম, কখন কোথায় ম্যাচগুলো হবে ইত্যাদি। পৃথিবী বিখ্যাত পাভারোত্তি পুক্কিনির অপেরা 'তুরানদত' থেকে পাভারোত্তি গাইলেন 'এ্যারিয়া নেসাম দোরামা।' আর্জেন্টাইন সকার ফেডারেশানের সভাপতি সমস্ত পরিবেশকে চমকে দিয়ে মঞ্চে নিয়ে এলেন ওয়ার্ল্ডকাপ ট্রপি এবং ফিফা কাপ।

১৯৮৬ তে মেক্সিকোয় জেতা ওয়ার্ল্ড কাপ ট্রফিটি এবারেও আগলে রাখার জন্যে লড়াই করবে আর্জেন্টিনা। বেশ কিছু ভয়ংকর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তাদের হতে হবে, সবচেয়ে বাধা আসবে 'নাছোড়বান্দা আফ্রিকান সিংহ' ক্যামেরুন টিমের কাছ থেকে। আর্জেন্টিনা টিমের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হবেন সেই খেলোয়াড়টি যিনি গত বিশ্বকাপে এই টিমকে শীর্ষস্থানে তুলে এনেছিলেন, তিনি হলেন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শোরগোল ফেলে দেওয়া ফুটবলার দিয়েগো মারাদোনা।

এই ২৪টি প্রতিযোগী টিমকে ছ'টা গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এক একটা গ্রুপে রয়েছে চারটি করে টিম। প্রত্যেক গ্রুপের টিমগুলি একে অপরের সঙ্গে রাউন্ড—রবিন ভিত্তিতে খেলবে। এই খেলায় জিতে দুটো টিম উঠে আসবে। এইভাবে ছ'টা গ্রুপ থেকে মোট ১২টি টিম খেতাব জেতার জন্যে প্রতিযোগিতা করবে। আয়োজক দেশ ইতালি, মাইকেলেঞ্জেলোর শহর ফ্লোরেন্সে জুনের ৮ তারিখে মুখোমুখি হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৪০ বছর বাদে এই টিম বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার ফাইনাল রাউন্ডে খেলবে)—এর সঙ্গে। ইতালির পরের খেলা চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে। এই খেলাটি হবে 'এ' গ্রুপের ম্যাচ হয়ে যাবার দু'দিন পর রোমে। তিনবার বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান হবার সুবাদে ব্রাজিল ইতালির সঙ্গে একই সারিতে থাকবে। ব্রাজিল প্রথম ম্যাচটি খেলবে সুইডেনের সঙ্গে গ্রুপ 'সি'—এর খেলায় তুরিনে। গ্রুপ 'ডি'—র খেলায় মিলানে পশ্চিম জার্মানি লড়বে যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে। গ্রুপ 'ই' তে পড়েছে বেলজিয়াম—ফুটবলে এশিয়ার দৈত্য দক্ষিণ কোরিয়া তার প্রতিদ্বন্দ্বী। গ্রুপ 'এফ'—এ বিতর্কিত সর্বোচ্চ স্বীকৃতি পেয়েছিলো ইংল্যান্ড।। ক্যালিগ্যারিতে কাপ ক্যাম্পেন ম্যাচে ইংল্যান্ডের সঙ্গে খেলা হবে আয়ারল্যান্ডের। ইল্যাংণ্ডের কাছে এই খেলাটি বেশ কঠিন হবে—সন্দেহ

সম্ভাবনাময় ডাচ টিমের, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সেন্টার ফরোয়ার্ড মার্কো ভ্যান রাস্তেন, কোচের সঙ্গে

নেই। সম্প্রতি ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ান নেদারল্যাণ্ড--এর সঙ্গে তার দ্বিতীয় ম্যাচটিও বেশ কঠিন হবে। ডাচ টিমের ক্যাপ্টেন হলেন বিখ্যাত ফুটবল তারকা রুড গুলিৎ, যিনি ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়ানশীপের খেলায় এসি মিলানোর হয়ে খেলেছেন এবং দুর্ধর্ষ মার্কো ভ্যান ব্যাস্তেনও অন্তর্ভুক্ত হবেন। ইংল্যাণ্ড নেদারল্যাণ্ড ম্যাচটিও ইতালির আয়োজকদের ও পুলিশকে বিপাকে ফেলবে—কারণ ব্রিটিশ সাপোর্টার-দের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের চিরাচরিত রেকর্ড আছে। সম্ভবত এইসব কারণে এই ঝন্ঝাটে ম্যাচগুলি সারদিনিয়ার নিরাপদ দ্বীপে খেলাবার আয়োজন করেছেন আয়োজকরা। প্রাথমিক পর্বে পশ্চিম জার্মানিকেও বেশ কঠিন সময়ের মুখোমুখি হতে হবে। তারা পড়েছে গ্রুপ 'ডি' তে যেখানে কলম্বিয়া

> নেদারল্যাণ্ড গতবারের ফাইনালে দুটো প্রভাবপূর্ণ খেলা দেখিয়েছিলো বটে কিন্তু ফিফা কাপ জিততে পারেনি। যদিও ইতালি ও ব্রাজিল দুদলই তিনবার করে বিশ্বকাপ জিতেছিলো, তবু বিশেষজ্ঞদের ধারণা ইতালিয়ানদেরই সম্ভাবনা উজ্জ্বল কেননা তারা নিজেদের মাঠেই খেলবে।

এবং সংযুক্ত আরব আমীর শাহী দল রয়েছে। ফুটবলপ্রেমীরা অত্যুতসাহে অপেক্ষা করছেন গ্রুপ 'বি'তে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং রোমানিয়া, গ্রুপ 'সি'তে কোস্টারিকা এবং স্কটল্যাণ্ড ও ঐ গ্রুপ 'সি' তেই উরুগুয়ে আর স্পেনের লড়াই দেখার জন্যে।

জনবন্দিত দুই ইউরোপিয়ান টিম ডেনমার্ক আর ফ্রান্সের ওপর যথেষ্ঠ সহানুভূতি রয়েছে ফুটবল জগতে। বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টের ফাইনাল রাউণ্ডে এরা যেতে পারেনি। ১৯৮৬-র মেক্সিকো বিশ্বকাপ টুর্নামেন্টে এই দুই টিম তাদের অনুরাগীদের যথেষ্ট ভাল খেলা দেখাতে পেরেছিলো। এ ছাড়াও অন্য যে সব ইউরোপিয়ান টিম চকিত করেছিলো তারা হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন, স্পেন, সুইডেন, রোমা-নিয়া এবং যুগোস্লাভিয়া। তাদের পারফরমেন্স প্রতিযোগিতার প্রাথমিক স্তরে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে-ছিলো। তারা সমস্ত জল্পনা–কল্পনাকে বানচাল
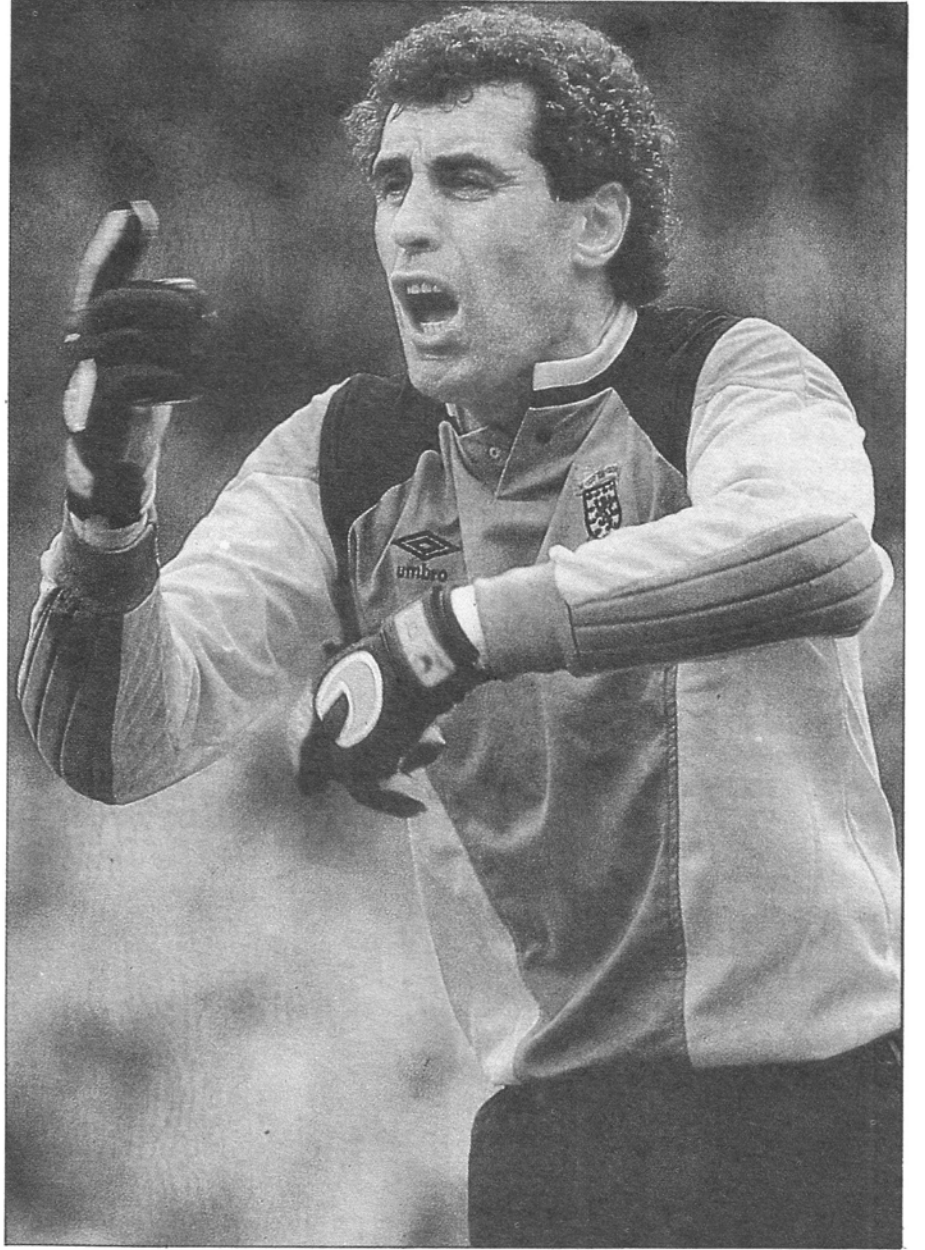
ব্রিটেনের অভিজ্ঞতম খেলোয়াড়, গোলরক্ষক বব শিলটন

করে ভালো ফল দেখাতে পারবে এবারের টুর্নামেন্টে।

সর্বোচ্চ খেতাবে লড়াইয়ের জন্যে বাকি থাকলো আর্জেন্টিনা, ইতালি, ব্রাজিল ও পশ্চিম জার্মানি। অন্যদিকে এই ব্যাপারটিই নেদারল্যাণ্ডের কাছে দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই নেদারল্যাণ্ড গতবারের ফাইনালে দুটো প্রভাবপূর্ণ খেলা দেখিয়ে ছিলো বটে কিন্তু ফিফা কাপ জিততে পারেনি। যদিও ইতালি ও ব্রাজিল দুদলই তিনবার করে বিশ্বকাপ জিতেছিলো, তবু বিশেষজ্ঞদের ধারণা ইতালিয়ানদেরই সম্ভাবনা উজ্জ্বল কেননা তারা নিজেদের মাঠেই খেলবে। মার্কিন টিমের ক্যাপ্টেন মাইক 'উইনডি' উইনডিচম্যান সরাসরি বললেন, 'আমার পছন্দে ইতালি আছে—বিশেষ করে ইতালি আয়োজক দেশ—তবু আমি বেশি পছন্দ করি ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, হল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানিকে। অন্যদের বেলা বিশ্বকাপ ফুটবল খেতাব জেতা সিণ্ডারেলার গল্পের মতোই ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।'

যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে সব কিছুই নির্ভর করবে আগামী দিনগুলিতে কোন দল অন্যকে টেক্কা দিয়ে যেতে পারবে—তার ওপর।

রবি চতুর্বেদি

বাংলা সিনেমার অন্তর্জলি যাত্রা

বন্দিনী ছবিতে প্রসেনজিৎ এবং শতাব্দী রায়

প্রতিষ্ঠিত নায়ক প্রসেনজিৎ

ছবি : রথীজিৎ নাইক

অক্ষম পরিচালক, আকর্ষণহীন শিল্পী, হিন্দি সিনেমা, ভিডিও পারলার, দূরদর্শন, দর্শকের রুচি নাকি অন্য কোন গূঢ় কারণে বাংলা সিনেমা প্রতিদিন একটু একটু করে শেষ হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ? টালিগঞ্জ পাড়ার অতীত–বর্তমান-ভবিষ্যতের দিকে তথ্যনিষ্ঠ আলোকপাত।

ভদ্রলোক ছবি পরিবেশনার কাজ করছেন দীর্ঘদিন। ধর্মতলা পাড়ায় ওঁর একটি মাঝারি গোছের পরিবেশনার অফিসও আছে। সাধারণত বাংলা ছবিই পরিবেশনা করে থাকেন উনি। মাঝে দু'একটি হিন্দি ডাবিং ছবির পরিবেশনাও করেছিলেন, কিন্তু সুবিধে না হওয়ায় এখন উনি পুরোপুরি মনোনিবেশ করেছেন বাংলা ছবিতে।

গত ছয় মাস ধরে উনি এক নামী পরিচালকের নির্মিয়মান বাংলা ছবিটির পরিবেশনার সত্ত্ব নেবার জন্য ঘোরাঘুরি করছিলেন। মাঝে ছবির কাজ আটকে যাওয়ায় উনি প্রযোজককে বেশ মোটা অঙ্কের টাকাও দিয়েছেন।

অবশেষে গত বছর শেষদিকে প্রযোজকের সঙ্গে ভদ্রলোকের এক চুক্তি হলো ছবিটির পরিবেশনা নিয়ে। চুক্তিতে শর্ত হলো, ছবি তৈরির জন্য পরিবেশককে দু'লক্ষ টাকা দিতে হবে প্রযোজককে। তাছাড়া দিতে হবে প্রিন্ট–পাবলিসিটির জন্য প্রায় সাত লক্ষ টাকা। অর্থাৎ সব মিলিয়ে নয় লক্ষ টাকা।

ঐ চুক্তি সই হয়ে যাবার পর ভদ্রলোক বেশ খুশিই ছিলেন। পরিচিত বন্ধু–বান্ধবদের হাসি–হাসি মুখ করে বলেছেন, 'বেশ সস্তায় ছবিটা পেয়ে গেলাম। এ বাজারে ওই দামে ছবি পাওয়া রেয়ার ব্যাপার কিনা বলুন ?'

আস্তে আস্তে ছবির স্যুটিং শেষ হলো। কথামত ভদ্রলোককে প্রোডাকশনে দিতে হল দু'লক্ষ টাকা। এপর্যন্ত সব ঠিক ছিল তারপর ভদ্রলোকের কি যে হল, এক সকালে পরিচিত এক পরিবেশককে ফোন করে বললেন, 'আমি ওই ছবিটা ছেড়ে দিতে চাই, আপনি কি ছবিটা কিনবেন ? বেশি দাম দিতে হবে না, আমার ইনভেস্টটুকু আমায় যদি দিয়ে দেন, ছবিটা আমি ছেড়ে দেব।'

'কি আবার হল ?'

'আমার টাকার সোর্স ঝামেলা করছে, কোথায় পাবো প্রিন্ট পাবলিসিটির অতো টাকা ? আপনি আমায় বাঁচান !'

'আচ্ছা ভেবে দেখি।'

পরিবেশক ভদ্রলোক কিন্তু অবলীলায় মিথ্যে কথা বললেন। ওঁর টাকার সোর্স কোন গোলমাল করেনি। আসল সত্যিটি হল ইদানিং কোন বাংলা ছবিই তেমন দাঁড়াচ্ছে না বলে ভদ্রলোক ভয় পেয়েছেন। ৯ লক্ষ টাকার দায়িত্ব নিতেও উনি সাহস পাচ্ছেন না। ছবি যদি না চলে তাহলে ভদ্রলোকের অনেক লোকসান হয়ে যাবে।

এতো গেল পরিবেশক পাড়ার হালচাল। স্টুডিও পাড়া মানে টালিগঞ্জ পাড়ার অবস্থার দিকে এবার চোখ রাখা যাক।

নতুন প্রযোজক এসেছিলেন ছবি প্রযোজনা করতে। অনেক ঢাক–ঢোল পিটিয়ে নামী সুরকারকে দিয়ে বোম্বেতে ছবির সাতটা গান রেকর্ড করে এলেন তিনি। খরচ হল দু'লক্ষ টাকার মত। এবার স্যুটিং পর্ব। শিল্পীদের অনেক টাকা অ্যাডভান্স দেওয়াও

প্রবাসী গ্ল্যামার মৌসুমী চ্যাটার্জি

বান্ধবী ছবিতে সন্তু মুখার্জি, রজনী শর্মা

হল। পরিচালক স্যুটিং-এর প্রোগ্রাম তৈরি করে গেলেন প্রযোজকের কাছে। বাজেট আগেই দেওয়া আছে, অতএব এখন শুধু কাজ শুরুর অপেক্ষা। কিন্তু তার সব আশায় জল ঢেলে দিলেন প্রযোজক। ব্যাজার মুখ করে প্রযোজক বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে, এখন অন্তত ছয়-সাত মাস আমি ছবির জন্য কোন টাকা দিতে পারব না। আমার ব্যবসায় ভয়ংকর ক্ষতি হয়ে গেছে। দশ লাখ টাকার অর্ডার ক্যানসেল হয়ে গেছে হঠাৎ। এখন এক টাকাও আর ইনভেস্ট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যা খরচ হবার হয়েছে, এখন সব বন্ধ, টাকা পেলে পরে ভাববো।'

এখানেও আসল কথাটা প্রযোজক জানালেন না। অথচ কয়েকমাস আগেই ওই প্রযোজক ভদ্রলোক তেমন কোন খোঁজখবর না করেই পরিচালকের সঙ্গে গান রেকর্ডিং করতে বোম্বে গিয়েছিলেন। ইদানীং বাংলা ছবিগুলি ভাল ব্যবসা না করতে পারায় প্রযোজক ভদ্রলোক মিথ্যে যুক্তি দেখিয়ে সাময়িকভাবে দূরে সরে রইলেন। ছবির সুদিন এলে আবার কাজ শুরু করবেন এই আশায়। এখন বাংলা ছবির সময় খারাপ যাচ্ছে, এখন কোন ছবি হিট করানো বেশ শক্ত কাজ। তার থেকে সুদিনের অপেক্ষায় থাকাই ভাল। গান রেকর্ডিং হয়ে গেছে, সেগুলো তো আর ফেলা যাবে না, পরে কাজে লাগবে। স্যুটিং শুরু হলেই ভাবনা ছিল। তাতে ধারাবাহিকতা বিঘ্ন হতে পারত। এক্ষেত্রে আর সে প্রশ্ন নেই।

বাংলা ছবির সুদিন কখনোই বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। সেই নির্বাক যুগ থেকেই এক অবস্থা। কয়েকবছর ছবির বাজার ভাল যায়, আবার আসে খারাপ সময়। পরপর ঘটে সব ছবির গঙ্গাযাত্রা। এভাবে কাটে কিছুদিন। কেউ এসে হাল ধরেন, আবার পুরো চিত্রজগৎ নড়েচড়ে বসে। রমরম করে কাটে কয়েকবছর, আবার যে কে সেই। এভাবেই চলছে। দেশ বিভাগের কারণে ছবির বাজার ছোট হয়ে যাওয়াও এ বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে কম ধাক্কা দেয়নি। তবু পঞ্চাশ, ষাটের দশকে নানা সমস্যার সামনাসামনি হয়েও বাংলা ছবি চলছিল। তবে ভেতরে বাসা বেঁধেছিল ক্ষয় রোগ। একে একে বন্ধ হচ্ছিল, স্টুডিও আর ল্যাবরেটরি।

সত্তর দশক আর আশির দশকের প্রায় অর্ধেক অংশ এই একে একে নিভিছে দেউটির পর্ব চলেছে। তখন অনেকেরই মনে হয়েছিল, বাংলা ছবি তৈরি বোধহয় বন্ধ হয়ে যাবে। ছবি যদি না চলে, দর্শকেরা যদি ছবি দেখতে না চান, তাহলে ইণ্ডাস্ট্রি চলবে কি করে ?

চিত্রজগতের এই হাল দেখে রাজ্য সরকার এগিয়ে এসেছিলেন। ছবিকে করমুক্ত করা থেকে শুরু করে, অনুদান দেওয়া, স্টুডিও অধিগ্রহণ এবং বেশ কিছু ছবি প্রযোজনাও করেছিলেন। কিন্তু তাতে যে খুব একটা লাভ হয়েছে, এমন কথা বলা যাবে না। এমন একটা সময় এসেছিল যখন দর্শকেরা সব টিকিটের দাম একটাকা হওয়া সত্ত্বেও সে ছবি দেখেন নি। অনুদান দেওয়া নিয়ে উঠেছিল চূড়ান্ত দলবাজির অভিযোগ। দুটো স্টুডিও অধিগ্রহণ করে রাজ্য সরকার বলেছিলেন, আর নয়। সরকারি তরফে শুধু আর্ট ফিল্ম প্রযোজনা করার জন্য সমগ্র চিত্রজগতের কোন লাভ হয়নি। কয়েকমাস কোনরকমে চলেছিল, ব্যস ওই পর্যন্ত। পুরো ইণ্ডাস্ট্রি চলে যে কমার্শিয়াল ছবির দৌলতে তার অবস্থা যথাপূর্বম...রয়ে গেল।

অবশ্য এক ঝাঁক নবাগত পরিচালকদের আগমন ঘটলো এইসময়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামগুলি হলো, অঞ্জন চৌধুরী, প্রভাত রায়, সুজিত গুহ, বীরেশ চট্টোপাধ্যায়, জহর বিশ্বাস প্রভৃতি। অঞ্জন চৌধুরীর 'শত্রু', প্রভাত রায়ের 'প্রতিকার', সুজিত গুহর 'বৌমা', বীরেশ চট্টোপাধ্যায়ের 'একান্ত আপন' ছবিগুলি যথেষ্ট সফল হয়েছিল বক্স অফিসে।

এই নতুন ধারার ছবি তৈরিতে অঞ্জন চৌধুরীর 'শত্রু'র নাম সবসময়ই আগে বলতে হবে। কোন নায়িকা ছাড়া উনি সেই ব্যর্থতায় ভরা ছবির যুগে সাদা-কালো ছবি 'শত্রু' দিয়ে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন। কিছুটা হিন্দি ঘরানায়, মোটা দাগে। চড়া সুরের নাটক, কিছু বাৎসল্যের সেন্টিমেন্ট এনিয়েই 'শত্রু'। সেই ব্যর্থতার যুগে নাটকীয়তায় ভরা সস্তা বাজেটের ছবি 'শত্রু' কে দর্শকেরা লুফে নিয়েছিলেন। একরকম কবর থেকে যেন বাংলা ছবি উঠে এসেছিল সেদিন।

যেই একটি ছবি এভাবে জনপ্রিয় হয়ে গেল, অমনি সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন একান্ত মনোযোগী হয়ে হিন্দি ছবির অনুকরণের কাজে। ভি.সি.আর-এ ক্যাসেট চালিয়ে হুবহু তার অনুবাদ করে হাজার-হাজার টাকা রোজগার করার ব্যবস্থা করলেন কিছু চিত্রনাট্যকার। যাঁদের কাজই হলো, বাংলা পটভূমিতে হিন্দি কাহিনী বলা। কিছু বুদ্ধিমান চিত্রনাট্যকার অবশ্য হুবহু অনুবাদ করলেন না, তাঁরা হিন্দি গল্পের সঙ্গে কিছু নিজস্ব চরিত্র বা কাহিনীও জুড়ে দিতে লাগলেন।

এরমধ্যেই অঞ্জনবাবু উপহার দিলেন তার দ্বিতীয় সফল চমক 'গুরুদক্ষিণা'। আজ পর্যন্ত যত বাংলা ছবি হয়েছে, তারমধ্যে প্রথম মুক্তিতে অত ব্যবসা আর কোন ছবি করতে পারে নি। রেকর্ড হিট বলতে যা বোঝায় একেবারে ঠিক তাই। অথচ ছবিটা খুবই সাধারণ মানের। টেকনিক্যালিও খুব উন্নত নয়। শুধুমাত্র কড়া নাটকের জন্যই ওর যত সাফল্য। আবার কেউ কেউ মনে করেন, কিশোরকুমারের আকস্মিক প্রয়াণও ওই ছবির সাফল্যের পিছনে কাজ করেছে। কারণ যাই হোক না কেন, ছবিটা দর্শকেরা দেখেছেন এটাই শেষ কথা। যে কোন ব্যবসায়িক ছবির সাফল্যের মাপকাঠিও তাই। সেদিক থেকে 'গুরুদক্ষিণা' চূড়ান্ত সার্থক।

এপর্যন্ত সব ঠিক আছে। এরপরই আবার শুরু হল বাংলা ছবির দুর্দিন। দর্শকেরা একই শিল্পী, একই ঢং-এর গল্প, একই সুরকারের সুর, একই শিল্পীর গাওয়া গান শুনে শুনে ফের হাঁফিয়ে উঠলেন। বাংলা ছবিগুলিতে এসময় বৈচিত্র্যের বড় অভাব চোখে পড়তে লাগল। অথচ গত এক দেড় বছরে বাংলা ছবির মাউনটিং-এ বেড়েছে অনেক খরচ। পছন্দসই লোকেশন, বোম্বের নামী অনামী সুন্দরী নায়িকা-ছবির আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য বাংলার প্রযোজকেরা একেবারে দাতা কর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। পঁচিশ-তিরিশ লক্ষ টাকার ছবি খুবই সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল টালিগঞ্জ পাড়ায়।

শুরুতে এসব চমক কাজে এলেও, অচিরেই দর্শকদের অরুচি দেখা দিল। বড় বাজেটের ছবিগুলি মুখ থুবড়ে পড়তে লাগলো। যা চিত্রজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের কাছে ছিল ভীষণ ভাবনার বিষয়। এমুহূর্তেও চলছে অনুসন্ধানের কাজ। বাংলা ছবির অসাফল্যের প্রকৃত কারণ এখনও

পর্যন্ত জানা যায়নি।

গত বছর ও এবছরের প্রথম দুটি মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবির সংখ্যা হল, পঁয়তাল্লিশ। সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন কষ্টে সৃষ্টে ছবির খরচ তুলতে পেরেছে, 'আশা ও ভালবাসা', 'আমার তুমি', 'মর্যাদা', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' এই চারটি ছবি। বাকি একচল্লিশটি ছবিই ব্যর্থ হয়েছে। শুধু ৮৯-এ ব্যর্থ-হয়েছে একত্রিশটি ছবি। হয়ত আরো দু'চারটে ছবি দীর্ঘদিন চলার পর কায়ক্লেশে খরচের টাকাটা তুলতে পারবে, কিন্তু তা নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্টদের কাম্য ছিল না। কিছু ছবি হয়েছে চূড়ান্ত ব্যর্থ, যেগুলি পারেনি প্রিন্ট পাবলিসিটির টাকাটাও তুলতে। শুধু গত বছরই বাংলা চিত্রজগৎ থেকে দু'কোটিরও বেশি টাকা নষ্ট হয়েছে। ছবি পিছু পনেরো লক্ষ টাকা গড় খরচ ধরলে এবং খরচের অর্ধেক টাকা উঠলে, লোকসান দাঁড়ায় দু'কোটি টাকা!

এ তালিকার ছবিগুলি হলো, 'নিশিতৃষ্ণা', 'বান্ধবী', 'শত্রুপক্ষ', 'নিশিবধূ', 'শ্রীমতী হংসরাজ', 'মনে মনে', 'অপরাহ্নের আলো', 'অভিসার', অঘটন আজো ঘটে', 'আমানত', ইত্যাদি।

চলতি বছরের প্রথম দু'মাসে যে ছবিগুলি মুক্তি পেয়েছে সেগুলি হলো', 'কয়েদি', 'স্বর্ণতৃষ্ণা', 'গণশত্রু', 'অনুরাগ', 'মানসী', 'ভাগ্যলিপি', 'হীরক জয়ন্তী', 'কলঙ্ক', 'ব্যবধান', 'মানদণ্ড'। এরমধ্যে একমাত্র 'ভাগ্যলিপি' ছাড়া আর কোন ছবিই সে ভাবে দানা বাধে নি। দু'এক সপ্তাহের বেশি চলেনি বেশির ভাগ ছবি। 'গণশত্রু'র ব্যর্থতাও চোখে পড়ার মতন। যে ছবির পরিচালক সত্যজিৎ রায়। পশ্চিমবঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের কোন ছবিই এতটা ব্যর্থ হয়েছে বলে জানা যায় নি। চলচ্চিত্র উৎসবে তিনটি মাত্র প্রদর্শনী ছাড়া প্রকাশ্যে এছবির আর কোনও প্রদর্শনী এদেশে হয়নি। 'করমুক্ত' হওয়া সত্ত্বেও ছবিটি দর্শকেরা দেখলেন না। মাত্র তিন সপ্তাহেই শহর থেকে ছবিটা উঠে গেল। ভাল ছবির দর্শকেরা গেলেন কোথায়? তারা যদি ছবিগুলো দেখতেন তবে কি ওই হাল হত? গত বছর ওই একই সময় মুক্তি পাওয়া গৌতম ঘোষের 'অন্তর্জলী যাত্রা'র তুলনায়ও 'গণশত্রু' চলল না। দর্শকরা ছবিটা পরিত্যাগ করলেন কেন, তা সত্যিই ভাবার বিষয়। ব্যবসায়িক ছবি দর্শকেরা না দেখা যেমন চিন্তার বিষয়, ভাল ছবি না দেখাটাও তেমনই ভাবনার।

গতবছরের মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলির মধ্যে হিন্দি ছবির অক্ষম অনুকরণ যে ছবিগুলি করেছিল, তারমধ্যে আছে, 'শত্রুপক্ষ', (দীবার) 'আমার তুমি (প্যার ঝুকতা নেহি)', 'তুফান' (ইয়াদো কি বরাত)', 'আশা (ওহ্ সাত দিন)', 'ঝংকার (সরগম)',। একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হিন্দি কাহিনীর অনুবাদ যে ছবিগুলি দেখালো সেগুলি হলো, 'আশা ও ভালবাসা', 'আক্রোশ', 'অঙ্গার', 'আমার শপথ', 'অমর প্রেম' ও 'আমানত,। অন্য ভাষায় হিট দুটো ছবি গত বছর বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে, 'সংসার' (ওড়িয়া) ও 'বিদায়' (হিন্দি)। তবে ওই অনুবাদ যে সফল হয়েছে এমন কথাও বলা যায় না। সাহিত্যনির্ভর কাহিনী নিয়ে ছবি হয়েছে পাঁচটি- 'অন্তর্জলী যাত্রা' (কাহিনী: কমলকুমার মজুমদার), 'মনে মনে' (প্রতিভা বসু), 'অপরাহ্নের আলো' (স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'অঘটন আজো ঘটে' (দিলীপকুমার রায়), 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' (বিমল মিত্র)। শেষের ছবিটি বাদে আর কোনটিই পারে নি সফল হতে। তবে এর পেছনে যাবতীয় গলদ পরিচালকদেরই। কাহিনীতে ছিল যথেষ্ট উপাদান। সেলুলয়েডে তা যথাযথ তুলে না ধরার জন্য দায়ী নিশ্চয়ই লেখক নন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লেখক বিমল মিত্র বিবৃতি দিয়েছিলেন এই বলে, 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' নামে যে ছবিটি তৈরি হয়েছে তা আমার উপন্যাস থেকে নেওয়া নয়, কেননা চিত্রনাট্যকার আমার উপন্যাসের অনেক ঘটনা ও চরিত্র অকারণে বাদ দিয়েছেন।'

অঞ্জন চৌধুরীর ছবি হলে তো কথাই নেই, অন্তত ওঁর কাহিনী ও চিত্রনাট্য হলে সকলেই সে ছবির সাফল্যের দিকে খুবই আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকেন। গত বছর সে গুড়েও কেউ যেন বালি ঢেলে দিয়েছে। অঞ্জন চৌধুরী পরিচালিত একটি ছবিও মুক্তি পায় নি। ওঁর কাহিনী ও চিত্রনাট্য নিয়ে মুক্তি পেয়েছে চারটি ছবি। হরনাথ চক্রবর্তী পরিচালিত 'মঙ্গলদীপ', পলাশ ব্যানার্জির 'শতরূপা' এবং সুজিত গুহ'র দুটি ছবি 'আক্রোশ' ও 'বন্দিনী'। দুঃখের বিষয়, এ চারটির একটি ছবিও চলে নি। 'মঙ্গলদীপ'-এর কাহিনীর সঙ্গে 'গুরুদক্ষিণা'র এক সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়, যা অধিকাংশ দর্শকেরই নজরে পড়েছিল। 'শতরূপা' ছিল অতীতের বিখ্যাত হিট ছবি 'হারানো সুর'-এর অক্ষম অনুকরণ, যা দর্শকদের মোটেই ভালো লাগে নি। গতবছর অতীতের জনপ্রিয় ছবি 'দ্বীপ জ্বেলে যাই'-এর অনুকরণে প্রভাত রায় তৈরি করেছিলেন 'অগ্নিতৃষ্ণা'। এটিও চলে নি। অর্থাৎ কিনা অনুকরণ করাকে দর্শকেরা মোটেই ভালো চোখে দেখছেন না। বড় কাস্টিং-এর ছবি 'আক্রোশ' ও ফ্লপ হয়। যদিও এ ছবির কাহিনী অঞ্জনবাবুর নয়। উনি শুধু চিত্রনাট্য লিখেছেন। তবে অঞ্জনবাবুর নাটকের গুণে মূল গল্পও অনেক বদলে যায়। এছবির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একেবারে হিন্দির আদলে তৈরি এ ছবিকে দর্শকেরা বর্জন করেছেন। গত বছরে অঞ্জন চৌধুরীর কাহিনী ও চিত্রনাট্য নিয়ে সবশেষে যে ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল, তার নাম 'বন্দিনী'। এছবিও হতাশ করেছে সবাইকে। অন্য ছবিগুলির ব্যর্থতা নিয়ে অঞ্জন কোন কথা না বললেও 'বন্দিনী' নিয়ে উনি প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছেন।

তবে এসব ছবিকে ছাপিয়ে গেছে সদ্যমুক্ত 'হীরক জয়ন্তী'র ব্যর্থতা। ওই ছবি নিয়ে অঞ্জনবাবু আগেই নানান কথা বলেছিলেন। প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জও জানিয়েছিলেন। সেসব সংলাপ যেমন আকর্ষক তেমনি অহংবোধে ভরপুর। ...'এখন বাংলা ছবিতে জেনারেটরের সাহায্যে আলো জ্বলছে। হীরক জয়ন্তী মুক্তি পেলে এ, সি (অঞ্জন চৌধুরী) কারেন্ট আসবে। ছবিটি মুক্তি পেলে জয় ব্যানার্জি শেষের সারি থেকে প্রথম সারিতে আসবে। চুমকি'র মাইনাস পয়েন্ট আমার গল্পের জোরে প্লাস হয়ে গেছে। চুমকি দর্শকের কাছে গ্রহণীয় হবেই। অভিনয় নয়, ছবি চলে গল্পের জন্যে, চুমকি হবে বাংলার এক নম্বর নায়িকা।'

অঞ্জনবাবু যে পিতৃস্নেহে অনেকটাই প্রভাবিত ছিলেন সে কথা আজ প্রমাণিত।

আর অঞ্জনবাবুও নিশ্চয়ই জানেন বাংলা ছবির ব্যর্থতার যে সব কারণগুলো উল্লেখ করা যায় তার মধ্যে অন্যতমটি হল হিন্দি ছবির অন্ধ অনুকরণ। শুরুতে মুখবদলের লোভে দর্শকেরা ছবিগুলি দেখেছিলেন, কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই তারা অবিষ্কার করলেন, বাংলা ভাষায় হিন্দি ছবি ভিন্ন এ আর কিছু নয়। তাছাড়া বোম্বের সুরকার, গায়ক-গায়িকা ও খেয়ালখুশি শিল্পীদের নিয়ে আসাও অচিরেই একঘেয়ে হয়ে গেল।

একই ধরনের গল্পই শুধু নয়, সেইসঙ্গে একই শিল্পীদের দেখতে দেখতেও দর্শকেরা হাঁপিয়ে উঠেছেন। গত পাঁচ বছরে পাঁচজন প্রতিষ্ঠিত নতুন শিল্পীও বাংলা ছবিতে দেখা যায়নি। বাংলা ছবির সাফল্যের পিছনে চিরকালই কাজ করেছে সাহিত্য গুণ সমৃদ্ধ কাহিনী ও রুচিশীল উপস্থাপনা। ঐ দুটি ব্যাপারই আজ ছবির জগৎ থেকে হারিয়ে গেছে। বাংলা ছবি হারিয়েছে তার স্বকীয়তা। অন্ধ অনুকরণ অবশ্য দর্শক রুচিরও ক্ষতি করেছে অনেকখানি।

তবে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সেই হারানো মাটি খুঁজে পাওয়া সহজ না হলেও অসম্ভব তো নয়। তবে তেমন সাহসী পরিচালক এমুহূর্তে একজনও চোখে পড়ছেন না। যাঁরা আছেন তাঁরা সকলে চর্বিত চর্বনেই বেশি ব্যস্ত। হারানো জমি নিয়ে কোন ভাবনাও তাঁদের নেই। যে কোন ভাবে একটি ছবি করতে পারলেই তাঁরা আহ্লাদিত হন। এর বেশি কিছু নয়।

মোটা দাগের হাততালি সর্বস্ব সংলাপেরই এখন খুব কদর। এ ব্যাপারটা দীর্ঘদিন যাত্রা জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এখন তা আধুনিক না হয়েই সিনেমায় ঢুকে গেছে। ফলে তা না হচ্ছে যাত্রা, না হচ্ছে চলচ্চিত্র। চলমান ছবির বেশি একে আর কি বলা যায়?

সব মিলিয়ে সস্তায় সাফল্য পাওয়ার মোহ কাটিয়ে উঠতেই হবে বাংলা ছবিকে। খুঁজে নিতে হবে হারানো জমি। সর্বোপরি বাংলা ছবির এই শ্মশান যাত্রা রোধ করার উপায় টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ার মানুষজনদেরই খুঁজে নিতে হবে।

তপন রায়

প্রতারণা ও চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত বিশ্ববন্দিত মৃণাল সেন

মার্ক্সবাদী সরকারের আমলে পাওয়া সরকারি অনুদানে নির্মিত মৃণাল সেনের 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ' তথ্যচিত্র নিয়ে বর্তমান ত্রিপুরার কংগ্রেস—উপজাতি যুব সমিতি সরকারের তোলা প্রতারণা ও চুক্তি-ভঙ্গের অভিযোগ কতখানি বাস্তব সম্মত? ত্রিপুরাব্যাপী এই বিতর্কে তথ্যসমৃদ্ধ আলোকপাত।

বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেনের পরিচালনায় নির্মিত রঙিন তথ্যচিত্র 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ' দীর্ঘ প্রায় দশ বছর বাক্স-বন্দী থাকার পরে নতুন করে বিতর্কের ঝড় তুলেছে। পূর্বতন মার্ক্সবাদী সরকারের আমলে ত্রিপুরার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রযোজিত তিন রিলের এই তথ্যচিত্রটি তৈরির ক্ষেত্রে পরিচালক মৃণাল সেনের বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গ ও প্রতারণার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। শ্রী সেন নাকি দুটি বিদেশি টি.ভি. কোম্পানির কাছে বিতর্কিত তথ্যচিত্রটির দু'টি প্রিন্ট চড়া মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছেন।

২৫ জানুয়ারি ১৯৯০। ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশনে কংগ্রেস(ই) সদস্য রতনলাল ঘোষ বিষয়টি উত্থাপন করলে সভায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শ্রী ঘোষ জানতে চান, জনস্বার্থের নামে সর-কারি ব্যয়ে পরিচালক মৃণাল সেনকে দিয়ে 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ' তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রিয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের অনুমোদন পাওয়া সত্ত্বেও ছবিটি জনসমক্ষে প্রদর্শন না করে বাক্সবন্দী করে রাখার পেছনের রহস্য কি? আরও একাধিক সদস্যই তথ্য চিত্রটি তৈরির ক্ষেত্রে 'রাজনৈতিক ধান্ধাবাজি, আর্থিক কেলেঙ্কারি' সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভি-যোগ তুলে তদন্তের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠলে
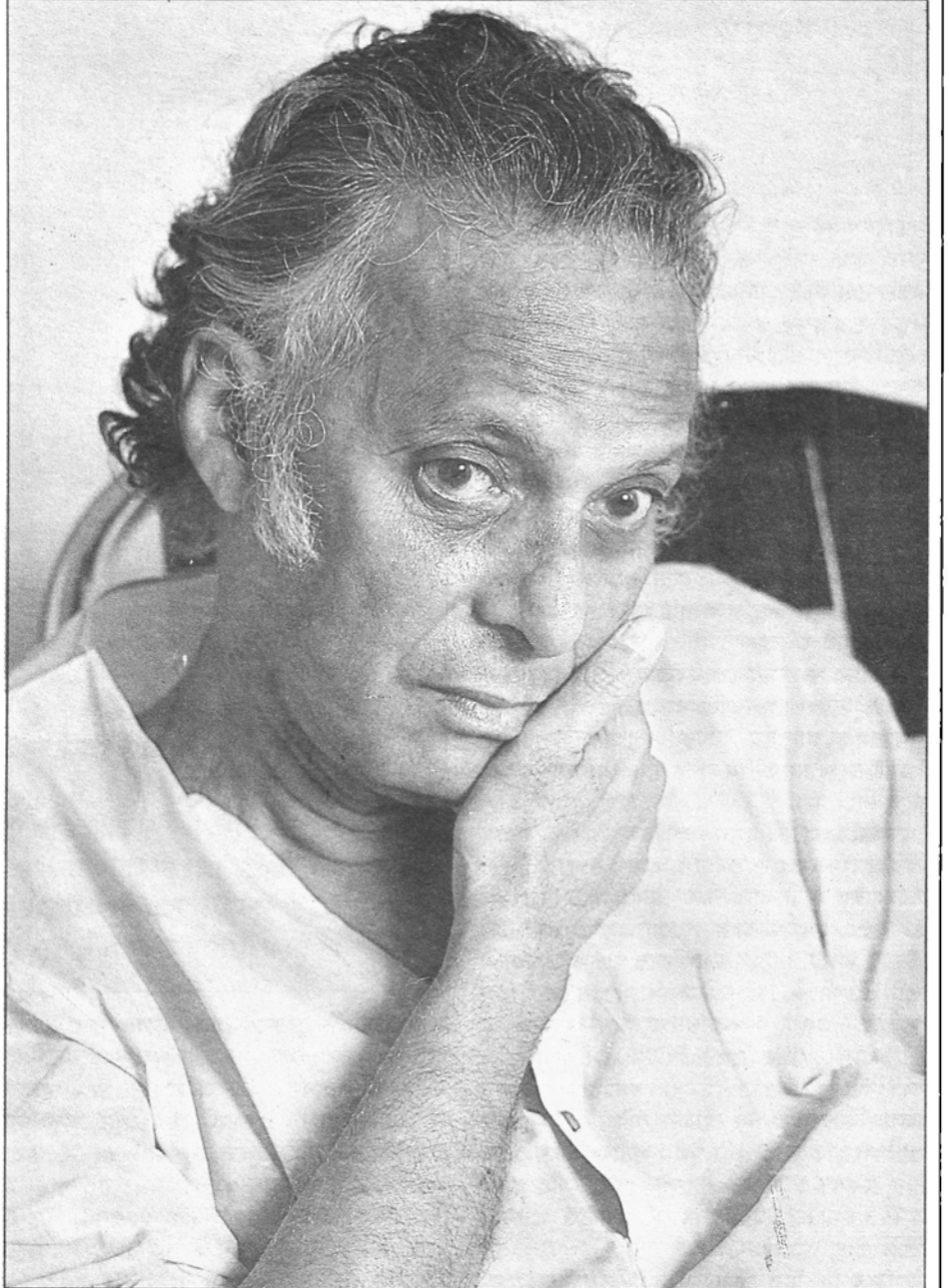
মৃণাল সেন ছবি : রথীজিৎ ঘটক

পরিচালক শ্রী সেন ছবিটি সরবরাহ করার আগেই যে সমস্ত চিঠি লিখে, ধমকের সুরে ত্রিপুরা সরকারের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিয়েছেন তা অত্যন্ত অপমানকর !

সভা বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষুব্ধ সদস্যদের আশ্বস্ত করে তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী রতন চক্রবর্তী জানান, সরকার সমগ্র বিষয়টি নতুন করে তদন্ত করবেন এবং সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত-দের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবেন। মন্ত্রী সদস্যদের জানান, মৃণাল সেনের পরিচালনায় নির্মিত তথ্যচিত্রটির জন্য সর-কারের ব্যয় হয়েছিল দু' লক্ষ দু'হাজার নশো পঞ্চাশ টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা। ত্রিপুরার উপজাতিদের রাজনৈতিক জীবন নিয়ে ছবিটি তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকারের মনোমত না হওয়ায় জনসমক্ষে এটি প্রদর্শন করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে ছবিটির কিছু অংশ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য মৃণাল সেনকে চিঠি লেখা হয়। এবং শ্রী সেন প্রচার দপ্তরকে কোন্ কোন্ অংশ পরিমার্জনা করতে হবে তা জানাতে বলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে প্রচার দপ্তরের উপদেষ্টা কমিটির মতামত না পাওয়ায় অগ্রসর হওয়া যায় নি।

পরিচালক শ্রী সেন ছবিটি সরবরাহ করার আগেই যে সমস্ত চিঠি লিখে, ধমকের সুরে ত্রিপুরা সরকারের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিয়েছেন তা অত্যন্ত অপমানকর ! তথ্যসংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী-সেনের একটি চিঠির উল্লেখ করে বলেন, একস্থানে তিনি লিখেছেন, 'ত্রিপুরা সরকারের চেয়ে মৃণাল সেন ছোট নয়।' 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ' নিয়ে যখন সভায় আলোচনা চলছিল তখন সি পি এম সদস্যরাও যথারীতি উপস্থিত ছিলেন। তথ্যচিত্রটি তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ তৎপর ছিলেন যিনি, সেই প্রাক্তন তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী অনিল সরকারকে তখন দেখা যায় একান্তে নোটবুকে কি সব নোট নিচ্ছিলেন। অথচ মজার ব্যাপার, এ প্রসঙ্গে টুঁ-শব্দটিও করেননি তিনি।

কিন্তু কি ছিল 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ' তথ্যচিত্রে ? যা নিয়ে ত্রিপুরার বুদ্ধিজীবী মহল এমন কি খোদ শাসক বামফ্রন্টেই বিতর্কের ঝড় উঠেছিল ?

১৯৭৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে সি পি এম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এল। তার পরের বছরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ত্রিপুরায় মার্ক্সবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হবে। সেইমত তথ্য-সংস্কৃতি মন্ত্রী অনিল সরকারের তত্ত্বাবধানে পাণ্ডু-লিপিও তৈরি হল। রঙিন তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনের সঙ্গে দু'লক্ষ টাকায় একটি চুক্তিও হল। কথা ছিল ১৯৭৯ সালের মে মাসে মৃণাল সেন রাজ্য সরকারকে ছবিটি সরবরাহ করবেন। বিশাল দলবল নিয়ে মৃণাল সেন কয়েক দফায় ত্রিপুরায় এলেন। স্টেট গেস্ট-এর রাজকীয় মর্যাদায় বিভিন্ন এলাকা ঘুরলেন, কথা বললেন, ছবি তুললেন। কিন্তু এরপরেও দু'বছর কেটে গেল। রাজ্য সরকার ছবি পাচ্ছেন না। তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী মৃণাল সেনকে দফায় দফায় চিঠি লিখলেন, টেলিফোনে কথা বললেন। এরপরেও যখন কোন ফল হল না, তখন তথ্যসংস্কৃতি দপ্তরের ৩ জন পদস্থ কর্মকর্তা কলকাতা ছুটে গিয়ে মৃণাল সেনের বাসভবনে সাক্ষাৎ করলেন। দীর্ঘ তিন বছর পরে মৃণাল সেন রাজ্য সরকারকে ৯২১ মিটার দীর্ঘ তিন রিলের রঙিন তথ্যচিত্র 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ'-র একটি প্রিন্ট সরবরাহ করলেন। এর আগেই অবশ্য মৃণাল সেনকে তুষ্ট করতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শ্রী সেনের কিছু চলচ্চিত্রের একটি জমাটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছিল।

ত্রিপুরার তথ্যমন্ত্রী রতন চক্রবর্তী

কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে পাহাড়ীদের সংঘবদ্ধ করে কম্যুনিস্ট পার্টীর নেতৃত্বে বিভিন্ন ধারার আন্দোলন, নিষ্পেষিত উপজাতিদের জীবনধারা, কিছু পাহাড়ী ল্যাণ্ডস্ক্যাপ ইত্যাদিই তথ্যচিত্রটির মূল উপজীব্য। কিন্তু তাও বিক্ষিপ্তভাবে।

দশরথ দেব

১৯৮২'র ৭ নভেম্বর। আগরতলার একটি প্রেক্ষাগৃহে বামফ্রন্টমন্ত্রীবর্গ, রাজনৈতিক নেতা, আমলা, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে তথ্যচিত্রটির প্রদর্শন হল। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ আঁতকে উঠলেন ! দীর্ঘ তিন বছরের প্রচেষ্টায় মৃণাল সেনের মত একজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার এ কোন 'বিকলাঙ্গ শিশু'র জন্ম দিলেন ! ছবিতে দেখা যাচ্ছে, চল্লিশের দশকের সেই অগ্নিগর্ভ দিন-গুলোতে ত্রিপুরার মুকুটহীন 'পাহাড়ী রাজা' দশরথ দেববর্মা কিভাবে বন্দুক কাঁধে নিয়ে দিল্লির উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে 'সশস্ত্র সংগ্রাম' পরিচালনা করছেন; দশরথ-বিদ্যা-সুধন্বা দেব-বর্মার নেতৃত্বে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সশস্ত্র গেরিলাবাহিনীর (ত্রিপুরী ভাষায়-বলংবরক) দাপটে কিভাবে পুলিশ ও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জওয়া-নরা পাহাড়ী অঞ্চলে ক্যাম্প ছেড়ে পালাচ্ছে, সেসব কাহিনী গর্বভরে স্মৃতিচারণা করছেন মার্ক্সবাদী মন্ত্রী দশরথ দেববর্মা, বীরেন দত্ত, প্রমুখরা। ত্রিপুরার শেষ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণি-ক্যের রাজত্বকাল ও তার অব্যবহিত পরে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে পাহাড়ীদের সংঘবদ্ধ করে কম্যুনিস্ট পার্টীর নেতৃত্বে বিভিন্ন ধারার আন্দোলন,

নিষ্পেষিত উপজাতিদের জীবনধারা, কিছু পাহাড়ী ল্যাণ্ডস্ক্যাপ ইত্যাদিই তথ্যচিত্রটির মূল উপজীব্য। কিন্তু তাও বিক্ষিপ্তভাবে।

'স্বাধীন ত্রিপুরার দাবিতে টি.এন.ভি. নেতা বিজয় রাংখালের সশস্ত্র ঘাতক বাহিনীর নির্বিচার গণ-হত্যা ও সন্ত্রাসে সমগ্র ত্রিপুরা তখন অগ্নিগর্ভ। ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে সরকারি প্রযোজনায় মৃণাল সেনের এই তথ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী

বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে। বামপন্থী হিসেবে পরিচিত সংবাদপত্রও সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। বুদ্ধিজীবীমহল বলতে থাকেন, এই তথ্যচিত্রটি মার্ক্সবাদীদের সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে সহায়ক হলেও, মূলত বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রবাদীদের মনোবলকে যেমন বাড়িয়ে তুলবে তেমনি উপজাতি যুবকদের হিংসার পথে ঝুঁকতে প্ররোচিত করবে। যা ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ পাহাড়ী–বাঙালি সংহতি, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। অনেকের মতে, এই তথ্যচিত্রটি দেখে বহির্ত্রিপুরার মানুষ এক বিকৃত, বাস্তবজীবনের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন এক খণ্ডিত ত্রিপুরাকে প্রত্যক্ষ করবে।

এসব সমালোচনা সত্ত্বেও তথ্যচিত্রটি বামফ্রন্ট সরকার অবশ্যই প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতেন। সন্দেহ নেই, কিন্তু ছবিটি নিয়ে মার্ক্সবাদী নেতাদের মধ্যেই বিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। ত্রিপুরার কম্যুনিস্ট আন্দোলনে মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক নেতা নৃপেন চক্রবর্তীরও এক্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে পালিয়ে ত্রিপুরার পাহাড়ে গোপনে আশ্রয় নিয়ে নৃপেনবাবু দশরথ-অঘোর দেববর্মাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে উপজাতি বিদ্রোহকে সুসংহত রূপ দেন এবং কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব দখল করেন। এহেন নৃপেন চক্রবর্তী 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ' তথ্যচিত্রে চূড়ান্তভাবে উপেক্ষিত। নৃপেনবাবুর অনুগামীরা এটা কোনভাবেই বরদাস্ত করতে রাজি নন। তাদের অভিযোগ, দশরথকে ত্রিপুরার কম্যুনিস্ট আন্দোলনের একচ্ছত্র নায়ক হিসেবে চিত্রিত করার লক্ষ্যে সুকৌশলে নৃপেনবাবুকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। মার্ক্সবাদী
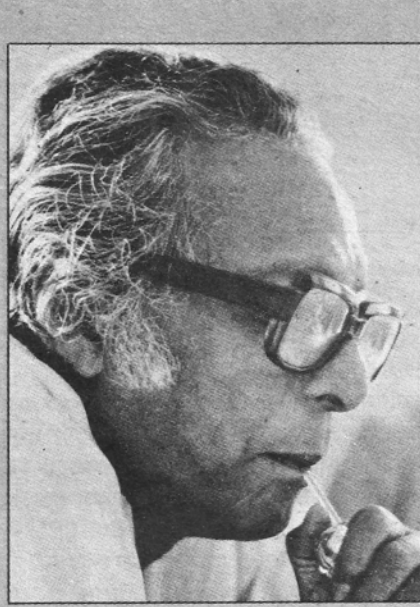
ত্রিপুরার গণআন্দোলন দেখাতে গিয়ে পরিচালক মৃণাল সেন একপেশে ভূমিকা নিয়েছেন। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে শুধু কম্যুনিস্টরাই আন্দোলন করেনি, এক্ষেত্রে কংগ্রেসেরও অবদান রয়েছে। অথচ এদিকটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

নেতাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলেই শেষ পর্যন্ত তথ্যচিত্রটির প্রদর্শনী স্থগিত হয়ে যায় বলে ধারণা করা হয়।

তথ্যচিত্রটির একটি অংশে রিয়াং বিদ্রোহের প্রসঙ্গ টানতে গিয়ে ত্রিপুরার বিশিষ্ট উপজাতি গবেষক ও লেখক মণিময় দেববর্মাকে মৃণাল সেন পর্দায় টেনে এনেছেন। শ্রী দেববর্মা তথ্যচিত্রটি প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদককে বলেন, ত্রিপুরার গণ-আন্দোলন দেখাতে গিয়ে পরিচালক মৃণাল সেন একপেশে ভূমিকা নিয়েছেন। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে শুধু কম্যুনিস্টরাই আন্দোলন করেনি, এক্ষেত্রে কংগ্রেসেরও অবদান রয়েছে। অথচ এদিকটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সর্বোপরি, উপজাতি বিদ্রোহকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে হিংসাত্মক প্রবণতাকে যেভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এর ফলে তথ্যচিত্রটি দেখে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আরও বরং উৎসাহিত হয়ে উঠবে। মৃণাল সেনের মত একজন বিদগ্ধ চিন্তাবিদের কাছ থেকে এমন একটি তথ্যচিত্র একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

১৯৮২ সালের গোড়ার দিকে পরিচালক মৃণাল সেন 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ'র শেষ দৃশ্য গ্রহণ করেন ডম্বুর লেক–এ। সেখানে উপজাতিদের নৌকাদৌড়–এর দৃশ্যে মাঝিদের প্রচলিত গানের পরিবর্তে জুম চাষের একটি গান টেপ করে দেখান হয়।

১৯৮২ সালের গোড়ার দিকে পরিচালক মৃণাল সেন 'ত্রিপুরা প্রসঙ্গ'র শেষ দৃশ্য গ্রহণ করেন ডম্বুর লেক–এ। সেখানে উপজাতিদের নৌকাদৌড়–এর দৃশ্যে মাঝিদের প্রচলিত গানের পরিবর্তে জুম চাষের একটি গান টেপ করে দেখান হয়। এ ধরনের আরও অসঙ্গতি বিভিন্ন দৃশ্যেই রয়েছে বলে প্রকাশ।

তথ্যচিত্রটি তৈরির ব্যাপারে সম্পাদিত চুক্তির শর্তও লঙ্ঘন করেছেন শ্রী সেন। ১৯৭৯ সালের মে মাসে ছবিটি দেওয়ার কথা। কিন্তু রাজ্য সরকার ছবি পেয়েছেন ১৯৮২ সালের নভেম্বরে, অনেক দরবার করে। অথচ, এর আগেই সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে পরিচালক দুই লক্ষাধিক টাকা নিয়ে গেছেন। চুক্তির শর্ত অনুসারে, ছবিটির দুটি প্রিন্ট অর্থাৎ ১টি ৩৫ মিলিমিটার এবং ১টি ১৬ মিলিমিটারের প্রিন্ট দেওয়ার কথা থাকলেও, দ্বিতীয়টি দেননি। সর্বোপরি, রাজ্য সরকারকে সামনে রেখে শ্রী সেন চড়া মূল্যে ছবির দুটি প্রিন্ট বিদেশে বিক্রি করে দিয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

চুক্তিভঙ্গ করার মত এতসব কারণ থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার মৃণাল সেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি কেন সে বিষয়টিও বর্তমান সরকার খতিয়ে দেখছেন বলে জানালেন তথ্যসংস্কৃতি মন্ত্রী রতন চক্রবর্তী।

সত্যেন্দ্র চক্রবর্তী

মুখ না মুখোশ!
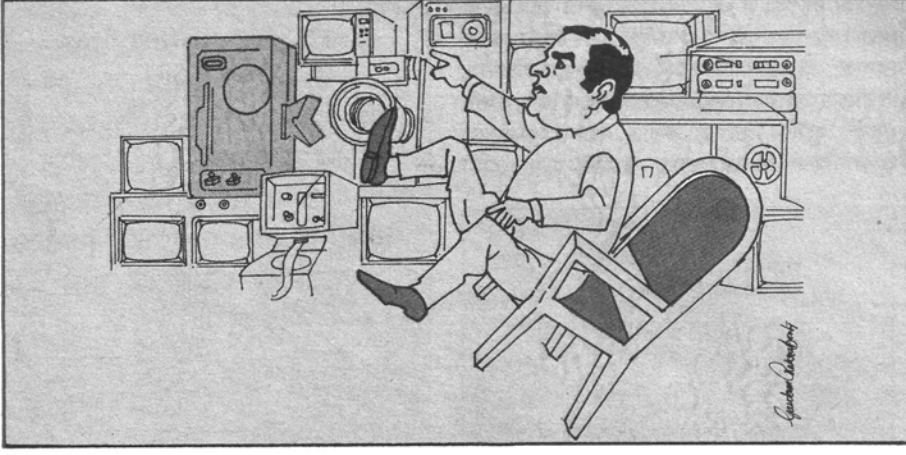
বোকাবাক্সের তালতরিয়ৎ

রাজীব সরকারের সদ্য পতনের পরেই চাকে ঢিল খাওয়া ভীমরুলের মতন তালহারা হয়ে পড়েছে সবাই। কারোর সাধ্যি নেই কে কোন দপ্তর পাবে—একথা বোঝার। একদিন এক রাজীব ভক্ত দুঁদে আমলা বললেন, কে কোন দপ্তর পাচ্ছেন তা নিয়ে যতই চাপাচাপি চলুক, তিনি তা সবার আগে জানবেনই। একথা কি কেউ বিশ্বাস করে! কিন্তু ঘটনা ঘাড় ধরে বিশ্বাস করাল। তথ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কে হচ্ছেন তা নিয়ে কৌতূহল ছিল সবচেয়ে বেশি। জানা গেল ওই দুঁদে আমলা নব নিযুক্ত তথ্যমন্ত্রী পি উপেন্দ্রকে সবার আগে অভিনন্দন জানিয়েছেন। পরে একসময় দুঁদে আমলাটি চুপি চুপি বললেন, 'দেখলেন তো, আপনাদের ভাষায় 'বুরোক্র্যাটদের ক্ষমতা' কতখানি?

দূরদর্শনে স্বশাসন প্রসঙ্গে অনেকেই নব্য সরকারের চিন্তাধারা সম্পর্কে টেবিল চাপড়েছেন—খুব ভাল! দারুণ! কিন্তু আমলাতান্ত্রিক বেড়া কেটে কিছু কি করা যাবে! পূর্বের উৎসাহীরা এবার কিন্তু ঢোঁক গিলছেন। 'আমলা- প্রভাব' হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। রাতারাতি এক ট্যাকলিং-এ দূরদর্শনের বার্তা সম্পাদক বিদগ্ধ সাংবাদিক সুনীত চক্রবর্তীকে ছিটকে দিয়ে কর্তৃপক্ষ বোঝালেন, বাবা স্ব-শাসনের খোয়াব দেখ না! ও বড় অবাস্তব জিনিস! এই সুনীতবাবু দূরদর্শনে আসার পর তাঁর আমলেই বহু বলিষ্ঠ প্রতিবেদন ছোট পর্দায় ভেসেছে। নিছক দলীয় প্রচার সেখানে হয়নি। কিন্তু কর্তৃপক্ষের চ্যালেঞ্জ নিয়ে কিছু প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করাই তাঁর কাল হল। দূরদর্শনে কান পাতলে শোনা যায়। অটোনমির প্রশ্নে কেন্দ্রিয় সরকারের ভূমিকা এখন সমালোচিত। স্ব-শাসনের পক্ষে জোর সওয়াল কি তবে স্রেফ ভাঁওতা! কেন্দ্রিয় কর্তাদের প্রকৃত চাঁদমুখ আড়াল করতেই মুখোশের আড়ালে অটোনমি নিয়ে এত নাচন-কোঁদন!

দূরদর্শনে বুলবুল

সাংঘাতিক লড়াই। মর্মান্তিক। না—কোনও রাজনৈতিক লড়াই নয়। হিস্যা নিয়ে সমাজবিরোধীদেরও নয়। এ লড়াই একই প্রজাতির দুই পাখির মধ্যে এরা হল বুলবুল। গোপীবল্লভপুরের নয়াগ্রামের বুলবুল পাখির লড়াই দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। এ নিয়ে শীতকালে বসে নয়নাভিরাম মেলাও। এখানেই হয় নির্দিষ্ট ঘেরা জায়গায় বুলবুল পাখির জবরদস্ত টক্কর। যতই কলকাতা দূরদর্শনের ক্যামেরা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কানা হোক, সংবাদ রচনায় চিৎ হয়ে পড়ুক, বিধানসভার কার্যবিবরণী দেখাতে গিয়ে মুখ থুবড়ে যাক—এই লড়াই—এর ব্যাপারে কিন্তু সত্যিই পাশ করে গেছে। আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। টাটকা সতেজ একরাশ ফুলের মতনই একের পর এক দৃশ্য দূরদর্শনের পর্দায় উপস্থাপিত করে বুলবুলের টক্করকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। নিছক মারামারি নয়। এই ঘটনার ফ্ল্যাশব্যাক জানিয়েছে—লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাস। দুটি বুলবুল লড়াই—এর ময়দানে (এখানে টেবিল) প্রথমে একেবারে স্বাভাবিক। এক টুকরো খাবারের লোভ দেখানো মাত্রই শুরু হয়ে যায় জীবন মরণ কাজিয়া। কেউই খাবার পায় না। নেপথ্য আড়কাঠিদের খেলায় বুলবুলদের এই শোচনীয় মর্মান্তিক দৃশ্য যদি আমাদের জীবনে অন্য কিছু মনে করিয়ে দেয়, তবে তা হবে স্বাভাবিক। ন্যায্যও। দূরদর্শনকে ধন্যবাদ।

দূ · র · দ · র্শ · ন প র্যা লো · চ · না

আরাম কেদারায় বিপ্লব

প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা সরোজ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে দূরদর্শনে এক আলোচনার আয়োজন হয়। এই আলোচনা শুধু সরোজবাবুতেই থেমে থাকেনি। তাঁর জীবনাদর্শ আলোচনা করতে গিয়ে কমিউনিজমের একেবারে গোড়ার কথাও উঠে আসে। কমিউনিস্ট নেতা ও মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী, সি পি আই দলের প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখার্জি নকশাল নেতা অসীম চ্যাটার্জি এই আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় দাপটের সঙ্গে বক্তব্য পেশ করেন আলোচনার মধ্যমণি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশীতিপর বৃদ্ধ প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। সরোজবাবুর সোজা সরল জীবন যাপনের প্রশ্ন উঠতেই প্রফুল্লবাবু বলেন, ক্ষমতায় এলে স্বাভাবিক ভাবেই আসে লোভ। এরপরে ভোগ। আর দু'টির শেষে আসে সর্বনাশ। এগুলির উর্দ্ধে উঠে কাজ করতে হয়। কিন্তু করে কে! প্রফুল্লবাবু বললেন, মন্ত্রী কালিপদ মুখার্জি, খগেন দাশগুপ্ত মন্ত্রী হয়েও সাদাসিধে জীবনযাপনেই অভ্যস্ত ছিলেন। আর তাঁর নিজের অবস্থা এখন বন্ধুনির্ভর। ১৮ বছর মন্ত্রী থেকেও এখন তিনি বন্ধুর ভরসায় দিন কাটান। বিশ্বনাথবাবু বললেন, মাটির সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হয়ে গ্রীক পুরাণের অ্যান্টিয়াস হারকিউলিয়াসের কাছে পরাজিত হন। তেমনি কমিউনিস্টরাও মাটির কাছ থেকে সরে গেলে আর কমিউনিস্ট থাকেন না। এ দিয়ে বিশ্বনাথবাবু যা বোঝাতে চান তা আর আলোচনায় অপরিষ্কার থাকে না। তাত্ত্বিক কথা অসীমবাবুও কিছু বলেন। বিনয়বাবু জানান, ক্ষমতায় এলে পদস্খলনের একটা ঝোঁক এসে যায়। কিন্তু কমিউনিস্ট আদর্শে জীবনগড়া থাকলে এ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আলোচনাটি সরস হয়ে ওঠে আলোচনা বৈঠকের কমপেয়ার বিপ্লব দাশগুপ্তর জন্য। এর কারণও রয়েছে। ইনি ব্যক্তিগত জীবনে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে দীক্ষিত! কিন্তু দলের কিছু কর্মকর্তার কলকাঠি নাড়ানোয় এঁর সদস্যপদ চলে যায়। প্রশ্নোত্তর পর্বে এককালে দলের সর্বক্ষণের কর্মী বিপ্লববাবুর চোখা চোখা প্রশ্নে বিশ্বনাথবাবু, বিনয়বাবু, অসীমবাবুকে বেশ কয়েকবার ঢোঁক গিলতে হয়। বিপ্লববাবুর প্রশ্নের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুই ছিল, সরোজবাবুর আদর্শ সামনে রেখে চলতি কালের কিছু ক্ষমতাসীন নেতার কাণ্ডকারখানা দেখে কি বলা যায় এদের দ্বারা বিপ্লব করা সম্ভব!

তা সম্ভব কি অসম্ভব ভবিষ্যতেই জানা যাবে। কিন্তু দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের কল্যাণে জানা গেল, এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকটিতে তাঁরা সবাইকে এক জায়গায় নিয়ে এসে আলোচনা করতে অক্ষম। এমন কি নেতৃবৃন্দের বক্তব্য সঠিকভাবে রেকর্ডিং করতেও তাঁরা সিদ্ধহস্ত নন।
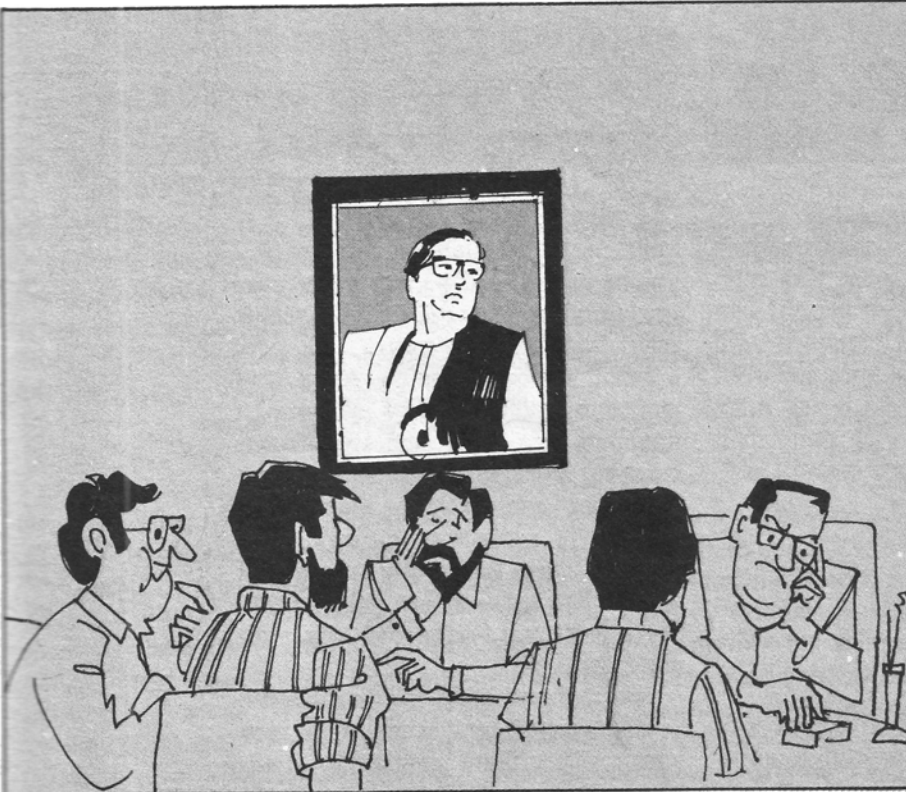
যাক্, বাঁচা গেল-শ্যামলবাবু পারবেন না
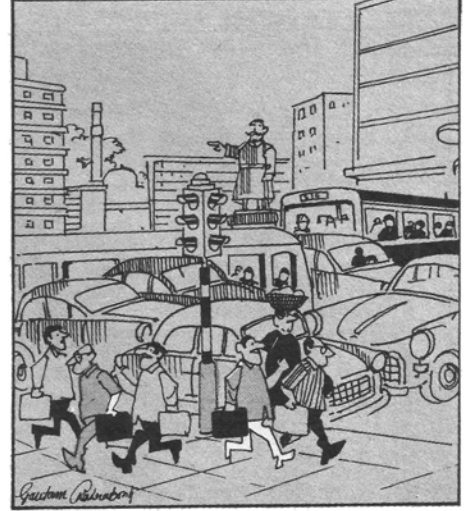
কলকাতার জোঁক হচ্ছে ট্রাফিক-জ্যাম। লাগলে পরে ছাড়বে না। যন্ত্রণায় কঁকাতে থাকবে সারা শহর। এই জোঁক খোলবার জন্যে নিত্যিদিন পুলিশের কত সব মজাদার পরিকল্পনা। চলে এসেছে ওয়ান ওয়ে প্রোগ্রাম। রাস্তার চারদিকে কাছিমের মুণ্ডুর মতন মাথা খাড়া করে থাকে নো–এন্ট্রি। অনেক রাস্তা খোলা তো অনেক রাস্তা বন্ধ। পরিবহন মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী জানান, ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক হল একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা, চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নয়। কিন্তু একথা ঠিক হাজার চেষ্টা করলেও কলকাতার রাস্তার ট্রাফিক জ্যাম দূর করা অসম্ভব। একে রাস্তা সরু, তায় টাকার অভাব। এর ওপর খোঁড়া-খুঁড়ি। খোলামেলা জবানবন্দীর মধ্যে শ্যামলবাবু জানান, ২য় হুগলি সেতুর সংযোগরক্ষাকারী রাস্তা, ব্রীজ, ইত্যাদি করতে হলে প্রয়োজন ১১২ কোটি টাকা। ওই টাকা ১০ বছরেও যোগাড় করা সম্ভব নয়।

তবুও সীমাবদ্ধ অবস্থার মধ্যেই চেষ্টা চলেছে ট্রাফিক সিস্টেমে কিছু পরিবর্তন আনা। যাক্ শ্যামলবাবু স্বীকার করেছেন যে, পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন এই মুহূর্তে সম্ভব নয়।

ট্রাফিক জ্যামের সাম্প্রতিক সমস্যা নিয়ে দূরদর্শনের প্রতিবেদনটিতে কোন বুদ্ধির ছাপ নেই। নেই কোন উজ্জ্বল ফটোগ্রাফির চিহ্নও। যেটুকু আছে তা হল শ্যামলবাবুর খোলামেলা স্বীকারোক্তি। ছোটপর্দায় দর্শকদের লাভ হচ্ছে এইটুকুই। জ্যাম জমুক। দুর্ভোগ বাড়ুক।

তবু শ্যামলবাবু তো বললেন–এ হল পরীক্ষা নিরীক্ষা। সমস্যার সমাধান–দূর অস্ত! সাবাস শ্যামলবাবু। সাবাস ট্রাফিক জ্যাম।

-রণব্রত মুখোপাধ্যায়

স্ত্রীর অভিযোগে কাঠগড়ায় আই এ এস অফিসার সুমন্ত্র চৌধুরী

শিপ্রা চৌধুরী,

কলকাতা ট্রামওয়েজ কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেকটর তথা রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তরের যুগ্মসচিব সুমন্ত্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিচারের আবেদন নিয়ে মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ঘুরে শেষপর্যন্ত আদালতে পৌঁছেছেন তাঁরই স্ত্রী শিপ্রা চৌধুরী। নারী নির্যাতন, ব্যভিচার, লাখো টাকার দূর্নীতি, আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালানের মত মারাত্মক অভিযোগগুলি নিয়ে কেন শ্রীমতী চৌধুরী আদালতে গেলেন ? পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ও প্রশাসন মহল্লার চাঞ্চল্যকর কেলেঙ্কারিতে আলোকপাত।

তারিখটি ছিল এ বছরের জানুয়ারি মাসের বারো তারিখ। এই তারিখেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তরের যুগ্ম সচিব এবং কলকাতা ট্রামওয়েজ কর্পোরেশান এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও আই এ এস সুমন্ত্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী শিপ্রা চৌধুরী একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন। অভিযোগ পত্রটি ছিল এই রকম।

জ্যোতি বসু,
মুখ্যমন্ত্রী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
রাইটার্স বিল্ডিং
কলকাতা

মহাশয়,

যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমি কলকাতা ট্রামওয়েজ কর্পোরেশানের ডিরেক্টর আই এ এস সুমন্ত্র চৌধুরীর বিবাহিতা স্ত্রী। সুমন্ত্রবাবু আমাকে ২৮.১১.৮১ সালে ম্যারেজ রেজিস্টার অনীতা বাগচীর মাধ্যমে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী বিবাহ করেন।

বিয়ের পর থেকে সুমন্ত্রবাবু আমার উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন শুরু করেন। সুমন্ত্রবাবুকে বিয়ে করার আগে আমি ডায়মণ্ড হারবারের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ দাসের স্ত্রী ছিলাম। যখন সুমন্ত্রবাবু ডায়মণ্ড হারবারের এস ডি ও হিসেবে ওখানে নিযুক্ত হন তখন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এরপর দুজনের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে এবং পরিশেষে আমি ডাক্তার দাসের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করে সুমন্ত্রবাবুকে বিয়ে করি।

এখন উক্ত সুমন্ত্র চৌধুরী তাঁর সরকারি ফ্ল্যাট ২৮/১ এ গড়িয়াহাট রোড, ফ্ল্যাট নং ৪০ থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। এবং

তাড়িয়ে দিতে না পেরে অন্য একটি জায়গাতে অন্য আর একজন মহিলার সঙ্গে একত্রে বসবাস শুরু করেছেন। ওই মহিলাটিকে সুমন্তবাবু বিয়ে করতে চান। এই পরিস্থিতিতে আমি নিরাপত্তার অভাব অনুভব করছি কারণ ওই মহিলাটিকে বিয়ে করার জন্য তিনি আমাকে খুনও করতে পারেন। সুমন্ত-বাবু অবৈধ জীবন যাপন করছেন এবং তিনি আমার কাছ থেকে সমস্ত অর্থ ও অলংকার , যা আমার প্রথম স্বামী আমাকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন, সবই নিয়ে নিয়েছেন।

আমি আপনাকে গোটা বিষয়টি তদন্ত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি, সেইসঙ্গে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনি আমাকে রক্ষা করুন, কারণ আমি একজন অসহায় মহিলা এবং সুমন্ত চৌধুরী আপনার অধীনস্থ আই.এ.এস., তদুপরি একজন দায়িত্ব-শীল সরকারি অফিসার বেশ কিছু প্রশ্নযোগ্য মহিলার সঙ্গে মেলামেশা করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপনার বিশ্বস্ত—
শিপ্রা চৌধুরী।

হুবহু প্রতিলিপি দেওয়া হল যথাক্রমে মুখ্য-সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশ কমিশনার, পরিবহন মন্ত্রী, অফিসার-ইন-চার্জ লেক থানাকে।

এই লিখিত অভিযোগ দায়েরের পর শিপ্রা-দেবী গেলেন নিকটবর্তী থানা লেক থানাতে। তিনদিন পর অফিসার ইন-চার্জকে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন। সেই অভিযোগের বয়ান অবশ্য একটু আলাদা। শিপ্রাদেবী ওই অভি-যোগ পত্রের একটি অংশে লিখেছেন, 'মাঝেমাঝে কিছু অচেনা লোক আমার এই ফ্ল্যাটে রাত্রি-বেলাতে আসা শুরু করেছে। আমার স্বামী তাদের পাঠিয়েছেন আমার নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু তাদের আচার আচরণে যথেষ্ট নিরাপত্তার অভাব অনু-ভব করছি। আমি আশঙ্কা করছি উক্ত সুমন্ত চৌধুরী ওইসব লোকেদের দিয়ে আমাদের খুন করাবার চেষ্টা করছেন। আমি বিষয়টি অনু-সন্ধান করার অনুরোধ জানাচ্ছি।...'

এই লিখিত অভিযোগের হুবহু প্রতিলিপি দেওয়া হল কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে।

দ্বিতীয় অভিযোগের পর দেড়মাস কেটে গেল। ইতিমধ্যে শিপ্রাদেবী দেখা করলেন রাজ্যের মুখ্য-সচিবের সঙ্গে। দুটি অভিযোগের কিনারা কিছু হয়েছে কি না শিপ্রাদেবীর জবাবে একেবারেই নীরব রইলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব তরুণ দত্ত। তরুণবাবু কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না। এমন কি লেক থানা থেকেও কোন রকম তৎপরতা দেখা গেল না।

আইনজীবী শিবশংকরের কাছে শিপ্রা দেবী

রাজ্যের পরিবহন দপ্তরের যুগ্ম সচিব, কল-কাতা ট্রামওয়েজ কর্পোরেশানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং প্রাক্তন হাওড়ার জেলাশাসক সুমন্ত চৌধুরীর বিরুদ্ধে স্ত্রী-নির্যাতন, ব্যভিচার ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগেও প্রশাসন নিশ্চুপ দেখে শিপ্রাদেবী দারুণ হতাশ হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে হুমকি চলছে, ফ্ল্যাট থেকে উচ্ছেদের শাসানিও বেড়ে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে। বিপর্যস্ত শিপ্রাদেবী ভেবে পেলেন না তিনি কি করবেন। তবু অপেক্ষা, যদি প্রশাসনের টনক নড়ে। যদি সুমন্ত চৌধুরীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত তদন্তের আদেশ করে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! প্রশাসন থেকে মার্চের পয়লা তারিখ পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

উনিশ শো উনআশি সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি অসহায় ও বিপর্যস্ত শিপ্রাদেবী গেলেন আইনজীবী শিবশংকর চক্রবর্তীর কাছে। মার্চের দুই তারিখে আলিপুরের সাব ডিভিশনাল জুডি-শিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারায় শিবশঙ্করবাবু মামলা দায়ের করলেন।

আদালতের কাছে অভিযোগপত্রে শিপ্রা দেবীর অভিযোগ রীতিমত বিস্ফোরক। শিপ্রার অভিযোগ, 'ডি ১২/৪ করুণাময়ী হাউসিং এস্টেটে ওই ফ্ল্যাটটি আমার প্রাক্তন স্বামী ডাক্তার দাসের টাকায় কিনেছিলাম। সুমন্ত চৌধুরী ওই ফ্ল্যাট বিক্রি করার জন্য আমরা ওপর অত্যাচার শুরু করেন। আমি বাধ্য হয়ে ফ্ল্যাটটি বিক্রি করে ১,৫০০০০ টাকা সুমন্ত চৌধুরীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হই। সুমন্ত ওই টাকার সঙ্গে ঘুষের টাকা যোগ করে ৭ লাখ টাকা দিয়ে ব্রড স্ট্রিটে ২ এইচ নম্বর-একটি ফ্ল্যাট নিজের নামে কেনেন। এই-ভাবে সুমন্ত আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার ফ্ল্যাট বিক্রির টাকা আত্মসাৎ করেছেন।'

বিয়ের পরে শিপ্রাদেবী বুঝতে পারেন সুমন্ত তাঁকে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করতে চান এবং শিপ্রাদেবী প্রতিবাদ করলে তাঁকে মারধোর শুরু করেন সুমন্ত। শিপ্রাদেবীর অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে তিনি লক্ষ্য করেন যে মাঝেমাঝে তাঁর স্বামী রাত্রে বাড়ি ফেরেন না। এবং বিভিন্ন ধরনের মেয়েদের সঙ্গে তিনি রাত কাটান। উক্ত মহিলাদের এবং হোটেলে থাকা খাওয়ার খরচ নাকি বহন করতেন ট্রাম কোম্পানির ঠিকেদাররা। মাঝে মাঝে সুমন্ত ওইসব মহিলাদের সঙ্গে বাড়িতে রাত কাটাতে চাইতেন। শিপ্রাদেবী বাধা দিলে তাঁকে মারধোর করা হত। ১৯৮৪ সালে সিঙ্গাপুর থেকে সুমন্ত একটি রিভলভার কেনেন এবং এখানে তা কালোবাজারে বিক্রি করে দেন। সুমন্তবাবু বেআইনি অস্ত্র লেনদেনে জড়িত বলেও শিপ্রাদেবী অভিযোগ করেন। শিপ্রার অভিযোগ সুমন্ত তাঁকে বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখাতেন যে শিপ্রা যদি তাঁকে মিউচুয়াল ডিভোর্স না দেন, তাহলে তিনি শিপ্রাকে খুন করবেন। কারণ যে মেয়েটিকে নিয়ে সুমন্ত থাকতেন, তাকে নাকি তিনি বিয়ে করতে চান। মেয়েটির নাম সুনীতা, হাওড়ার বাসিন্দা। অভি-যোগে শিপ্রা বলেছেন, সুমন্ত ঘুষের টাকায় ল্যান্স-ডাউন পোস্ট অফিস থেকে কেনা ইন্দিরা বিকাশ পত্রগুলি নিজের লকারে রেখে দেন। যার আনুমানিক মূল্য ৭ লাখ টাকা। তাঁর অভিযোগ, সুমন্ত ঘুষের টাকায় বেশ্ কিছু সোনা, সল্টলেকে জমি ও দুটি ফ্ল্যাট কিনেছেন।

আদালতে মামলা রুজু করার আগে শিপ্রা-দেবী এই প্রতিবেদকের কাছে সুমন্তবাবুর বিরুদ্ধে যেসব লিখিত অভিযোগ করেন সেগুলি আরও বিস্ফোরক সর্বতোভাবে একসক্লুসিভ। শিপ্রাদেবীর

HIGH COMMISSION OF INDIA
31, GRANGE ROAD,
KILLINEY ROAD, P. O. 92,
SINGAPORE

Dated 10th August, 1984

SIN/COM/206/2A/84

Shri Sumantra Choudhury,
District Magistrate,
Howrah

Dear Sir,

Please refer to your letter dated 27th July, 1984 regarding import of a Revolver from Singapore.

This Mission issues a 'No objection' letter to the authorities concerned in Singapore for an Indian national to import a firearm from Singapore if he calls at this Mission on any working day between 9.00 a.m. and 12.30 p.m. with his valid Arms Licence and Indian Passport. The Indian national should also give a Declaration as in the form enclosed before the Consular Officer in this Mission. The consular fee for the Declaration is S$9.00.

If you are unable to visit Singapore, you may obtain a Customs Clearance Permit from the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi & place your order directly with the fire-arm dealer in Singapore.

(... Ganapathi)
First Secretary (Commercial)

বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহের আদেশপত্র

শিপ্রা চৌধুরীর লিখিত অভিযোগ

স্বাক্ষরিত ওই অভিযোগগুলি এই প্রতিবেদককে দেওয়া হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি। শিপ্রাদেবীর অভিযোগ, ১৯৭৬ সালে সুমন্ত চৌধুরী ডায়মণ্ড হারবারের এস ডি ও হিসেবে নিযুক্ত হন। সেই সময় শিপ্রা দেবী ছিলেন ডায়মণ্ড হারবারের প্রথিতযশা ডাক্তার এ দাসের স্ত্রী। সুমন্ত ছিলেন দাস পরিবারের পারিবারিক বন্ধু। সেই সূত্রেই সুমন্তর সঙ্গে শিপ্রার পরিচয় হয়। দুজনের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হলে এবং ব্যাপারটি জানতে পেরে ডাঃ দাস আপত্তি করলে সুমন্ত তাঁকে আমতলায় তাঁর বডিগার্ড রবির বাড়িতে সারারাত রেখে দেন। পরের দিন তিনি পার্কস্ট্রীটের ওয়াই.ডব্লু.সি.এ তে শিপ্রাকে রেখে দেবার পরেই শিপ্রার দাদারা অপহরণের মামলা দায়ের করেন। রাত দেড়টায় পার্ক স্ট্রীট থানার ও সি, এস ডি পি ও ও এস.ডি.ও, ডায়মণ্ড হারবার এর উপস্থিতিতে আবার শিপ্রা ডায়েরি করেন যে এস.ডি.ও ডায়মণ্ড হারবার তাকে ফুঁসলিয়ে আনেন নি। এই ডায়েরিটা সুমন্ত নাকি শিপ্রাকে জোর করিয়েই করান। ডায়রি করার পরই শিপ্রা দাদাদের কাছে ফিরে যান। এরপর সুমন্ত তাঁকে দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করান। বাঁচানোর জন্য সুমন্তবাবু শিপ্রাকে মহাকরণে তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র সচিব ও মুখ্যসচিব অমিয় সেনের কাছে নিয়ে যান। সেখানে শিপ্রা দুই সচিবকে গিয়ে জানান যে সুমন্ত নির্দোষ। সেই সময় বিধানসভাতে সত্যরঞ্জন বাপুলি, কংগ্রেস বিধায়ক, এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে যে, কি ভাবে একজন এস.ডি.ও এ ধরণের কাজ করেন। বাপুলির প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতি বসু জানান যে বিষয়টি বিচারাধীন। এই কথা বলে তিনি প্রশ্ন এড়িয়ে যান। বিধানসভার এই খবরটি আকাশবাণী থেকেও প্রচারিত হয়েছিল!

অভিযোগ উঠেছে, ট্রাম কর্পোরেশানে যোগ দিয়ে সুমন্ত পীযুষ দে–কে সরিয়ে ট্রামের লাইন পাতার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা কন্ট্রাক্ট দেন বিভিন্ন লোকেদের। এদের মধ্যে কাজল সেনগুপ্ত নামে জনৈক ঠিকেদারকে বেহালা থেকে জোকা পর্যন্ত ট্রাম লাইন পাতার ঠিকে দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা সুমন্ত আত্মসাৎ করেন।

এই প্রতিবেদকের কাছে লিখিত অভিযোগ-পত্রে শিপ্রা চূড়ান্ত অভিযোগ জানালেন ফেব্রুয়ারি মাসের চব্বিশ তারিখে। শিপ্রাদেবী জানালেন, সুমন্ত চৌধুরীকে পুরোপুরি মদত যোগাচ্ছেন বামফ্রন্টের পরিবহন মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী! শিপ্রাদেবী লিখিতভাবে জানিয়েছেন 'পরিবহনমন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তীর ছত্র–ছায়ায় থেকে সুমন্ত পরিবহনের পাবলিক ভেহিকল বিভাগে যথেচ্ছাচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এই বিভাগে তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন।' সুমন্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে শ্যামলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তিনি নাকি 'ইচ্ছাকৃতভাবেই' দেখা করতে চাননি। মুখ্যসচিবকে সুমন্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বলিত চিঠি দিলে সেই চিঠিও নাকি সুমন্তর হাতেই তিনি দিয়ে দেন। 'কোন অ্যাকশান নেন নি।'

অভিযোগ উঠেছে, ট্রাম কর্পোরেশানে যোগ দিয়ে সুমন্ত পীযুষ দে–কে সরিয়ে ট্রামের লাইন পাতার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা কন্ট্রাক্ট দেন বিভিন্ন লোকেদের। এদের মধ্যে কাজল সেনগুপ্ত নামে জনৈক ঠিকেদারকে বেহালা থেকে জোকা পর্যন্ত ট্রাম লাইন পাতার ঠিকে দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা সুমন্ত আত্মসাৎ করেন। জনৈক শান্তি সারোগীকেও

সুমন্ত চৌধুরী, সঙ্গে স্ত্রী শিপ্রা

ঠিকে দিয়ে নাকি প্রচুর টাকা হাতিয়ে নেন সুমন্ত। এই রকম বেশ কিছু ঠিকেদারকে ঠিকে পাইয়ে দিয়ে সুমন্ত ফুলে ফেঁপে ওঠেন বলে ওই লিখিত অভিযোগ পত্রে শিপ্রা অভিযোগ করেছেন ।

শিপ্রা পেশ করা অভিযোগ পত্রে জানিয়েছেন যে সুমন্তই একমাত্র আই.এ-এস যার নামে সব থেকে বেশি বার ট্যুরিস্ট লজ বুক করা হয়। দিল্লির বঙ্গভবনে সুমন্তর নামে বুকিং করা হলেও তিনি অন্যান্য প্রাইভেট হোটেল বা কোম্পানির গেস্ট হাউসে অন্য মহিলাকে 'শ্রীমতী চৌধুরী' পরিচয় দিয়ে প্রায়ই থাকেন

গুরুতর অভিযোগ উঠেছে বে-আইনি অস্ত্র লেনদেনেরও । ১৯৮৪ সলে সুমন্ত একটি বিদেশি রিভলবারের লাইসেন্স করিয়ে রিভলবারটি কিনে জনৈক কাশীনাথ সারোগীকে বিক্রি করে দেন । ১৯৮৯ সালে হাওড়া থেকে জেলা শাসক দীপংকর মুখার্জির মাধ্যমে ভারতীয় রিভলবারের লাইসেন্স করিয়ে নেন । শিপ্রা সরাসরিই বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র লেনদেনের অভিযোগ করেছেন সুমন্তর বিরুদ্ধে । কাশী সারোগীর পরিচয় প্রসঙ্গে শিপ্রা বলেছেন, কাশী সারোগী বাসের পারমিট, বিদেশি রিভলবার তথা বহুতল বাড়িতে জলের লাইন বসানোর কার-বার করে থাকেন । সারোগীর পেছনে রয়েছেন স্বয়ং সুমন্ত চৌধুরী ।

যার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ, সেই বিতর্কিত আই এ এস, পরিবহন দপ্তরের যুগ্ম সচিব ও কলকাতা ট্রামওয়েজ কর্পোরেশান এবং এক

গুরুতর অভিযোগ উঠেছে বে–আইনি অস্ত্র লেনদেনেরও। ১৯৮৪ সালে সুমন্ত একটি বিদেশি রিভলবারের লাইসেন্স করিয়ে রিভলবারটি কিনে জনৈক কাশীনাথ সারোগীকে বিক্রি করে দেন। ১৯৮৯ হাওড়া থেকে জেলা শাসক দীপংকর মুখার্জির মাধ্যমে ভারতীয় রিভলবারের লাইসেন্স করিয়ে নেন। শিপ্রা সরাসরিই বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র লেনদেনের অভিযোগ করেছেন সুমন্তর বিরুদ্ধে।

সময়ের জেলা শাসক সুমন্ত চৌধুরী ক্লাস এইট পর্যন্ত কলকাতাতে পড়াশুনো করেন । এরপর আসামে চলে যান। সেখান থেকে স্নাতক পরীক্ষায় পাশ করেন। এম এস সি পাশ করেছেন–গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর আই এ এস পরীক্ষায় পাশ করেন ১৯৭৪ সালে। আই এ এস পরীক্ষায় বসা নিয়েও সুমন্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। আই এ এস এ তিনি ক্যাডার ছিলেন মণিপুরের। ক্যাডারশিপ পরিবর্তন করতে তিনি দিল্লিতে ছুটে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের স্ত্রী মায়া রায়ের কাছে। তদবির তদারক শেষ পর্যন্ত সফল হয়। সুমন্তর ক্যাডার চেঞ্জ হয়ে যায়। প্রথম পোস্টিং হয় ডায়মণ্ড হারবারে। সুমন্ত প্রথমবারেই ডায়মণ্ড হারবারের এস.ডি.ও পদে নিযুক্ত হন।

সুমন্তর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ , হাওড়াতে জেলা শাসক থাকাকালীন সুমন্ত বহু নতুন রুট খুলে, নতুন বাসের পারমিট দিয়ে দুর্নীতি করেছেন।

মার্চের দু তারিখে সকাল সাড়ে দশটার সময় শিপ্রাদেবীর তরফে আইনজীবী ১৬৩ (৩) ধারায় সাব ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সুভাষ রায়ের এজলাসে পিটিশান দায়ের করেন। পিটিশান পেশের পরে শিপ্রাদেবীকে আদালতের সামনে হাজির করা হয়। পিটিশন পেশ করার পর বিষয়-টিকে তদন্ত করার নির্দেশ দেন লেক থানার ও সি কে ম্যাজিস্ট্রেট সুভাষ রায়। পরের দিন কলকাতার কয়েকটি দৈনিক পত্রে সে সংবাদ অর্থাৎ আদালত সংবাদটি প্রকাশিত হয় ।

এই প্রতিবেদক মাচ মাসের তিন তারিখে লাল বাজারে পুলিশ কমিশনারকে টেলিফোন করলে লালবাজার থেকে জানানো হয় যে কমিশনার বাইরে গিয়েছেন, পরে টেলিফোন করুন । লালবাজার থেকে প্রাপ্ত লেক থানার টেলিফোন নাম্বার ৪৬-০৭৮৩ এ টেলিফোন করলে এনগেজড টোন পাওয়া যায়। ১২–৪৫ নাগাদ টেলিফোন করলে কর্তব্যরত অফিসার জানান যে তিনি রাউণ্ডে বেরিয়েছেন । এক ঘন্টা পরে টেলিফোন করুন। ওই অফিসারকে এই প্রতিবেদক নিজের পরিচয় দিলে বলেন ও সি কে যেন প্রতিবেদকের নাম কাগজের নাম জানানো হয়। এরপর পুলিশ কমিশনারকে ১২–৫০ মিনিটে ফোন করা হলে জানানো হয়, সি পি একটু বেরিয়ে-ছেন। পরে খোঁজ করুন । ১–৪০ শে আবার টেলিফোন করি নিজের পরিচয় দিয়ে । তখনও একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়। এদিকে পরিবহন মন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তীকে টেলিফোন করলে তিনি সুমন্ত চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলার ব্যাপারে জানালেন, 'আমার কোন প্রতিক্রিয়া নেই । আমার আবার কিসের প্রতিক্রিয়া হবে ?'

আলোকপাত : সুমন্তবাবু আপনার অধীন ক্যাল-কাটা ট্রামওয়েজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর...'

শ্যামলবাবু তাতে কি হয়েছে । ওটা কোর্টের ব্যাপার ।

পরে লেক থানার ও.সি. এই প্রতিবেদককে জানান যে 'প্রেস' কে কিছু বলা বারণ। এসব ওপর মহলের ব্যাপার। আপনি সি.পি.র সঙ্গে কথা বলুন। মামলার খবর কাগজে প্রকাশিত হবার পর রাজ্যের মুখ্যসচিবকে প্রশ্ন করা হলে সাংবাদিকদের জানান তিনি বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন ।

ছবি বিকাশ চক্রবর্তী **মণিশংকর দেবনাথ**

বাটারফ্লাই বালক

'এই রবার স্রাইভার এফ এক্স ব্যবহার করে তোমার খেলা আরও উন্নত করো।' ভারত জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন, এশিয়ান জুনিয়র টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট খেলোয়াড় অরূপ বসাক-এর হাতে স্রাইভার এফ এক্স রবার তুলে দিয়ে কথাগুলি বললেন মিঃ হিদেফী চিবা, যিনি পৃথিবী বিখ্যাত তামাসু কোম্পানির (জাপান) প্রতিনিধি রূপে ভারতে এসেছিলেন ৪র্থ জুনিয়র এশিয়ান টেবিল টেনিস–এর আসরে। তামাসু কোম্পানি টেবিল টেনিস সরঞ্জাম প্রস্তুত করে। এই কোম্পানির তরফ থেকে মিঃ চিবা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে অরূপ তার প্রয়োজনীয় রবার ও সরঞ্জাম পাবে, যদি আরও ভাল খেলতে পারে।

জুনিয়র ভারত চ্যাম্পিয়ন অরূপ এখন খেলে ইয়াসাকা মার্ক ফাইভ রবারে। এই রবার সহজলভ্য (মোটামুটি) বলেই অন্য অনেকের মত অরূপও প্রথম থেকে এই রবার ব্যবহার করে।

তামাসু কোম্পানির বাটারফ্লাই ব্র্যান্ড স্রাইভার রবার পৃথিবীর টেবিল টেনিস রবারগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। একটি ছোট্ট পরিসংখ্যান দিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে যে সারা পৃথিবীর খেলোয়াড়দের মধ্যে (ডর্টমুণ্ড বিশ্ব আসর পর্যন্ত) পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে যে প্রায় ৪৩.৩ শতাংশ খেলোয়াড়রা ব্যবহার করেন এই বাটারফ্লাই ব্র্যান্ড রবার। কিন্তু কেন ? বাটারফ্লাই ও তামাসু

তামাসু বাটারফ্লাই–এর কর্তারা

টেবিল টেনিসের কিংবদন্তী কোম্পানী 'বাটারফ্লাই' বাংলার যে খেলোয়াড়কে বিরল পৃষ্ঠপোষণার সুযোগ দিয়েছে তার কৃতিত্বের সুবাদে,সেই উদীয়মান তরুণ টেনিস–খেলোয়াড় অরূপ বসাকের অজানা কথা ব্যক্ত করেছেন প্রখ্যাত টেবিল টেনিস কোচ সুনীল দত্ত।

কোম্পানি এবং তাদের সরঞ্জাম, ট্রেনিং সেন্টার ও গবেষণা বিষয়ে কিছু বললেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। তার আগে শুধু এটকুই বলা যাক সে বর্তমান অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন উ নাম কু, ইয়ং ইয়ং জা, হুয়াং জুং হাওয়া ব্যবহার করেন স্রাইভার এবং সোল অলিম্পিক থেকে বাটারফ্লাই রবার ব্যবহার করে খেলোয়াড়রা তুলে নিয়েছেন দু'টি স্বর্ণ, দু'টি রৌপ্য ও দু'টি ব্রোঞ্জ পদক।

বাটারফ্লাই ব্র্যান্ড রবার আছে বহু রকমের ও বহু চরিত্রের এবং আছে বিভিন্ন খেলোয়াড়ের নিজস্ব মানসিকতা ও স্টাইল অনুযায়ী খেলার জন্য। 'বাটারফ্লাই দোজো' তামাসু কোম্পানির এই ট্রেনিং সেন্টারে পৃথিবীর ২৩টি দেশের ৯০ জন খেলোয়াড় গত ছয় বছরে বিভিন্ন সময়ে ফিজিক্যাল ও মেন্টাল প্র্যাকটিস-এর জন্য এসেছেন।

তামাসু কোং-এর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হলেন মিঃ ডিক ইয়ামোখা যিনি প্রাক্তন নাসা ইঞ্জিনিয়ার এবং এর মূল স্থপতি হলেন মিঃ হিতোসুকি তামাসু যিনি নিজেও এক সময় ছিলেন তারকা খেলোয়াড়! তামাসু কোম্পানির সঙ্গে জড়িত আছেন প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মিঃ এন হাসেগাওয়া ও মিঃ এস ইটো।

তামাসু কোম্পানির বাটারফ্লাই ব্র্যান্ড রবারগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো স্রাইভার। এই স্রাইভার দু'রকমের 'এল' যা লুপ এর জন্য। এর পিম্পল হয় 'ভার্টিক্যাল' এবং 'এস' অর্থাৎ স্পীড যার পিম্পল হয় 'হরাইজনট্যাল'। বিভিন্ন পুরুত্বে পাওয়া যায় এই স্রাইভার এবং পাওয়া যায় বিশেষ স্পঞ্জ কাওয়াত সুকি দেওয়াও। আধুনিকতম হলো স্রাইভার এফ এক্স যা ব্যবহার করেন বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় বেশ কিছু খেলোয়াড় যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পুরুষদের মধ্যে পোল্যান্ডের আন্দ্রেজ গ্রুব্বা, রাশিয়ার মাঝুনভ ভ্রাতৃদ্বয়, দঃ কোরিয়ার ইয়ু নাম কু, ইংলন্ডের ডেসমণ্ড ডগলাস, অ্যালান কুক; চেকোস্লোভাকিয়ার জি স্প্যানস্কি, যুগোস্লাভিয়ার প্রিমোরাক ইত্যাদিরা এবং মেয়েদের মধ্যে ইয়ং ইয়ং জা, হুয়াং জুঃ হাওয়া, এডিট উরবান, বুলাটোভা, মারিয়া হ্যাকোভা ইত্যাদিরা।

বাটারফ্লাই অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় রবার হল ট্যাকি নাস (ড্রাইভ ও চপ), সুপার স্রাইভার, টেমপেস্ট, ইমপারশিয়াল, চ্যালেঞ্জার, ফ্রাউলিন, ফেল্ট (সফট ও লং), অ্যাবসরকার, সুপার অ্যান্টি ইত্যাদি। ১৯৯০ এর আধুনিকতম রবার বেরুচ্ছে বাটারফ্লাই ল্যাব থেকে যাদের নাম হল সেলভিড, রেনোভা, ফ্লেক্রুসট্রা, রেসিলন।

বাটারফ্লাই রবার-এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্পিন (বলের পাক) ধরাতে সক্ষম হল ট্যাকিনাস 'ডি' (দশ একক) ও সবচেয়ে স্পিড হল স্রাইভার এর (দশ একক) এবং আধুনিকতম রবার সেলভিড দু'টিতেই শীর্ষে অর্থাৎ এর স্পিড ও স্পিন দুই-ই দশ।

বাটারফ্লাই কম্বিনেশন ব্যাটের খেলোয়াড়দের জন্য অ্যান্টি স্পিন, রিভার্স স্পিন ও সর্ট পিপস্ তিন ধরনের রবারই তৈরি করে। ফিল্ট লং হল এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী যার পিম্পল হলো ১.৭ কি.মি. উচ্চতা সম্পন্ন।

বাটারফ্লাই ব্লেড (ব্যাটের কাঠ) ব্যবহার করেন পৃথিবীর প্রায় ৪০ শতাংশ খেলোয়াড়। ব্যাটের কাঠ তৈরির ব্যাপারে বাটারফ্লাই প্রায় বিপ্লব এনে ফেলেছে। বিভিন্ন ধরনের ব্লেড তৈরি করে যা স্পিড, স্পিন, কনট্রোল এর সুষম সমন্বয়ে তৈরি। ডিফেন্স, অলরাউন্ড (–), অলরাউন্ড, অলরাউন্ড(+), অফেনসিভ(–), অফেনসিভ, অফেনসিভ(+) ও পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দ্রুতগামী ব্লেড কার্বন সিরিজ।

কার্বন ব্লেড অর্থাৎ প্লাইউড এবং কার্বন ফাইবার রেইনফোর্সও প্লাস্টিক এর প্রযুক্তি ঘটিয়ে তৈরি হয়েছে কার্বন ব্লেড। ইস্পাত এর থেকে ৭ গুণ মজবুত ও ৫ গুণ হাল্কা এই কার্বন ফাইবার রেইন ফোর্সও প্লাস্টিক (যা ব্যবহৃত হয় মহাকাশযান-এর বহিরাবরণ তৈরির জন্য) এবং দু'টি কার্বন শীট ও তিনটি প্লাইউড (হিনোকি) দিয়ে তৈরি হয় আধুনিক কার্বন ব্লেড। কার্বন ব্লেড-এর নাম হল সরডিয়াস, ওবেরন, গার্গেলী, ক্লাম্পার, স্রুনা (কম্বিনেশন খেলোয়াড়দের জন্য), অ্যালুর; পেন হোল্ডারদের জন্য কার্বন ব্যাট হল : প্রিভিস;

'দোজো'-র প্রধান কোচ এইচ. হিরাওয়া

রিপালস; চাইনিজ; স্যাফিরা আর; এওলাস, আয়োলাইট।

কার্বন ব্লেড অর্থাৎ ট্যামকা ব্যবহার করেছন যে খেলোয়াড় প্রচণ্ড স্পিড ও স্পিন-এ খেলতে চান। কোরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদিরা ব্যবহার করেন এই ট্যামকা ব্লেড।

বাটারফ্লাই-এর অন্যান্য ব্লেড এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'ফ্যালনেকস্', পাওয়ার ড্রাইভ গ্র্যান্ডিস, ফায়ারহ্যান্ড, পাওয়ার এফ এল, কেনী, জনিয়র এইচ (হিনোকি), ক্লাম্পার এইচ ইত্যাদি।

টেবিল টেনিস খেলোয়াড়রা যে যেমন স্টাইলে খেলা পছন্দ করে অর্থাৎ মানসিকতা অনুযায়ী ও খেলার স্টাইল অনুযায়ী নিজের পছন্দ মত রবার যাতে বেছে নিতে পারে তার জন্য নিত্য রিসার্চ চলছে বাটারফ্লাই গবেষণাগারে।

বাটারফ্লাই দোজো

টেবিল টেনিস–এ এখন বিজ্ঞানভিত্তিক যুগ এবং বাটারফ্লাই তাই বিভিন্ন সরঞ্জাম প্রস্তুত করে যাতে খেলাটি আরও নিখুঁত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক হয় এবং খেলোয়াড়দের সুবিধা হয়। যেমন হল সুপার চাক্ গ্লু। এটি ব্যাটে রবার লাগানর আঠা। এই আঠার বৈশিষ্ট্য হল তা রবারের স্থিতিস্থাপকতা অক্ষুণ্ণ রাখে এবং পারফেক্ট বাউন্সে সাহায্য করে। এই সুপার চাক্ ব্যবহার করেন পৃথিবীর সমস্ত শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়রা। ম্যাচের ঠিক আধঘন্টা আগে লাগাতে হয় এই আঠা। এছাড়াও আছে রবারের ওপর থেকে জমা সূক্ষ্ম ধূলিকণা। পরিষ্কার করার জন্য রবার ক্লীনার ফোম ১৬৫। টেবিল টেনিস ভীষণ সূক্ষ্ম খেলা, ব্যাটের রবার যদি ধূলা ময়লা পড়ে অপরিষ্কার হয় তবে তা বল ঠিক ভাবে গ্রিপ করতে পারবে না ফলে বলে স্পিন ঠিকভাবে করান যাবে না। ফোম রবার ক্লীনার রবারের লুকান ময়লা পরিষ্কার করে তার গ্রিপ আবার ফিরিয়ে আনে। ব্যাট পরিষ্কার করে তা এমনি রেখে দিলে রবারের উচ্চ ঘর্ষণ ক্ষমতা শক্তির জন্য বাতাসের সূক্ষ্ম ধূলিকণা রবারের পরে আপনা আপনি জমে যায় তাই তা প্রতিরোধ করার জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে রবার ফিলম। অতি পাতলা এই রবার ফিলম ব্যাটের রবার–এর পরে লাগিয়ে রেখে দিলে তেল, জল, ধূলো, ময়লা যা বাতাসে মিশে আছে তা রবারের ক্ষতি করতে পারে না।

বাটারফ্লাই এর নিজস্ব ট্রেনিং সেন্টার হল 'বাটারফ্লাই দোজো'। ১৯৮৩ সালে এই ট্রেনিং সেন্টার তৈরি হয়। এখানে চীফ কোচ হলেন মিঃ এইচ হিরাওখা ও তাঁর সঙ্গীরা হলেন প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মিঃ এন হাসেগাওয়া ও মিঃ এস ইটো এবং রয়েছেন মিঃ ওয়াই শিবুতানি। এই ট্রেনিং সেন্টারে রয়েছে আটটি টেবিল, পাঁচটি ভিডিও ক্যামেরা। হাজারের ওপর ভিডিও ফিল্ম রয়েছে ট্রেনিং এর সুবিধার্থে, রয়েছে থ্রি ডায়মেনসন ভিডিও এবং রয়েছে ক্যামেরা হাইক্যাম যা সেকেণ্ড–এ ৪৪,০০০ ছবি তুলতে সক্ষম। এই হাইক্যাম ক্যামেরা দিয়েই মাপা হয় খেলোয়াড়দের পাঠান বল–এর স্পিড ও স্পিন। বাটারফ্লাই রোবটও আছে এখানে যাতে খেলোয়াড়রা ক্রমশ নিজের খেলার স্পিড বাড়াতে সক্ষম হন। এখানে আরও রয়েছে মিউজিয়াম যাতে ১০০ বছরের পুরনো দিনের ব্যবহৃত ব্যাটও রাখা আছে।

তামাসু বাটারফ্লাই এই প্রথম ভারতের কোন খেলোয়াড়কে সরাসরি সাহায্য দিল এবং ভবিষ্যতেও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল। মিঃ হিদেফী চিবা আরও বলেন অরূপ বসাক এর বাটারফ্লাই দোজো তে ট্রেনিং পাওয়ার ব্যাপারে তিনি সাহায্য করবেন।

বাটারফ্লাই দোজো তে রয়েছে অত্যাধুনিক ট্রেনিং–এর ব্যবস্থা। ৩৯তম বিশ্ব টেবিল টেনিস–এর আসরে যখন পোল্যাণ্ডের আন্দ্রেজ গ্রুব্বার একটি সাক্ষাৎকার নিই তখন গ্রুব্বা বলেন যে তিনি বাটারফ্লাই –এ থাকাকালীন দৈনিক ছয় ঘন্টা প্র্যাকটিস করতেন যা তাঁকে বহু উপকৃত করেছে।

বাংলার তথা ভারতের খেলোয়াড় অরূপ বসাক যে সুযোগ পেয়েছে তা কি কাজে লাগাবে? বাটারফ্লাই–এ ট্রেনিং নিতে গেলে অরূপকে যাতায়াত ভাড়া ও খাওয়ার খরচ বহন করতে হবে। ট্রেনিং ও থাকা ফ্রি। এটা ঘটনা যে অরূপ যে রবার পেয়েছে (স্রাইভার এফ এক্স) তা বিশ্ব সেরা এবং এটিও সত্য যে বন্দুক হাতে থাকলেই হয় না তা চালাতে জানাও চাই। হাঙ্গেরীর ইস্তভান ইয়নিয়র এই স্রাইভার দিয়েই ৯০০০ আর পি এম স্পিন করান এবং ১৯৭৫–এ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন ভারতে (কলকাতার আসরে), ১৯৮৮–এর বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন আন্দ্রেজ গ্রুব্বাও খেলেন এই রবারেই, ১৯৮৮ সিওল অলিম্পিক পুরুষ সিঙ্গলস–এর স্বর্ণপদক জয়ী উ নাম কু খেলেন স্রাইভার–এ। সেই একই রবার আজ অরূপ–এর হাতে কিন্তু যথার্থ প্রায়োগিক কৌশল অধিগত করতে হলে তো চাই সঠিক প্রশিক্ষণ এবং যাঁরা এই রবারের নির্মাতা তাঁরই স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন তাঁদের ট্রেনিং সেন্টারে। এই রবারের যথার্থ প্রয়োগবিদ্যা অধিগত করতে এর থেকে বড় সৌভাগ্য আর কিইবা হতে পারে? জাপানে এর আগে বাংলার যে খেলোয়াড়রা প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছেন (নূপুর সাঁতরা, গণেশ কুণ্ডু, দেবাশিস চৌধুরী) তাঁরা সকলেই গিয়েছেন ওগিমুরা ট্রেনিং সেন্টারে, কিন্তু বাটারফ্লাই দোজো কেউই যান নি।

অরূপকে বাটারফ্লাই দোজোতে ট্রেনিং এর জন্য সবুজ সংকেত পেতে হবে টেবিল টেনিস ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার, প্রয়োজন অর্থের। ভারতীয় টেবিল টেনিসের কর্ণধাররা এবং বাংলা টেবিল টেনিস–এর কর্তারা কি এগিয়ে আসবেন অরূপ এর ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে? বিশ্বমানের সেরা রবার স্রাইভার বাটারফ্লাই–এর আনুকূল্য আজ অরূপ এর হাতে কিন্তু সেই রবারের সঠিক প্রয়োগকৌশল জেনে তা প্রয়োগ করে বিশ্বমানে পৌঁছতে প্রয়োজন সঠিক প্রশিক্ষণ।

অরূপ–এর মধ্যে লুকানো প্রতিভা যা আজ তাকে ভারত চ্যাম্পিয়ন করেছে তাকে সঠিক লালন পালন যদি এখন থেকেই করা যায় তবে কে বলতে পারে অদূর ভবিষ্যতে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন এর বা বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন–এর রবার ও সরঞ্জাম সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে শিখে এসে অরূপ ভারতীয় টেবিল টেনিসকে বিশ্ব আঙ্গিনায় একটি মানে পৌঁছে সম্মান বাড়াবে না?

তামাসু কোম্পানির আনুকূল্যে অরূপ বসাক আরও এগোতে পারে এই আশা রাখা যায়। এখন দায়িত্ব ভারতের টেবিল টেনিস কর্মকর্তাদের ও বাংলা টেবিল টেনিস কর্মকর্তাদের অরূপকে 'বাটারফ্লাই দোজো' পাঠানর জন্য। বাটারফ্লাই দোজো ঘুরে এসে অরূপ যে বিশ্বমানে যাওয়ার পথে আরও কয়েক পা এগিয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য। আর শুধুমাত্র কমলেশ মেহতা (বিশ্বের ৭৮ নম্বর) ছাড়া যখন বিশ্বের প্রথম ১২০ জন খেলোয়াড়ের মধ্যেই ভারতের কেউ নেই তখন এ ধরনের পড়ে পাওয়া সুযোগ নষ্ট যদি হয় তবে এটুকুই বুঝতে হবে যে ভারতের খেলোয়াড়দের বিশ্বমানে দেখার স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থাকবে। অরূপকে জাপানের বাটারফ্লাই দোজোর পথে এগিয়ে দেওয়ার জন্য ভারতের টেবিল টেনিস অনুরাগী মাত্রেই শুভকামনা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন এটাই আশা করি।

তামাসু কোম্পানির আনুকূল্যে অরূপ বসাক আরও এগোতে পারে এই আশা রাখা যায়। এখন দায়িত্ব ভারতের টেবিল টেনিস কর্মকর্তাদের ও বাংলা টেবিল টেনিস কর্মকর্তাদের অরূপকে 'বাটারফ্লাই দোজো' পাঠানর জন্য। বাটারফ্লাই দোজো ঘুরে এসে অরূপ যে বিশ্বমানে যাওয়ার পথে আরও কয়েক পা এগিয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

ট্রেন টিকিট পরীক্ষকদের মধ্যে রেকর্ড সৃষ্টিকারী স্বপন, জরিমানা আদায়ে প্রথম হয়েও কেন ভারতীয় রেলের মধ্যেকার চক্রের পাল্লায় পড়ে শিকার হচ্ছেন চক্রান্তের? স্বপনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারের প্রেক্ষাপটে তথ্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন।

ছবি : বিকাশ চক্রবর্তী

সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে লাইনে ই.এম.ইউ. লোকালে জরিমানা আদায় করছেন স্বপন

ট্রেন টি·টি·ই-র দুঃখ!

চৈত্র মাসের প্রথম দিন। হাওড়া স্টেশনের দশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে একশো একুশ নম্বর লোকাল ট্রেনটি সিগন্যাল পেতেই প্ল্যাটফর্ম ছাড়লো। প্রথম শ্রেণীর বগিতে একটি সিটও ফাঁকা নেই। দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীদের মধ্য থেকে সুঠাম চেহারার একজন এগিয়ে এলেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন। ট্রেনের স্পিড বেড়ে যেতেই ব্যাগ থেকে একটি কালো কোট বের করে নিলেন। কোটের বুক পকেটের ওপর ব্যাচ। তাতে লেখা রয়েছে—ট্রাভেলিং টিকিট এগজামিনার। নেমপ্লেটে লেখা এস.কে. খুটিয়া, টি টি ই সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে। ঘড়িতে তখন দুপুর দুটো ত্রিশেরও বেশি। শুরু হয়ে গেল বিনা টিকিট যাত্রী পাকড়াও অভিযান। কিছুক্ষণের মধ্যেই একে একে তিনজন ধরা পড়লেন,। একজনকে পাকড়াও করা হল সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কেটে ফার্স্ট ক্লাসের কামরায় চড়ার অপরাধে। বাকী দুজন বিনা টিকিটের যাত্রী। এবার সহকারীদের নিয়ে চেকার নেমে পড়লেন রাম-রাজাতলায়। এই প্রতিবেদকও নেমে পড়লেন রামরাজাতলা স্টেশনে।

কোর্টের নেমপ্লেটের নাম ও পদের মর্যাদা লেখা আছে। তাই সরাসরি 'মি.খুটিয়া' বলেই আলাপ জমালাম। তিরিশ বছরের এই যুবক চাকরিতে ঢোকেন ২৪।১৯৮৪-তে। পোস্টিং মেচেদা রেলওয়ে স্টেশনে টি.সি. (টিকিট কালেকটর) হিসেবে। ওখান থেকে ৯.১০.৮৭ তে টি.সি-র প্রমোশন পেয়ে চলে আসেন সাঁকরাইল স্টেশনে। সাঁকরাইলের চেকিং ব্যবস্থা একেবারেই গতানুগতিক, নেই কোন বৈচিত্র্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিষ্ঠার অভাব ছিল না খুটিয়ার মধ্যে। নিষ্ঠা আর দায়িত্ববোধ না থাকলে এগোনো যায় না। এই বিশ্বাস নিয়েই পথ হাঁটা শুরু হয় স্বপনবাবুর। বিশ্বাসের যথাযোগ্য মর্যাদা তিনি পেয়েছিলেন। ফলস্বরূপ সাতাশির ডিসেম্বরের বাইশ তারিখে রামরাজা-তলা খড়গপুর ডিভিসনে ট্রাভেলিং টিকিট এগজামিনার পদে প্রমোশন।

এপর্যন্ত যে সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন তার একটি শোনালেন স্বপনবাবু। '১৯৮৮-র ১৫ আগস্ট। সাঁকরাইলে তিনজন সতীর্থকে নিয়ে ফার্স্টক্লাসে উঠলাম। প্রায় পনেরোজনের একটা গ্রুপ আছে এই কামরায়, যাদের কেউই নিয়মিত টিকিট কাটে না। সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল চেকিং শুরুর পর। চার্জ করলাম। যাত্রীদের মধ্যে জনৈক পুলিশের এ.এস.আইয়ের কণ্ঠস্বর—ফাইন দেবে না আরো কিছু—। —ইত্যাদি নানা ধরনের মন্তব্য। পরিচয় জানতে চাইলে পকেট থেকে আইডেন্টিটি কার্ডটি দিলেন—'এই দ্যাখ'। যেন কার্ডটা দেখাচ্ছেন এটাই বড়কথা। সাব ইন্সপেকটরকে চমকে দিয়ে সিটে বসে থাকা জনৈক ভদ্রলোক ঝটিতে কার্ডটি কেড়ে নিলেন ও নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন—'কার্ডটি সাব ইন্সপেকটরবাবু তাঁর অফিস থেকে যেন সংগ্রহ করেন।' ভদ্রলোক উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের একজন পদস্থ গেজেটেড অফিসার। জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো অবস্থা এ.এস.আই-এর। শেষ পর্যন্ত কাতর অনুনয়ে পুলিশ ইন্সপেকটর কার্ড ফেরত পেলেন।'

মাঝেমধ্যেই এধরনের ঘটনা ঘটে ট্রেনের কামরায়। একধরনের যাত্রীদের উগ্র আচরণের সম্মুখীন হতে হয় টিকিট পরীক্ষকদের। কখনও কখনও কেউ কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বইকি। তবে ঝামেলা থাকেই।

কর্মদক্ষতার সুবাদে তিনি ছিনিয়ে নিয়েছেন ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হওয়া ক্যাশ আওয়ার্ড। প্রতিমাসে পাঁচশো টাকা করে। তাঁর কর্মদক্ষতার পরিসংখ্যানটি একনজরে উল্লেখযোগ্য। বিশেষসূত্রে পাওয়া তথ্যগুলো এরকম। ১৯৮৮'র জানুয়ারি মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতীয় রেলকে বিনাটিকিটে ভ্রমণকারী যাত্রীদের তরফ থেকে জরিমানা বাবদ তুলে দেন ১,৮৮,২২২.০০ টাকা। এর মধ্যে বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী ৮,৯৩০ জনের কাছ থেকে ভাড়া হিসেবে ৭৬,০৭১.০০ টাকা ও জরিমানা বাবদ

খোঁ জ খ ব র

১,১২,১৫১.০০ টাকা। আন বুকড় লাগেজ ৮৯৮ জনের কাছ থেকে ৯,৬৭২ টাকা। মোট ৯৮২৮ টি কেস বাবদ ১,৯৭,৩৯৪.০০ টাকা পেনাল্টি আদায় করে দেন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে রামরাজাতলা–খড়্গপুর ডিভিসনে। ইতি-মধ্যে সারাবছর মোট তিনশো তেরো দিন কাজ করে নিজের একক প্রচেষ্টায় রেকর্ড পরিমাণ জরিমানা আদায় করার পর ভারতীয় রেলের কর্তাব্যক্তিদের নজর কেড়ে নেন স্বপন।

এই ডিভিসনে আরোও তিনজন টি.টি.ই আছেন যাঁরা ওপেন মুভমেন্ট করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন কিন্তু কেউই জরিমানা আদায়ে তাঁর ধারে-কাছে পৌঁছতে পারেন নি। উননব্বুইয়ের ১৩ আগস্ট মহরম ও রামনবমীর দিন একাই ধরেছিলেন একশো এক জন বিনাটিকিটের যাত্রীকে। সম্ভবত এটাই ভারতীয় সাবারবার্ণ শাখার রেকর্ড পরিমাণ কেস একদিনে। এই তৎপ-রতার পুরস্কার স্বরূপ পেলেন রেলওয়ে উইক অ্যাওয়ার্ড ১৯৮৮। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার স্বয়ং তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করেন।

আবার রেকর্ড। এবার ১১,৭৫৭ জন বিনা টিকিটের যাত্রীর কাছ থেকে ১,২৪,৬১৬ টাকা। ৭১২ টি আন বুকড লাগেজ বাবদ ৭,৪০৮ টাকা সব মিলিয়ে জরিমানা হিসেবে ২,৮৮,৩০২ টাকা আদায় করে এক বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হলেন মিঃ খুটিয়া। হয়তো সহকর্মীদের কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত। কেউ কেউ আবার সর্বতোভাবে সাহায্যও করেছেন। তেমনি অনেক যাত্রীর কাছ থেকেও পেয়েছেন সহযোগিতা।

ইতিমধ্যে '৮৯–র সেপ্টেম্বরে মি.খুঁটিয়া 'ম্যান অব দ্য মানথ' পুরস্কারে সম্মানিত হন।

স্বপন খুঁটিয়ার স্থায়ী আবাস টালিগঞ্জের করুণাময়ীতে। বাবা অবসর-প্রাপ্ত রেলওয়ে কর্মী। পাঁচ ভাই ও তিনবোনের সংসার। আদি নিবাস মেদিনী-পুর জেলার বাজিৎপুর গ্রামে হলেও স্বপনবাবু জন্মেছেন মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুরে। প্রথম জীবন কাটে বিলাসপুরেই। ওখান থেকে ১৯৭৮–এ হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে এলেন কলকাতায়। ভর্তি হলেন নিউ আলিপুর কলেজে। ওখান থেকে বাণিজ্য শাখায় স্নাতক হওয়ার ফাঁকে দু'একটি বেসর-কারী প্রতিষ্ঠানে চাকরিও করেন। ইতিমধ্যে গ্রাজুয়েটও হলেন।

সরাসরি প্রশ্ন করলাম–'আচ্ছা, পেশার ক্ষেত্রে উন্নততর বা সর্বভারতীয় কোনও স্বীকৃতি পেয়েছেন কি?–আক্ষেপের সঙ্গে জানালেন–প্রমোশনই আটকে আছে। না, সর্বভারতীয় কোন স্বীকৃতি এখনও পাইনি।' দ্বিতীয় প্রশ্ন–১৯৮৭ সালে জরিমানা আদায় বাবদ ৭২,০০০ টাকা রেল দপ্তরে জমা দিয়ে ডি.কে. ঘোষ 'রেলওয়ে বোর্ড অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছিলেন অথচ আপনি ওর চেয়ে তিন চারগুণ বেশী অর্থ জরিমানা বাবদ রেলদপ্তরে জমা দিয়েছেন তা সত্ত্বেও আপনার জাতীয় পুরস্কার না পাওয়ার পেছনে কোন রহস্য আছে কি? 'রহস্য আছে কি–না বলতে পারব না, তবে আমার প্রমোশন না পাওয়াটাকে আমি দুভার্গ্য মনে করি।'

সম্প্রতি রেল আইনে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক টি টি কে প্রতিদিন গড়ে জরিমানা সংক্রান্ত ৬টি করে কেসের রিপোর্ট রেলদপ্তরে জমা দিতে হবে, অন্যথায় মাসের শেষে তাঁকে শোকজ সাসপেণ্ড, পাস, পিটিও আটকে দেওয়া ইত্যাদি যেকোন ধরনের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। 'এসমা'র জন্য এই আইনের বিরুদ্ধে কোন জোরালো প্রতিবাদ হয়নি। এধরনের জোরালো আইন-কে স্বার্থক করে তোলার জন্য যারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছেন তাদের ভাগ্যের দোহাই দিয়ে প্রাপ্য প্রোমোশন থেকে আর কতদিন বঞ্চিত করবেন রেল-দপ্তরের পদস্থ কর্তাব্যক্তিরা? নিজেকে উজাড় করে দিয়ে ভারতীয় রেলকে যিনি সমৃদ্ধ করে তুলছেন তিনি কি শুধু স্থানীয় স্বীকৃতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাক-বেন? ভাবুনতো, সেই সমস্ত ভলান্টিয়ার সাহায্যকারীদের কথা যাঁরা স্থায়ী পদে অধিষ্ঠিত টিকিট চেকারদের চেকিংয়ের সময়ে সাহায্য করেন! এ প্রসঙ্গে বলা যায়, বর্তমান রামরাজাতলা–খড়্গপুর ডিভিসনে মোট টিকিট পরীক্ষকের সংখ্যা ৮৪ আর স্বীকৃত সাহায্যকারীর সংখ্যা ১৪। এঁদের মধ্যে অনেকেরই ক্ষোভ আছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।

আবদুল কাইউম

প্রেম কিংবা দুর্বলতা

মেয়েটি সুখের সাজানো সংসার ছেড়ে হাত বাড়িয়েছিল রঙীন ভালোবাসার জগতে। কিন্তু স্বপ্ন তার ভেঙে চুরমার হল অচিরেই।

নজমার দু'চোখে জলের ধারা। ফেলে আসা জীবনের জন্য তার বুক হুহু করে উঠছিল।

বিয়ে হয়েছিল খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে। বয়সে বড় হলেও লোকটি ছিল বড় ভদ্র, বিনয়ী আর বিবেচক। ইউনিভার্সিটিতে পড়াতেন, ক্যাম্পাসেই নিজের বাসায় থাকতেন। ছোট্ট সুন্দর বাসা। শিক্ষিত, রুচিসম্পন্ন লোকজন আসতেন আড্ডা দিতে। নজমার খুব ভাল লাগত সবকিছু। বরকে সে ভালোও বাসত। ধীরে ধীরে দুটি সন্তানের মা হল নজমা। নজমা বরাবরই সুন্দরী, মা হওয়ার পর তার রূপ যেন খুলে গেল আরো। কিন্তু কোথা থেকে যে কি হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না।

নজমার বর অহসন একদিন নিয়ে এলেন এক বন্ধুকে। নাম তার উরফি। সবে ডাক্তারি পাশ করেছে, দারুণ হ্যাণ্ডসাম দেখতে শুনতে। কথা-বার্তাও বলত চমৎকার। উরফির সঙ্গে অহসনের বন্ধুত্ব ছিল নতুন, কিন্তু তা গাঢ় হতে দেরি হল না। উরফি আসত প্রায়ই তারপর থেকে। পরে অহসনের অনুপস্থিতিতেও আসতে শুরু করে। নজমা'র রূপযৌবনের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ। নজমার ভালো লাগে সেসব কথা শুনতে। কই অহসন তো এমন করে বলে না কখনো। আসলে, কোনো বুদ্ধিমান শিক্ষিত বরই নিজের স্ত্রীর প্রশংসা করেন না। কিছু কিছু মেয়ে বোধহয় বর চায় না, প্রেমিক চায়। নজমাও বোধহয় ছিল তাই।

আজ নজমা ভাবছে, সেসময়টায় তার হৃদয় জুড়ে কি যে হয়েছিল। তার বংশ ভালো, বাবা মা'র একটা মর্যাদা ছিল। বর পেয়েছিল শিক্ষিত, ভদ্র। কেন যে উরফি'র প্রেমে পড়ে গেল সে কে জানে। উরফির সঙ্গে সে বাইরে বেরুতে শুরু করেছিল আস্তে আস্তে। দু'জনে ঘোরাঘুরি করত, হাসাহাসি, কত গল্প। উরফি কেবল নজমা'র

রূপের প্রশংসা করত। নজমার তখন মনে হত, জীবনে ভালোবাসাই তো সব। অহসন ওর বাচ্চা- দের বাবা, প্রেমিক তো নয়। নজমার সংসারে মন লাগত না আর। সব সময় সে খিটখিট করত। অহসন একবার শান্তগলায় জিগ্যেস করেছিলেন, তোমার কী হয়েছে নজমা ?

রাগতস্বরে নজমা জবাব দিয়েছিল, কী আর হবে ? তুমি তো আমার জীবনটা নষ্ট করে দিলে। কেবল বই আর বই নিয়েই থাকো, আমার দিকে তাকাবার সময়ও তো পাও না। স্বার্থপর।

অহসন ব্যথিত হতেন। কিন্তু কী আর বলবেন, চুপ করে থাকতেন। উরফি বলত প্রায়ই, ইস্ তুমি কদিন কাটাবে বলতো ঐ শিক্ষিত মূর্খটার সঙ্গে! তোমাকে ছাড়া তো আর একটা দিনও থাকতে পারছি না। আমার ভালোবাসার দোহাই, কিছু একটা করো, নজমা।

অহসন ধীরে ধীরে সবই বুঝলেন। শিক্ষিত লোক, রুচিবান–তাঁর কাছে সব ব্যাপারই ধরা পড়ে যায়। তিনি কিন্তু কোনো অশান্তি তৈরি করলেন না। মুখ বুঝে থাকতেন। জানতেন, এখন কোনো কিছু করতে যাওয়া বোকামি। একদিন নজমা বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে, ততদিনে সব জানাজানি হয়ে গেছে, তো সেদিন অহসনের হাতে পড়েছে উরফির একটা চিঠি। অহসন সেদিন থমথমে গলায় বলেছিলেন, নমজার স্পষ্ট মনে আছে–নজমা, তুমি যেখানে খুশি চলে যেতে পারো। আমার দিক থেকে কোনো আপত্তি নেই। তবে, বাচ্চাদের রাখবো আমি।

এত সহজে মুক্তি পাবে নজমা স্বপ্নেও ভাবেনি। আর, বাচ্চাদের তো সে সঙ্গে নিয়ে যেতে কখনো চায়নি মনেমনে। যত ঝামেলা ওসব। সে তো শুধু একা একা তার প্রেমিকপুরুষ উরফির সঙ্গে প্রেম ভালোবাসায় মশগুল হয়ে কাটাতে চায় জীবন।

তারপর একদিন সত্যি সত্যি বর বাচ্চা সব ছেড়ে চলে গেল নজমা। উরফিকে বিয়েও করল। এবং কয়েকমাস কাটিয়ে দিল সুখে স্বপ্নে আবেশে বিভোর হয়ে। খুশির চোটে নজমা খেয়ালই করেনি, তার মূল্যবান গয়নাগাটি কখন যেন সব বিক্রি হয়ে গেছে।

কিন্তু সময় যায়, ফিকে হয়ে আসে প্রেমের ধূম্রজাল। শুধু কথায় জীবন কাটে না। বছর খানেকের মধ্যেই নজমা বুঝতে পারল, সে ভুল করেছে, বিরাট ভুল। উরফির স্বভাবই হচ্ছে সুন্দরী মেয়েদের অনবরত তোষামোদ করা, আর কি আশ্চর্য ! ওর চোখ শুধু বিবাহিতাদের দিকেই। এটা কি মনের রোগ ? একটা সাজানো সংসার ভেঙে দিয়ে ওর কী লাভ হয় ?

নজমা মাঝে মাঝে অভিযোগ করে, তুমি আমাকে ভুলে গেছ উরফি, আজকাল ফিরেও তাকাও না, তোমার জন্য সব ছাড়লাম। উরফি ঝাঁঝালো গলায় জবাব দেয়, আমার জন্য কিছুই করনি। তুমি সুখী ছিলে না, বরকে ভালোবাসতে না। আমার ভালোবাসার জবাব তুমি দিয়েছ ভালোবাসা দিয়েই, তাতে আমার কী দোষ ?

নজমার মনে পড়ত, তার ফেলে আসা জীবনের কথা। হেসেখেলে বেড়ানো ছেলেমেয়ে নিয়ে ভরা সংসার সে নিজের হাতে নষ্ট করেছে। একদিন সে উরফিকে ফোনে বলতে শুনল, 'তুমি কত সুন্দর, অথচ তোমার বরের সেটা চোখেই পড়ে না। ভদ্রলোক কি রূপের কদর জানে না ? তোমার জন্য এদিকে আমার চোখে ঘুম নেই !'

নজমার মাথা ঘুরতে থাকে। হায় আল্লাহ, আবার কোন মেয়ের সংসারে চোখ পড়ল উরফির, ওঃ।

এভাবেই কেটে যায় দিন। উরফি মাঝে মাঝে বাড়িতে আসত। বেশির ভাগ সময়ই সে বাইরে কাটাত। এভাবে একদিন বাড়িতে আসা বন্ধই করে দিল। নজমা একা হয়ে গেল, একদম একা। খুদা ওকে আর বাচ্চার মা হতেও দেয়নি। অহসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাচ্চাদের একবার দেখতে চাইল নজমা। বাচ্চারা বড় হয়েছে, ওরা এখন সব বোঝে, মা'র সঙ্গে তারা দেখা করতে চাইল না।

নজমা মাঝে মাঝে গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। কেন হল এমন ? আসলে কিছু না ভেবেচিন্তেই সে সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছিল। ভাবা উচিত ছিল, কিন্তু এখন আর সেসব ভেবে কী হবে ? এখন দিন চলবে কিভাবে, সেটাই তো চিন্তা। টাকা পয়সা আসবেই বা কোথ্থেকে ? অহসন কত ভালো ছিল। নজমা আজ উপলব্ধি করে, ভালো বর কখনো ভালো প্রেমিক হতে পারে না, ঠিক যেমন ভালো প্রেমিক ভালো বর হয় না। অহসন যদি ওকে জোর করে আটকে রাখতেন,তাহলেই ভালো হত।

খবরের কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে দেখে নজমা দরখাস্ত পাঠায়। একটা কাজের খুব দরকার, তা না হলে চলবে কী করে ? একটি বাচ্চাদের স্কুলের জন্য কিছু মহিলা চাওয়া হয়েছিল, নজমা তাতেও দরখাস্ত পাঠায়। ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে তার হঠাৎ চোখে পড়ে, ইন্টারভিউ নিচ্ছেন অহসন। নজমা'র মাথা ঘুরে যায় যেন। সে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। অহসনও একটু বিস্মিত। তবে তিনি গম্ভীরভাবে সামলে নিলেন। বললেন, সামনের চেয়ারটায় বসো।

নজমা শান্ত হবার চেষ্টা করে। সে হাত জোড় করে মাথা নামিয়ে নমস্কার করল। ধীরে ধীরে বসল চেয়ারে। অহসন আর তার মধ্যে এখন একটা বিরাট টেবিলের ব্যবধান। নজমার দু'চোখ বেয়ে নামল জলের ধারা। অহসন কোমল গলায় জিগ্যেস করলেন, কি ব্যাপার নজমা, আমাকে বল সবকিছু।

ভাঙা ভাঙা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে নজমা যতটা পারল নিজের দুরবস্থার কথা, স্বপ্নভঙ্গের কথা বর্ণনা করল। অহসন চুপ করে থাকলেন। নজমা উঠে দাঁড়াল, বলল, আমি যাই, তুমি এখানে আছ জানলে আসতাম না। এ পোড়ামুখ আ তোমাকে কখনো দেখাতে চাই না আর। অহস বললেন, এসে যখন পড়েছ তখন বসো। কি ব শোনো। নজমা সজোরে মাথা নাড়ে, বলে, অহসন, আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও। আমা যেতে দাও।

নজমা বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়।

কঠিন গলায় বলেন অহসন, দাঁড়াও। তু ইন্টারভিউ দিতে এসেছ মনে রেখো। অতএ শুনে যাও।

নজমা হকচকিয়ে যায়। অহসন বলে চলে শোনো, এটা নতুন স্কুল, বাচ্চাদের স্কুল। আমি সর্বেসর্বা। তুমি বরং এই স্কুলটার পুরো দায়ি নাও। ছোট ছোট বাচ্চাদের মধ্যে তোমার মন ভালো থাকবে। কাজের মধ্যে থাকলে নিজের দুঃ যন্ত্রণার কথা কিছুটা ভুলে থাকতে পারবে, আ তাছাড়া তুমি এখানে দায়িত্বে থাকলে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত থাকবো।

নজমা মাথা নিচু করে কাঁদতেই থাকে। অহস বলেন, তোমার ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে, ও কত বুদ্ধিমান হয়েছে, জানো না তো। আনন্দে আছে ওরা। দু'ভাইবোনকেই আমি মানুষ কর পেরেছি। আচ্ছা, তোমার আর বাচ্চা হয় নি ?

নজমা নীরবে মাথা নেড়ে বলে–না। কি তুমি আমাকে যেতে দাও। আমার মত বা মেয়েছেলেকে তুমি আর প্রশ্রয় দিও না। অহস গম্ভীর গলায় বলেন, শোনো নজমা, কথা বাড়ি লাভ নেই। অতীতকে ভুলে যাও। নতুনভাবে শু কর জীবনটা। চল বাইরে চল।

নজমাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে আসেন অহসন বললেন, কাজকর্ম বুঝে নাও। জীবন অনেক ভা সুন্দর, বিচিত্র। নজমা স্বাধীনভাবে ফের শুর কর, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাকে একদি এককথায় স্বাধীনভাবে ভেবেচিন্তে কাজ করা সুযোগ দিয়েছি, আজও দিচ্ছি।

প্রশস্ত উঠোনে তখন উজ্জ্বল রৌদ্র, সাজানো বাগিচায় ফুটে আছে রঙবেরঙের ফুল, আর হাওয় বইছিল মৃদুমৃদু।

বিন্যাস : গুরুচরণ মানকটাল

অসমীয়া ফিলেমর হালহকিকৎ

ডাঃ ভবেন্দ্রনাথ সইকিয়া নিজেই অসম ফিল্ম ওয়ার্ল্ডের এক উজ্জ্বল চালচিত্র। বিজ্ঞান, সাহিত্য আর ফিল্মে তিনি নিঃসন্দেহেই প্রতিভাধর। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ফিজিক্স–এ এম এস সি করার পর লণ্ডনে তিনি পি এইচ ডি করেন। ১৯৬৯ পর্যন্ত তিনি গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার ছিলেন। এই ভবেন্দ্র সইকিয়াই ১৯৭৬–এ তার অসমিয়া উপন্যাস 'শৃংখল' এর জন্য সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান। ১৯৭৭–এর পর আজ পর্যন্ত ভবেন্দ্রনাথ চারটি ফিল্ম তৈরি করেছেন, যার সব ক'টিই অসমিয়া ফিল্মের জন্য 'রজত কমল' পুরস্কার পায়। অসমিয়া ফিল্মের শ্রেষ্ঠ নির্দেশকদের মধ্যে অন্যতম ভবেন্দ্র সইকিয়া 'অসম ফিল্ম ফাইনান্স কর্পোরেশন' এর প্রেসিডেন্ট। অসমিয়া ফিল্মের পরিচিত নির্দেশক শিব ঠাকুরও ফিল্মের জগতে পদার্পণের আগে অসমের এক কলেজে চাকরি করতেন। নির্দেশক পুলক গোসাইও মূলত চিত্রকর। অসমিয়া সঙ্গীতের প্রসঙ্গ এলেই সবার আগে ভূপেন হাজারিকার নাম আসে। এই ভূপেন হাজারিকাও অসমিয়া ফিল্মের একজন অন্যতম নির্দেশক। কিন্তু অসমিয়া ফিল্মের সেই আগের স্বাতন্ত্র বাণিজ্যিক ফিল্মের চাপে আস্তে আস্তে বিলুপ্তির দিকে চলে পড়ছে। তাই এককালের সাহিত্য, কল্প ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠভূমি অসম তার চলচিত্র দুনিয়ায় নিজের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি হারিয়ে চলে পড়ছে বোম্বাই মার্কা ভায়োলেন্সের দিকে।

এক সাক্ষাৎকারে প্রখ্যাত নির্দেশক ভবেন্দ্র সইকিয়া এই প্রতিবেদককে বলেন, বোম্বাই মার্কা ভায়োলেন্স অসমিয়া ফিল্মকে গ্রাস করছে। অবশ্য বাণিজ্যিক ফিল্মেরও প্রয়োজন, নতুবা অসমের এই ছোট্ট ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিই বা টিঁকবে কি করে। এক একটি ফিল্মের জন্য এখানে প্রায় দশ বারো লাখ টাকা খরচ হয়। এর বেশি বাজেটের ফিল্ম করাও সম্ভব নয়। কারণ গোটা রাজ্যে অসমিয়া ফিল্ম দেখানোর মত মাত্র ৭০টি সিনেমা হল আছে। বাস্তবিকই এই ৭০টি সিনেমা হল থেকে মুনাফা করা এক অসাধ্য কাজ। এই জন্যই অসমিয়া ফিল্ম নির্মাতারা ভরপুর ভায়োলেন্স ব্যবহার করে চটকদার ফিল্ম তৈরি করতে একরকম বাধ্যই বলা যায়, যাতে কিছু অন্তত ব্যবসা চলে। তবু বলব প্রত্যেক বছরে যে ছয় সাতটি ফিল্ম রিলিজ করছে তার মধ্যে অন্তত একটি ফিল্মের ভায়োলেন্সের আর ধরাবাঁধা ফর্মুলার থেকে বেরিয়ে অসমিয়া জীবন আর সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করা উচিত।

অসমিয়া ফিল্মের নির্মাতা–নির্দেশকরা মনে করছেন ১৯৮৯ অসমিয়া ফিল্মের সৌভাগ্যজনক বছর, কেননা প্রত্যেক বছর যেখানে ছয় সাতটির বেশি ফিল্ম কিছুতেই তৈরি করা সম্ভব হতো না, সেখানে '৮৯ তে তৈরি হয়েছে ২০টিরও বেশি ফিল্ম। এই ২০টি ফিল্মের মধ্যে ১৫টি কমার্শিয়াল

ভবেন্দ্রনাথ সইকিয়ার রজত কমল প্রাপ্ত ছবি 'কোলাহল'–এ রুণুদেবী ঠাকুর

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ভবেন্দ্রনাথ সইকিয়ার বিতর্কিত সাক্ষাৎকার অনুষঙ্গে এই প্রতিবেদন পেশ করেছে প্রতিবেশি রাজ্য অসমের চলচ্চিত্রের চালচিত্রকে।

ফিল্ম হলেও বাকি অন্তত ৫টি ফিল্ম অসমিয়া জীবন, সংস্কৃতির রস গন্ধে ভরা সার্থক ফিল্ম।

সার্থক অসমিয়া ফিল্ম নির্দেশকদের মধ্যে ভবেন্দ্র সইকিয়া ছাড়া আরেকটি পরিচিত নাম জাহানু বড়ুয়া। ১৯৮৮ তে জাহানু বড়ুয়ার 'হালধীয়া চড়ায়ে বাও ধান খায়' রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পায়। গত পনেরো বছর ধরে নির্দেশক পদুম বড়ুয়া আর কোন ফিল্ম তৈরি করেন নি। তবু তাঁর বেশ কয়েক বছর আগেকার 'গঙ্গা চিলনীর পাখী' অসমিয়া জীবন সংস্কৃতির স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি হিসেবে সমাদৃত। শুধু এই ফিল্মটির জন্য তিনি রাতারাতি

অসমিয়া ফিল্ম দুনিয়ার উচ্চ স্তরে উঠে আসেন। যার ফলে পনেরো বছর ফিল্ম থেকে দূরে থাকলেও আজও তিনি জনমানস থেকে হারিয়ে যান নি। নির্দেশক অতুল বারদোলাইও দু' তিনটি উল্লেখযোগ্য ফিল্ম তৈরি করেছেন। যার মধ্যে 'কল্লোল' অসমিয়া ফিল্মে এক অভূতপূর্ব সংযোজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন নির্দেশকও দীর্ঘ বছর ধরে বহু কাঠখড় পুড়িয়ে একটি ফিল্ম তৈরি করতেই হিমশিম খাচ্ছেন।

ভবেন্দ্র সইকিয়া আজ অবদি চারটি ফিল্ম তৈরি করেছেন। তাঁর প্রথম ফিল্ম 'সন্ধ্যারাগ'। এই ফিল্মটি তাঁর এক বন্ধুর সহযোগিতা ও ঋণের জন্যই করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৮১-তে ভবেন্দ্রর দ্বিতীয় ফিল্ম 'অনির্বাণ'। এর নির্মাতাও নিজেই। ১৯৮৫ তে তাঁর তৃতীয় ফিল্ম 'অগ্নিসন্তান'। একই বছরে ৩১ মে তাঁর 'কোলাহল' ফিল্মটি 'রজত-

ভবেন্দ্র নাথ সইকিয়া
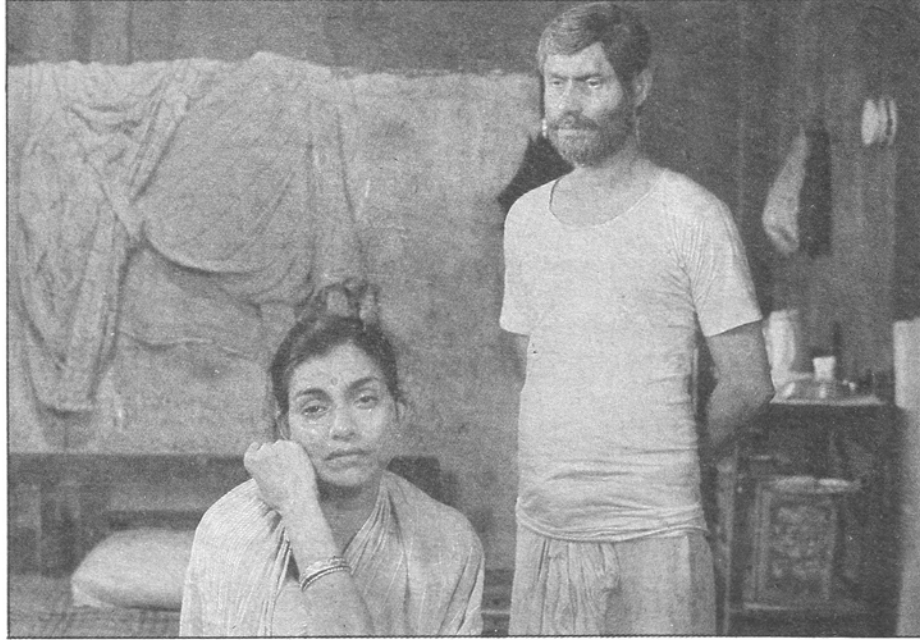
'কোলাহল'-এর এক বিষণ্ণ মুহূর্তে রুণুদেবী ঠাকুর এবং বিজু চৌধুরী

কমল' পুরস্কার পায়। ভবেন্দ্র সইকিয়া এই প্রতিবেদককে জানান, 'আমি কখনও প্রডিউসারের ফাঁদে পড়তে চাই না। কারণ ওতে নিজের পছন্দ মাফিক ফিল্ম করার হাঙ্গামা খুব।'

নিজেদের ফিল্ম কেরিয়ার টিকিয়ে রাখার জন্য শিব ঠাকুর তথা পুলক গোসাই-এর মত প্রতিভাবান নির্দেশককেও কমার্শিয়াল ফিল্মের দিকে ঝুঁকতে হয়েছে। কিন্তু এঁরা সুযোগ পেলেই নিজেদের শিল্প সত্তার প্রমাণ এখনও দিয়ে চলেছেন। যার মধ্যে কিছু অন্তত অসমিয়া জীবন সংস্কৃতির গন্ধ পাওয়া যায়। শিব ঠাকুরের কমার্শিয়াল ফিল্ম 'ঘর সংসার' তথা 'বোআরী' প্রভৃতি ফিল্ম এজন্যই সুপার হিট হতে পেরেছে। সম্প্রতি শিব ঠাকুর 'অশান্ত প্রহর' নামক একটি ভালো ফিল্ম তৈরি করেছেন। পুলক গোসাই নির্দেশিত কমার্শিয়াল ফিল্ম 'সিন্দুর' তথা 'সুরজ' বাজারে খুব ভালো চলেছিল। সম্প্রতি তিনি 'উকী' নামে একটি সিরিয়ালে হাত দিয়েছেন।

তবে অসমিয়া ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির হালচাল দেখে এটা পরিষ্কার যে অসমিয়া ফিল্ম তার স্বাতন্ত্র হারিয়ে দ্রুত পতনের দিকে চলে পড়ছে; অথচ তাকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা তেমন হচ্ছে না বললেই চলে। সম্ভবত কমার্শিয়াল ফিল্মের নির্দেশকদের সস্তা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিই এর অন্যতম কারণ। তবে ওই সব ধুম-ধাড়াক্কা ফিল্মের মাঝখানে কদাচিৎ ভালো ছবি যে তৈরি হচ্ছে না তা নয়।

অসমিয়া ফিল্মে বাজারি ভায়োলেন্সের প্রবেশ ঘটে ব্রজেন বড়ুয়ার আমলে। ১৯৭০-এ ওই ভায়োলেন্সের গতি আরও বাড়িয়ে দেন নির্দেশক নীপ বড়ুয়া। একই সঙ্গে কমার্শিয়াল ফিল্মের অন্যান্য নির্দেশকদের মধ্যে অহমদ তথা মুনীন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখের নাম করা যায়। অবশ্য মুনীন্দ্র বড়ুয়া মাঝে মধ্যেই তাঁর ফিল্মে শিল্পকলার ছাপ রাখার চেষ্টা করেন। মুনীন্দ্র বড়ুয়ার ফিল্ম 'পিতাপুত্র' তে সেই প্রচেষ্টা স্পষ্ট ধরা পড়ে। এ দিক থেকে ভূপেন হাজারিকার ফিল্ম অন্য স্বাদের। নিছক কমার্শিয়াল ও সিরিয়াস ফিল্ম-এ দুয়ের ধারে কাছে না গিয়ে তিনি নিজস্ব ঘরানা গড়ে তুলেছেন। যা অনেকাংশে সঙ্গীত প্রধান বলা যায়।

অসমিয়া ফিল্মের ইতিহাস আজ থেকে ৫৪ বছরের পুরনো। ১৯৩৫-এর 'জয়মতি' প্রথম অসমিয়া ফিল্ম। যার নির্মাতা-নির্দেশক জ্যোতি প্রসাদ অগ্রওয়াল। জ্যোতি প্রসাদ রাজস্থানী হলেও সে সময় বসবাস করতেন আসামেই। সেই সুবাদে একটি ফিল্ম স্টুডিও নির্মাণ করেছিলেন তিনি। অসমিয়া ফিল্ম জগতের লোকেরা ক্ষোভের সঙ্গে বলে, ভারতীয় ফিল্মের ৭৫ বছর পূর্তিতে সকলের নাম স্মরণ করা হলো অথচ জ্যোতি প্রসাদের নাম একবারও ওঠেনি। অবশ্য ১৯৬০ অবদি অসমিয়া ফিল্ম তৈরি হচ্ছিল নিতান্ত ঢিমে তালে। কিন্তু ব্রজেন বড়ুয়া কমার্শিয়াল ফিল্ম শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে অসমিয়া ফিল্ম নির্মাণে এক রকম জোয়ার দেখা দেয়।

অসমিয়া ফিল্মের সবচেয়ে পপুলার নায়ক হলেন বীজু ফুকন। সম্প্রতি তিনি নির্দেশনাতেও হাত দিয়েছেন। বীজু 'ভাই ভাই' নামে একটি কমার্শিয়াল ফিল্ম তৈরি করেছেন। বীজু ছাড়া অন্যান্য পরিচিত নায়কদের মধ্যে নীপেন গোস্বামী, প্রাঞ্জল সইকিয়া তথা তপন দাস প্রমুখ অন্যতম নাম। অভিনেত্রীদের মধ্যে রেনুদেবী ঠাকুর, মৃদুলা বড়ুয়া, বিধা রাও, কাশ্মীরী সইকিয়া এবং পূরবী ভট্টাচার্যর নাম আগে আসে। অসমিয়া ফিল্মে অভিনেতা-অভিনেত্রীরও অভাব লক্ষ্য করা যায়।

অসমিয়া ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিকে উৎসাহিত করতে অসম সরকার 'অসম ফিল্ম ফাইনান্স কর্পোরেশন'-এর প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু তা কেবল নামে মাত্রই। স্বর্গত বিমলা চালিহার মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময়ই দিসপুরে 'জ্যোতি চিত্রণ স্টুডিও' স্থাপিত হয়। এই স্টুডিও একটি স্যোসাইটির দ্বারা পরিচালিত হয়। অবশ্য সরকারও কিছু কিছু আর্থিক সহায়তা করে থাকেন। যদিও সেই অর্থে অসমিয়া ফিল্মের উন্নতির জন্য সরকারি সহযোগিতা তেমন আছে বলে মনে হয় না। এত সব প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও মাঝে মধ্যেই অসমিয়া ফিল্ম নিজের ঔজ্জ্বল্যে চমকে ওঠে। কিন্তু সেই ঔজ্জ্বল্য টিকিয়ে রাখার সামর্থ কোথায়?

বিকাশ কুমার ঝা

ছবি: দীপক কুমার

৩১ পৃষ্ঠার পর

পরেশ দত্ত

সুকুমার মুখার্জি

বি জে পি-র পূর্বসূরী জনসঙ্ঘের সভায় ভাষণরত বাজপেয়ী

এরাজ্যে বামফ্রন্ট তাদের ব্যর্থতা ঢাকা দিয়ে রাজনৈতিক মুনাফা লুটতে চাইছে। তার প্রমাণ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বি·জে·পির বিশাল সাফল্য। এরাজ্যে তার প্রমাণ বি·জে·পির আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য সি·পি·এমের মুসলিম ক্যাডারদের এগিয়ে দেওয়া। যাইহোক বি·জে·পি কে অচ্ছুৎ বলার দিন শেষ। এখন পশ্চিমবঙ্গে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ব্যর্থ বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যূত করা। আমরা জানি নির্বাচনে রিগিং বন্ধ করতে পারলেই সি·পি·এম কুপোকাৎ· হবে। আর সেজন্যই আমরা বুথ ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছি। যাতে করে সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে এবং শাসকদলগুলি ফল্‌স ভোট না দিতে পারে। সেজন্য নির্বাচনের সময় বুথে বুথে গণপাহারা বসানোর লক্ষ্যে আমরা ওইভাবে এগোচ্ছি। তৈরি করছি বুথ পাহারার সংগঠন। এই সংগঠনে সমাজের সকলশ্রেণীর প্রতিনিধিদের রাখছি। দ্রুত ইউনিট বাড়িয়ে তুলছি, সারা রাজ্য জুড়ে।'

সভাপতি সুকুমার ব্যানার্জির কথায় পশ্চিমবংগে দলীয় প্রভাব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটাই উপযুক্ত সময়। এরাজ্যের নিপীড়িত জনগণ এখন মার্কসীর আক্রমণের মোকাবিলায় বি·জে·পি কে চাইছে। আমরাও তাদের পাশে আছি। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবংগের জনগণের সামনে আমরা তুলে ধরছি বামফ্রন্টের ব্যর্থতাগুলি। ১৯৭৭-র জুন, বামফ্রন্ট, এরাজ্যের ক্ষমতায় আসার সময় ভারতের শিল্প সারণীতে পশ্চিমবংগের স্থান ছিল ৬ নম্বরে এখন তা ১১ নম্বরে পৌঁছেছে। বেড়েছে বেকার সংখ্যা। '৭৭-এ পশ্চিমবংগের নথিভুক্ত বেকার সংখ্যা ছিল ১,৭২০,০০০। এখন ৫০ লক্ষ। যেখানে মোট জনসংখ্যা ৬ কোটি! তুলনায় উত্তর প্রদেশে ১৪ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে বেকার সংখ্যা ২৬ লক্ষ! বিহারে ১০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে বেকার সংখ্যা ২৯ লক্ষ! মধ্যপ্রদেশের সাড়ে ১৩ লক্ষ, মহারাষ্ট্রে ১৬ লক্ষ। সুতরাং পশ্চিমবংগের বেকার সমস্যার ভয়াবহ সংখ্যাটি পরিষ্কার। শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯৭৭–এ পশ্চিমবংগের স্থান ছিল সপ্তম, বর্তমানে তা ১৯ তম। অন্যান্য রাজ্যের গড় বিদ্যুৎ উৎপাদন যেখানে ৬৫-৭৫%, এরাজ্যে তা মাত্র ৩০%। অন্যান্য রাজ্যের যেখানে ৭০% জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে পশ্চিমবংগে তা এখন মাত্র ২৬%। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে গত দশ বছরে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০-৫৬%, পশ্চিমবংগে তা ৭%। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা কিছু বাড়লেও চিকিৎসার সুযোগে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবংগ পিছিয়ে। শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে রাজনীতির আখড়ায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি। বি·জে·পি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য এই সব সমস্যাকে আন্দোলনের মাধ্যমে তুলে ধরবে'।

সি·পি·এমের বিরুদ্ধে ধর্মীয় স্রোতকে লেলিয়ে দিয়ে রাজ্য বি·জে·পি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকে দ্বিতীয় প্রধান ইস্যু করে তুলেছে। বি·জে·পি সম্পাদক পরেশ দত্তর কথায় 'অনুপ্রবেশকারীদের এরাজ্যে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চাইছে। ১৯৮৮-তে বাংলাদেশ ইসলাম রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পর সে দেশের অত্যাচারিত সংখ্যালঘুরা কাতারে কাতারে সীমান্ত পেরিয়ে এরাজ্যে আসতে শুরু করেছে। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস সেই সুযোগে তাদের রেশন কার্ড পাইয়ে দিচ্ছে, ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করছে, ব্যাঙ্ক লোন ও খাস জমি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। অথচ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে যে সমস্ত হিন্দু শরণার্থী এ রাজ্যে এসেছে তাদের এক বিরাট অংশ এখনও পুনর্বাসনের সুযোগ পায়নি। তারা আইনগতভাবে স্বীকৃতও নয়। তাই পুনর্বাসনের আওতায়ও আসতে পারছে না। বি·জে·পির পশ্চিমবংগ শাখা মানবিকতার স্বার্থেই এই সমস্যাকে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার করে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

অনুপ্রবেশ ও শরণার্থী ইস্যু যে হিন্দু সমর্থন আদায়ের পক্ষে ভাল কাজ করছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় সীমান্ত জেলাগুলির নির্বাচনী ফলাফলে। সেখানে বি·জে·পির ভোট প্রাপ্তির হার বেড়েছে ৯০ শতাংশ। মুসলিম ডমিনেটেড জেলায় এটা আরও বেশি। এমনকি কলকাতাতেও এর প্রভাব কম পড়েনি।

আর এর সর্বাধিক সুফল পাওয়া যাচ্ছে অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠনগুলির সহানুভূতি আদায়ে। রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করতে হলে যা বি·জে·পির জন্য একান্ত জরুরি। কারণ এ রাজ্যে বি·জে·পিকে তো শূন্য থেকে শুরু করতে হচ্ছে। তাই যদি তার নেতৃত্বে সে রাজ্যের অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠনগুলিকে সি·পি·এমের বিরুদ্ধে পথে নামাতে পারে তার রাজনৈতিক ফায়দা তো সে একাই তুলতে পারবে। সেলক্ষ্যেই এখন এসেছে বি·জে·পি।

'পাঁচ কোটি' ভক্তের সন্তানদল, লক্ষ লক্ষ আনন্দমার্গী, ১,২০০ ইউনিটের আর· এস·এস, ৩০ হাজার ইউনিটের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ প্রভৃতি ধর্মীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে শাসকদলের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনগণের ও হতাশ কংগ্রেসি কর্মীদের একজোট সমর্থন যদি বি·জে·পির দিকে এগিয়ে আসে তবে রাতারাতি পশ্চিমবংগের রাজনৈতিক চিত্রটিও বদলে যেতে বাধ্য। এবং বি·জে·পিও আগামী নির্বাচনে আশাপ্রদ সাফল্যের জন্য প্রবল শক্তি নিয়ে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ময়দানে নামতে পারবে। রাজ্য বি·জে·পির মত কেন্দ্রিয় নেতারাও এখন তাই চাইছে। মার্ক্সবাদী সরকারকে উৎখাত করতে এখন সেই লক্ষ্যে এগুচ্ছেন রাজ্য বি·জে·পির নেতারা। ●

তাপস মহাপাত্র এবং রমাপ্রসাদ ঘোষাল

ছবি: অশোক বসু : বিকাশ চক্রবর্তী

পুরনো কলকাতার ডুয়েলিং

সুন্দরী নারী থেকে শুরু করে অবৈধ প্রেম, উপঢৌকন এমনকি
নস্যর কৌটো নিয়ে পর্যন্ত কলকাতার মাঠে ঘটে যাওয়া সেকালের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথকতা এই প্রতিবেদনকে
পৌঁছে দেবে সেকালের কলকাতার উত্তেজনামুখর দিনগুলিতে।

আগস্ট মাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতায় সেদিন কেবলমাত্র ভোর হয়েছে। সারারাত বৃষ্টি ছিল। বেলভেডিয়ার হাউসের সামনে বড় বড় গাছপালা। চারিদিকে নির্জনতা। ঘাসের সবুজ লনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছেন দু'জন ইংরেজ রাজপুরুষ। দুজনেরই শক্ত হাতের মুঠোয় ধরা রয়েছে পিস্তল। স্থির দৃষ্টিতে দুজন দুজনকে তাক করে রয়েছেন। উভয়ের মধ্যে দূরত্ব চোদ্দ কদম। সঠিক দূরত্ব মেপে দুজন রুদ্ধবাক ইংরেজ রাজপুরুষকে দাঁড় করালেন 'সেকেণ্ডম্যান'। এই সেকেণ্ডম্যান নির্দেশ দিলেই দুজন দুজনের দিকে গুলি ছুঁড়বেন। যে কোনজনেরই মৃত্যু হতে পারে। সেকেণ্ডম্যান অর্থাৎ বিচারক নিজে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে। স্নায়ুর চাপে দুজনের শিরা টানটান। কখন রুমালটা নাড়িয়ে সেকেণ্ডম্যান ডুয়েলিং–এর ঘোষণা করেন–এজন্যে তাঁরা উদগ্রীব। দু'জন পিস্তলধারীর পরনে কালো ঢিলেঢালা ওভারকোট। মাথায় লম্বা টুপি। এঁদের মধ্যে একজন বহু বিতর্কিত বাংলার গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এবং অপরজন হলেন সুপ্রীম কাউন্সিলের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ফিলিপ ফ্রান্সিস। দুজনেরই চোখমুখ শক্ত হয়ে আছে। ক্রোধের আগুনে তাঁরা ফুটছেন। রুমাল নাড়িয়ে সেকেণ্ডম্যান নির্দেশ দিতেই পলকে দুজনের পিস্তল থেকে গুলি বেরিয়ে এল। মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ফ্রান্সিস। তাঁর উরু থেকে গলগল করে টাটকা রক্ত বেরিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে। তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হেস্টিংস। হাতে ধরা পিস্তল দিয়ে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। একটুর জন্যে মৃত্যু তাঁকে ছুঁতে পারেনি। ফ্রান্সিসের গুলিটা মাথার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ফ্রান্সিস রক্তে মাখামাখি হয়ে মাটিতে ছটফট করছেন।

১৭৮০ সালের এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে কলকাতায় প্রথম পা রাখল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গ দ্বন্দ্বযুদ্ধ তথা ডুয়েল। সামন্ততান্ত্রিক যুগের এক নৃশংস প্রতিযোগিতা। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেকোন বিষয়ের সংঘাত এই ডুয়েলিং। নারী, সম্পত্তি, অর্থ, সম্মান–যেকোন বিষয়কেই কেন্দ্র করে ঘটত এই ঘটনা।

ফ্রান্সিসের সঙ্গে হেস্টিংস–এর বিরোধ ১৭৭৪ সালের শীতকালের এক বিকেল থেকেই। সেই বিকেলে চাঁদপাল ঘাটে ইংল্যাণ্ড থেকে জাহাজে করে এসে নামলেন সুপ্রীম কাউন্সিলের প্রধান বিচারপতি স্যর ইলিইজা ইম্প। ইংল্যাণ্ড থেকে এঁদেরকে কলকাতাস্থ সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য করে পাঠান হয়েছে। বাংলাদেশের গভর্নর জেনারেল তখন হেস্টিংস। জাহাজঘাটায় এই বিশেষ অতিথিদের অভ্যর্থনার তৎকালীন রাজকীয় নিয়ম হল–২৯টি তোপ দাগতে হবে। কিন্তু দাগা হল মাত্র ১৭ টি! অপমানিত হলেন ফিলিপ ফ্রান্সিস। এরপর থেকেই এঁরা, বিশেষ করে ফিলিপ হলেন হেস্টিংস–এর মারাত্মক কঠোর সমালোচক। কাউন্সিলের সভায় হেস্টিংস–কে প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটি বিষয়েই একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়তেন। প্রকারান্তরে অপমানই করা হত হেস্টিংস-কে। এইভাবে দুই রাজপুরুষের বিবাদ চরমে উঠতে থাকে। ঠিক এই সময় ফ্রান্সিস এক নারীঘটিত বিষয়ে জড়িয়ে পড়েন। বিষয়টি হল–জর্জ গ্র্যাণ্ডের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী অষ্টাদশী ফরাসী সুন্দরী মাদাম গ্র্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সিসের গোপন অভিসার। বিবাহিত এবং সন্তানের জনক ফ্রান্সিস তার প্রেমে এত মজলেন যে, রাতের অন্ধকারে মই কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে রেড গার্ডেন হাউসের পাঁচিল টপকে চোরের মতন ঢুকে যেতেন সুন্দরী পরস্ত্রী মাদাম গ্র্যাণ্ডের একেবারে শয়ন-কক্ষে। কিন্তু গোপন অভিসার গোপন থাকেনা। ১৭৭৮ সালের ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় কাউন্সিলার রিচার্ড বারওয়েলকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ গ্র্যাণ্ড নিজের বাড়িতে এলেন। অতঃপর স্ত্রীর শোবার ঘরে ঢুকেই হতচকিত হয়ে পড়েন। তাঁরই অষ্টাদশী স্ত্রী মাদাম গ্র্যাণ্ডের সঙ্গে বিছানায় বাহুসংলগ্ন অবস্থায় রয়েছেন ফিলিপ ফ্রান্সিস! ফ্রান্সিস অভিযুক্ত হলেন। বিচারে ৫০,০০০ টাকা সিক্কা ও ৯৭৪ টাকা সিক্কা মোকদ্দমা খরচা বাবদ ফ্রান্সিসের দিতে হল। এই গোপন প্রেম কাহিনী নিয়ে সর্বত্র তোলপাড়। হেস্টিংস এই সুযোগ কাজে লাগালেন। কিন্তু এরপরেও ফ্রান্সিসের দাপটে তাঁর অবস্থা করুণই ছিল। পরে একদিন কাউন্সিলের এক সভায় গভর্নর হেস্টিংস ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পাঠ করলেন। প্রস্তাব সম্পূর্ণই ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে ছিল। উক্ত প্রেম কাহিনীর সম্পর্কে ইঙ্গিতও ছিল। ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ফ্রান্সিস সভাকক্ষের বাইরে গিয়ে একটি চিরকুট লিখে গোপনে হেস্টিংস-এর হাতে তুলে দিলেন। চিরকূটে ফ্রান্সিস হেস্টিংস–কে ডুয়েলের চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। চ্যালেঞ্জ পেয়ে হেস্টিংস দাঁতে দাঁত চেপে তা গ্রহণ করলেন। আরম্ভ হল কলকাতার প্রথম ডুয়েলিং।

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের কোম্পানীর সুপ্রীম কাউন্সিলের এক সভায় সদস্য ক্লেভারিং প্রকাশ্যে রিচার্ড বারওয়েলের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনালেন। অভিযোগটি হলঃ কয়েকটি লবন আখড়ার লীজের ব্যাপারে বারওয়েল নাকি পরিচিত এক ব্যবসায়ীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। এবং এই ব্যবসায়ীর প্রতিপক্ষের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা ঘুস নেওয়া সত্ত্বেও তাকে লীজের সত্ব থেকে বঞ্চিত করেছেন। এই অভিযোগ করে বারওয়েলকে প্রচুর গালাগালিও করা হয়। এই ঘটনার পাঁচদিন পর, এক নির্জন মাঠে, খুব সকালে অনুষ্ঠিত হল কলকাতার দ্বিতীয় ঐতিহাসিক ডুয়েলিং। সাক্ষী কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব। 'সেকেণ্ডম্যানে'র রুমাল নির্দেশ দিতেই ফায়ার! দুর্ভাগ্য বারওয়েলের। উত্তেজনায় পিস্তলের লক্ষ্য ব্যর্থ হল। ক্লেভারিং–এর মাথার পাশ দিয়ে গুলি বেরিয়ে গেল। অপমানের প্রতিশোধ তো নেওয়াই হলনা, উপরন্তু ক্লেভারিং–এর পিস্তলের গুলিতে বারওয়েল সাংঘাতিকভাবে জখম হলেন।

বহুবার সেকেলে কলকাতায় ডুয়েলিং হয়েছে। তখন গড়ের মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে বড় বড় গাছের আড়াল ছিল। এই নিরালা ও জঙ্গলে ঢাকা জায়গায় কালে ভদ্রে হারানো গরুবাছুরের খোঁজে দুএকটা মানুষ এসে পড়ত। এইসব গাছগুলোকে বলা হত 'দ্য ট্রি অব ডেস্টিনি।' অদৃষ্টের গাছ। এখানেই প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভাগ্য নির্ধারিত হত।

১৮০৮ খ্রীস্টাব্দের ৮ অকটোবর। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে আগেই। কলকাতার গড়ের মাঠের সারি সারি গাছগুলোর একটিতে ঝোলানো এক জ্বলন্ত লণ্ঠন।

রেজিস্ট্রেশন অফ নিউজপেপার্স (সেন্ট্রাল) এ্যাক্ট ১৯৫৬-র ৮বি ধারা অনুসারে 'আলোকপাত'-এ স্বত্ব ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ প্রকাশ করা হচ্ছে:

ফর্ম ৪

১) প্রকাশের স্থান	২৮১, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ
২) প্রকাশের সময়	মাসিক
৩) মুদ্রাকরের নাম, নাগরিকতা ও ঠিকানা	অশোক মিত্র ভারতীয় ১এ, হাশিমপুর রোড, এলাহাবাদ
৪) প্রকাশকের নাম, নাগরিকতা ও ঠিকানা	দীপক মিত্র ভারতীয় ১এ, হাশিমপুর রোড, এলাহাবাদ
৫) সম্পাদকের নাম, নাগরিকতা ও ঠিকানা	আলোক মিত্র ভারতীয় ১এ, হাশিমপুর রোড, এলাহাবাদ
৬) মোট সম্পত্তির ১ শতাংশের বেশি অংশ আছে এমন অংশীদারদের নাম	শ্রীমতী নন্দরানী মিত্র, ১এ, হাশিমপুর রোড, এলাহাবাদ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৬৪, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ আলোক মিত্র, অশোক মিত্র, দীপক মিত্র, মনমোহন মিত্র — ১এ, হাশিমপুর রোড, এলাহাবাদ

আমি শ্রী দীপক মিত্র, প্রকাশনের পক্ষে ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

৩১ মার্চ ১৯৯০

স্বাক্ষর,
দীপক মিত্র

নিজের ঘরে চা খাচ্ছেন। তিনি মাদ্রাজ সুপ্রীম কোর্টের এ্যাটর্নী। এখন কাজে কলকাতায় এসেছেন। পরিচারক এসে খবর দিল কে একজন দেখা করতে এসেছেন। ভদ্রলোকের নাম স্যামুয়েল কক্স। কক্স ঘরে ঢুকেই কোনরকম ভনিতা না করেই বললেন, 'আমি আপনার কাছে এ মুহূর্তে একজন সেকেন্ড ম্যান হিসেবেই এসেছি।' চমকে উঠলেন হিকি। কক্স বলতে লাগলেন, 'আমি মিঃ ব্যাটমানের কাছ থেকে আপনাকে একটি খবর জানাতে এসেছি। আপনি ত্রিনকোমালায় থাকাকালীন মিঃ ব্যাটম্যানের সম্পর্কে অত্যন্ত জঘন্য কুৎসা রটিয়েছিলেন ফরাসী পদাতিক বাহিনীর সেনাদের কাছে। এ বিষয়ে হয় আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে। নতুবা ডুয়েলের মাধ্যমে এর একটি বিহিত করা হোক।' উইলিয়াম হিকি ক্ষমাতো চাইলেনই না। উপরন্তু ওই কথিত কুৎসা যে সম্পূর্ণ সত্য তা আবার জানালেন। এবং ডুয়েলের সিদ্ধান্তই তিনি নিলেন।

পরদিন বেলভেডিয়ারের পেছনের একফালি জমিতে হিকি বন্ধু পট-কে নিয়ে এলেন। ব্যাটমান নিয়ে এলেন কক্স-কে। নিয়মমতন দূরত্বে দু'জন দাঁড়িয়ে। পিস্তল গর্জে উঠল। ব্যাটম্যানের পিস্তলের গুলি হিকির মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। হিকি-র গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট। ডুয়েলিং সাঙ্গ হল। সাক্ষী রইলেন বেলভেডিয়ার। এই রাস্তার-ই নাম পরে হয়েছিল 'ডুয়েল স্ট্রিট'।

ডুয়েলিং-এর সংবাদ কলকাতার কাগজপত্রে খুব গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হত। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুলাই 'ক্যালকাটা গেজেট'–এ একটি খবর প্রকাশিত হয় 'শনিবার সন্ধ্যায় ডুয়েল লড়তে গিয়ে এক যুবকের মৃত্যু।' তার ঠিক দু'বছর পরে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১মে-র একটি খবরে প্রকাশ পেল–'গতকাল সন্ধ্যায় মিঃ জি নামে এক এ্যাটর্নীর সঙ্গে মিঃ এ নামে এক ব্যক্তির ডুয়েল অনুষ্ঠিত হয়। ঘটনাস্থলেই এক প্রতিদ্বন্দ্বী মারা যায়।' এই দুটি ডুয়েলের কারণ ছিল জুয়া।

কাগজের সংবাদ ছাড়াও ডুয়েলিং নিয়ে বহু চিত্তাকর্ষক বইও ছাপা হত। রাস্তাঘাটে, শুঁড়িখানায়, নাচের মজলিসে, অফিস কাছারীতে মুখরোচক গল্প হত এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ নিয়ে। পরে কোম্পানী দেখল ডুয়েলিং–এ তাদের ক্ষতি হচ্ছে। তখন পত্রপত্রিকায় ডুয়েলিং–এর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করা হয়। কিন্তু সেই প্রচারে ডুয়েলিং না কমে বরং বেড়েই চলল। ডুয়েলিং–এর বিরুদ্ধে নানা আইন প্রণয়ন করা হল। বিধিনিষেধও প্রয়োগ করা হল। এগুলো বেশ মজাদার। বিধিনিষেধেই জানান হল, ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২ মার্চ থেকে এই নিয়ম চালু, যে ডুয়েলিং সেরে ফেলতে হবে সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যার মধ্যে। আনন্দ অনুষ্ঠানের দিন ডুয়েল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর কলকাতার সুপ্রীম কোর্টেও এক ঐতিহাসিক বিচারে ডুয়েলজয়ী জনৈক সামরিক কর্মচারীকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হল। এই প্রথম ডুয়েলে অনুষ্ঠিত কোন হত্যাকে খুনের ধারায় ফেলা হয়।

এইসব ব্যবস্থা চললেও ডুয়েলিং চলতে লাগল গোপনে।

১৮১১ সালে রবিনসন নামের জনৈক সামরিক ব্যক্তি তারই এক অধঃস্তন সামরিক কর্মী কেনেডির সঙ্গে ডুয়েলে অবতীর্ণ হলেন ব্যারাকের ভেতরেই। কেনেডি আহত হলে শাস্তি স্বরূপ রবিনসনকে দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার যে সাহেবদের প্রভাবে কলকাতাবাসী বাঙালিরা প্রভাবিত হয়ে কথায় কথায় ডুয়েল লড়তে নামেনি। তবে একটি ঘটনা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ। তখন কলকাতা থেকে ডুয়েলিং-এর অভ্যাস প্রায় দূর হয়ে গেছে। দেশময় ইংরেজ–প্রতাপ। তখন জনৈক বাঙালি জনৈক ইংরেজ সৈনিকের বিরুদ্ধে ডুয়েলের আহ্বান জানিয়ে সাড়া ফেলে দেন। সৈনিকের সঙ্গে বিবাদ হয়েছিল একটি নস্যির কৌটো নিয়ে। নস্যির কৌটোকে অবজ্ঞা করেছিল সৈনিকটি। বাঙালি ভদ্রলোক ডুয়েলের আহ্বান জানালেও সৈনিকটি ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়। কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে ভদ্রলোক আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠেন।

এইরকম বহু ডুয়েলিং কলকাতায় হয়েছে। তার মধ্যে বেশির ভাগই নারীকেন্দ্রিক। মধ্যযগীয় তরোয়াল ডুয়েলিং কলকাতায় ঘটেনি। সমস্ত ডুয়েলই হত পিস্তলে। ব্যবহৃত হত একটি করে গুলি। কদাচিৎ দুটি গুলির ব্যবহার হয়েছে।

কলকাতার ডুয়েলিং–এর কারণ অনুসন্ধান করলে নারী-ই প্রকট হয়ে ওঠে, তার কারণ তৎকালীন কলকাতায় ইংরাজ যুবকদের অধিকাংশই ছিল অবিবাহিত। এরা স্বল্পবেতনে কোম্পানীর চাকরি নিয়ে কলকাতায় আসত। এদের জীবনসঙ্গিনী তথা প্রেমিকার সংখ্যা প্রায় শূন্য। কারণ কলকাতায় ইংরেজ মহিলার সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। এই সংখ্যাল্পতাই ডুয়েলিং–এর উদ্ভব ঘটাতো।

সুন্দরী মহিলারা বন্দরে ভিড়লেই যুবকদের দৃষ্টি যেত সেখানে। আলোচনা হত। একজন নারীকে নিয়ে চলত বহু পুরুষের রেষারেষি। কোম্পানী চাইত ইংল্যাণ্ডের বেশি সংখ্যক মহিলা কলকাতায় আসুক। তাহলে দেশীয় মহিলাদের সঙ্গে যুবকদের মন লেনদেন ঘটবেনা। এতে কোম্পানীর বিষয় গোপনীয়ও থাকবে। এরপর থেকে চলতো প্রেমাভিসার এবং প্রতিযোগিতা। ডুয়েলিং–এ জিতলে বিজয়ী পুরুষের কদর বাড়তো নারী মহলে।

ইংরেজের হতশ্রী শাসন ব্যবস্থায় ডুয়েলিং ছিল মানমর্যাদার রক্ষক। ডুয়েলিং কোন বিচ্ছিন্ন সামাজিক প্রথা নয়। এটি হল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্বস্তরের শোষণ, ক্ষুব্ধ ইংরেজ যুবকদের সম্মিলিত অনৈতিকতা এবং পরিশেষে বিষিয়ে যাওয়া আর্থ-সামাজিকতার এক বেদনাকাতর মিশ্র ফলাফল।

বৈচিত্র্যের শহর কলকাতা ইউরোপীয় ডুয়েলিং-এর সাক্ষী হয়ে পরে ক্রমে ক্রমে প্রথাটিকে ভুলে যায়। এখনও চিন্তা করলে অতীত এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ হিংস্রতার রূপ নিয়ে স্মৃতিকে চমকে দেয়।

- সুজিত রায়

ঢাকা শহরের কথা

ওপার বাংলার সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র ঢাকা শহরের সাহিত্য স্রষ্টাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলো[চনা] শেষে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসগুলির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের পুরোধা প্রয়াসের মূল্যায়ন করেছেন নজরুল ইসলাম।

'বাংলা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস' নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমার মনে হয় যে ওপার বাংলার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসগুলিকে অন্তর্ভুক্ত না করলে আমার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। কাজটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য আমি বাংলাদেশের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসগুলির ব্যাপারে খোঁজ-খবর শুরু করি। তারজন্য কলকাতাস্থ বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন লাইব্রেরির সঙ্গেও যোগাযোগ করি। তা করেও যথেষ্ট তথ্য যোগাড় করতে ব্যর্থ হই। তখন আমি ঢাকা যাওয়া স্থির করি। ইতিমধ্যে গত নভেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সাহেব এখানে এলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তাঁর মাধ্যমেই আলাপ হয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূঁইয়া ইকবাল এবং গোলাম মোস্তাফার সঙ্গে। তাঁদের কাছ থেকে আমি কিছু তথ্য পাই। বাকি তথ্য সংগ্রহের জন্য জানুয়ারির দশ তারিখ আমি ঢাকা রওনা হই।

বেলা সাড়ে এগারটার সময় কলকাতা বিমান বন্দর থেকে আমাদের বিমান আকাশে উড়তেই চোখে পড়ল সবুজ নারকেল গাছে ঘেরা লোকালয়। তারপর দেখলাম টুকরো টুকরো সবুজ ক্ষেতের উপর দিয়ে আমাদের সঙ্গেই একটা ফড়িঙের মত বিমানের ছায়াটাও এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে কয়েকটি চড়া সহ একটি নদী আবির্ভূত হল। বিমান সেবিকা ঘোষণা করলেন, 'কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে পৌঁছে যাব।' সারি সারি টিনের বাড়ি চোখে পড়ল। একটুপরেই বিমান ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করল। অভিবাসন এবং সামী-শুল্ক সংক্রান্ত করণীয়গুলো সেরে বাইরে আসতেই দেখলাম একটুকরো কাগজে আমার নাম লিখে নিয়ে দু'জন ভদ্রলোক দাড়িয়ে আছেন। আমি এগিয়ে গিয়ে আলাপ করলাম। দু'জনেই আদর্শ কলেজের লেকচারার। আমার সঙ্গে একটিমাত্র ব্যাগ ছিল। তা দেখে ফয়সাল সাহেব বললেন, 'একটা বেবি ট্যাক্সি করলেই হয়ে যাবে।' শুনে আমি আনন্দিত হলাম এই ভেবে যে ঢাকা নেমেই একটা নূতন ধরনের ট্যাক্সিতে চড়া হয়ে যাবে। আসলাম সাহেব বেবি ট্যাক্সি ভাড়া করতে ছুটলেন। কিন্তু একটু পরে তিনি বেবি ট্যাক্সির বদলে একটা অটো রিক্সা নিয়ে হাজির হলেন। আমি বেবি ট্যাক্সি চড়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছি দেখে হতাশ হয়ে পড়লাম। মনের কথাটা গোপন করতে না পেরে বলেই ফেললাম, 'বেবি ট্যাক্সি করবেন বলছিলেন যে!' আসলাম সাহেব বললেন, 'বেবি ট্যাক্সিই তো করলাম।' বুঝলাম এখানে অটো রিক্সাকেই বেবি ট্যাক্সি বলে। বেবি ট্যাক্সি চেপে আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ সামশুল আলমের বাড়ি পৌঁছুলাম।

ঢাকা পৌঁছে আমি সর্বপ্রথম যোগাযোগ করলাম আনিসুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে। তিনি
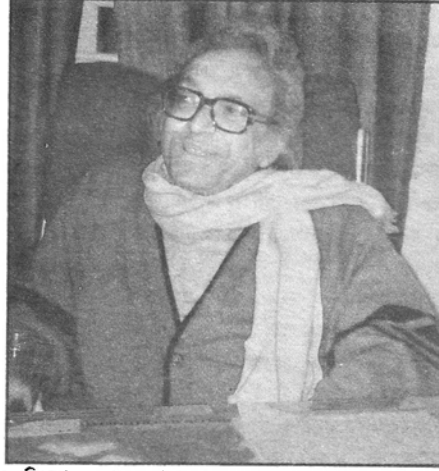
কবি শামসুর রহমান

জুবাইদা গুলশান আরার বাড়িতে সাহিত্য বাসর

পরের দিন ন'টার সময় তাঁর বাড়িতে যেতে বললেন। এরপর ফোন করলাম গোলাম মোস্তাফার শ্বশুর বাড়িতে। তাঁর এক আত্মীয়া বললেন যে তাঁর আসার কথা ছিল। কিন্তু এখনও আসেন নি। টেলিফোন রেখে আলম সাহেবের সঙ্গে ধানমণ্ডিতে আশরফ সিদ্দিকীর বাড়ি গেলাম। আমি কলকাতা থেকেই চিঠির মাধ্যমে ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। আমার প্রথম চিঠির উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন যে উপন্যাস উপন্যাসই। তা আত্মজীবনীমূলক হয় কি করে? উপন্যাস কি করে আত্মজীবনীমূলক হয় তা ব্যাখ্যা করে আমি তাকে দ্বিতীয় চিঠি লিখি। আমার ব্যাখ্যা অনুসারে তাঁর 'আরশিনগর' উপন্যাসকে আত্মজীবনীমূলক বলে উল্লেখ করলেন। অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের কোন কোন উপন্যাস আত্মজীবনীমূলক হতে পারে সে ব্যাপারেও আলোচনা হল। তাঁর কাছ থেকে আমি জানতে পারলাম যে পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় ঔপন্যাসিক জুবাইদা গুলশান আরার বাড়িতে একটি ঘরোয়া সাহিত্য–আসর বসবে। ওখান থেকে ফিরে জুবাইদা গুলশান আরাকে টেলিফোন করে

আমি সে আসরের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। টেলিফোনে কথা বললাম ঔপন্যাসিক রিজিয়া রহমানের সঙ্গেও। একটু পরে টেলিফোন পেলাম গোলাম মোস্তাফার। তিনি ঢাকা পৌঁছে গেছেন। পরের দিন সকালে আনিসুজ্জামান সাহেবের ওখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে ঠিক হল। খাওয়া দাওয়ার পর আমি 'আরশিনগর' উপন্যাসটা পড়তে শুরু করলাম।

পরের দিন পৌনে নটা নাগাদ আলম সাহেব আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আনিসুজ্জামান সাহেবের বাড়ি পৌঁছে দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই গোলাম মোস্তাফা এসে গেলেন। আনিসুজ্জামান সাহেব আমাকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গেলেন। সেখানে আমার কাজের ব্যাপারে আলোচনা হল। আলোচনার পর আমি আর গোলাম মোস্তাফা বাংলা একাডেমি গেলাম। ওখানে সেলিনা হোসেন, সুব্রত বড়ুয়া এবং রশিদ হায়দারের সঙ্গে দেখা করলাম। রশিদ হায়দার জানালেন যে তাঁর 'মাবুহাই' উপন্যাসটি আত্মজীবনীমূলক। বাংলা একাডেমি থেকে আবার আনিসুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে কথা বললাম। কথা বলার পর গেলাম শিল্পকলা একাডেমি। সেখানে আল মাহমুদের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর 'যেভাবে বেড়ে উঠি' যে

নিজের বাড়িতে উমুরতুল ফজল

আত্মজীবনীমূলক সে ব্যাপারে কোনরকম সন্দেহ ছিল না। সন্দেহ ছিল এটি উপন্যাস কি না সে ব্যাপারে। আল মাহমুদ নিজে এটিকে 'কৈশোরক আত্ম–উপন্যাস' বলে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, 'আমি আত্মজীবনই লিখেছি। তবে এমনভাবে লিখেছি যাতে উপন্যাসের আবহ সৃষ্টি হয়েছে।' তিনি এও জানালেন যে ১৯৮৭ সালে ফিলিপ পুরস্কারের জন্য তিনি এটিকে উপন্যাস হিসেবেই দাখিল করেছিলেন।

শিল্পকলা একাডেমি থেকে বেরিয়ে গোলাম মোস্তাফা শ্বশুরবাড়িতে চলে গেলেন। আমি একটা রিক্সা করে 'ইত্তেফাক' অফিসে গেলাম রাহাত খানের সঙ্গে দেখা করতে। তার 'এক প্রিয়দর্শিনী' এবং 'অমল ধবল চাকরি' আমি পড়েছিলাম। তিনি জানালেন যে তাঁর 'এক প্রিয়দর্শিনী' উপন্যাসের নায়ক কামাল খান আসলে তিনি নিজে। ১৯৭৬ সালে তদন্তমূলক সাংবাদিকতার উপর একটা প্রশিক্ষণের জন্য তিনি মাস তিনেক জার্মানিতে ছিলেন। তাঁর সেই সময়কার জীবনই এই উপন্যাসের বিষয়।

'ইত্তেফাক' থেকে রাহাত খান আমাকে শান্তিনগরে জুবাইদা গুলশান আরার বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। তিনি জানালেন যে তাঁর 'অশ্রু নদীর ওপারে'

বিদ্রোহী কবি যেখানে চির নিদ্রায় শায়িত

৮৯ পৃষ্ঠায় দেখুন

শাখাপ্রশাখা: সত্যজিৎ রায় যখন সত্যজিৎ রায়কে অতিক্রম করে যান

ভারতীয় সংস্কৃতির জগতের প্রবাদপুরুষ সত্যজিৎ রায়ের হাতের ছোঁয়ায় ইদানিং টালিগঞ্জের স্টুডিও পাড়ায় নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে। সত্যজিতের নবীনতম ছবি 'শাখাপ্রশাখা'র কাজ এখন পুরোদমে চলেছে টালিগঞ্জে ইন্দ্রপুরী স্টুডিও ও সুখনার লোকেশনে। যদি সবকিছু পরিকল্পনা মাফিক এগোয় তবে আগামী এপ্রিলের আগেই স্যুটিং-এর কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। তারপর ছবির প্রযোজক ও পরিচালকের আলোচনায় স্থির হবে শুভমুক্তির দিনক্ষণ। ততদিন পর্যন্ত বাংলা তথা বিশ্বের চলচ্চিত্রমোদী ও শিল্পরসিকদের আকুল প্রতীক্ষা। সত্যজিতের কথায় 'শাখাপ্রশাখা' দিয়েই আমি আবার প্রকৃত সিনেমার জগতে ফিরে এলাম। গণশত্রুর মত এ ছবিকে থিয়েট্রিক্যাল মনে হবে না, উপস্থাপনা পুরোদস্তুর সিনেমাটিক। পুরনো দিনের সত্যজিৎকে আবার ফিরে পাওয়া যাবে এ ছবিতে। কারণ এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। ডাক্তারের নির্দেশে চার দেওয়ালের মধ্যে আটকা থেকে স্যুটিং করতে হবে না।' স্বয়ং সত্যজিৎ যখন নিজের ছবি সম্পর্কে এ হেন সার্টিফিকেট দেন তখন 'শাখাপ্রশাখা' যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের আরেকটি নতুন মাইলস্টোন হতে চলেছে সে বিষয়ে সংশয় থাকে না।

'শাখাপ্রশাখা'র মূল কাহিনী সত্যজিতের নিজেরই লেখা। আজ থেকে প্রায় বারো বছর আগে প্রথম প্রকাশ কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'এক্ষণ' পত্রিকায়। গল্পের পটভূমি বিহারের হাজারিবাগ সংলগ্ন অভ্রখনি অঞ্চল। সময় ১৯৯০ সাল। গল্পের শুরু খনি অঞ্চলের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী আনন্দ মজুমদারের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্থানীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। সৎ, আদর্শবাদী এবং খুব সাধারণ অবস্থা থেকে পাদ প্রদীপের আলোয় উঠে আসা আনন্দবাবুর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হঠাৎই তাঁর হার্ট অ্যাটাক হয়। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে তাঁর চার সন্তান এসে হাজির হয়। বড়ছেলে (হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়) কলকাতার এক নামী সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার, যার কাছে বাবার আদর্শবাদের কোন মূল্য নেই। সামাজিক প্রতিষ্ঠাই একমাত্র কাম্য। মেজছেলে (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) বিদেশে থাকাকালীন দুর্ঘটনায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বাবার কাছেই থাকেন। পুত্র প্রবীর (দীপংকর দে) পিতার পুরনো ধ্যান ধারণা ও আদর্শের ঘোর বিরোধী এবং ছোটছেলে প্রতাপ (রঞ্জিত মল্লিক) আদর্শবাদী এবং কঠোর বাস্তবের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে অভিনয়ের জগতে আশ্রয় খোঁজেন।

সবাই একত্রিত হলে আদর্শ ও মূল্যবোধের সংঘাত দানা বেঁধে ওঠে। সনাতন মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে আধুনিক উচ্চবিত্ত মানসিকতার। গল্প শেষ হয় মানবিকতার ও আদর্শের প্রতি আশার সুর বজায় রেখেই। তবে চিরকালীন সত্যজিতের মত এ ছবিতেও পরিচালক কোনও তত্ত্বের বা মতবাদের গণ্ডীতে দর্শকদের বেঁধে রাখার চেষ্টা করছেন না। বরং দর্শকরা তাদের নিজের মত করে উপসংহার টানার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত স্বাধীন। প্রসঙ্গত বাংলা চলচ্চিত্র জগতে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হলেও রঞ্জিত মল্লিক সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে এই প্রথম ডাক পেলেন অভিনয়ের জন্য। সতজিৎ এই প্রসঙ্গে জানালেন, 'রঞ্জিৎ বেশ বড় মাপের অভিনেতা, এর আগে যোগ্য চরিত্রে সুযোগ না থাকায় তাকে ব্যবহার করা যায় নি।' এই বইতে ছোট ছেলে হিসেবে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন রঞ্জিৎ মল্লিক। আকর্ষণীয় চরিত্রে আকর্ষণীয়তম অভিনয় করেছেন মমতাশংকর।

'শাখাপ্রশাখার প্রযোজনা ও পরিবেশনার দায়িত্বে আছে 'এরাটো ফিল্মস'। ফরাসী চলচ্চিত্রের সেক্স সিম্বল জেরার্ড দেপার্দিউ ও প্লাতিয়েরে এই সংস্থার কর্ণধার। শ্রী রায়ের পূর্ববর্তী ছবি 'গণশত্রু'র প্রযোজক এন·এফ·ডি সি'র কর্মপদ্ধতির সঙ্গে পরিচালকের বনিবনা হচ্ছিল না দীর্ঘদিন ধরেই। সত্যজিৎ আর সন্দীপের মতে 'গণশত্রু' দেশে ভাল ব্যবসা করে উঠতে পারেনি, মূলত এন এফ সির গাছাড়া প্রচার পরিকল্পনার জ এমন কি বিনা নোটিশে হল থে ছবিগুলি তুলে নেওয়া হয়েছে। এ প্র সত্যজিতের মতামতের নাকি কো অপেক্ষা করা হয় নি। 'শাখাপ্রশা ছবিটির নির্মাণে আর্থিক এবং যাবত সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন ফর প্রযোজক সংস্থাটি।

সন্দীপ রায়ের মতে ভারত ফ্রান্সের এই যৌথ উদ্যোগে লাভ হবেন সাধারণ শিল্পী টেকনিশিয়ানরাও। আর পাঁচটা বা ছবির তুলনায় পারিশ্রমিক অনেক বে দেওয়া হবে। তাছাড়া কলকাত টেকনিশিয়ানরা সুযোগ পাবেন পাশ্চাত্যে উন্নত টেকনোলজির সঙ্গে কাজ করা যেমন, এ ছবিতে আউটডোর স্যুটিং ছ কোথাও 'ডাবিং' এর প্রয়োজন হবে ন কৃত্রিম সাউণ্ড ব্যবহার না করায় সাউ গুণগত মানেরও উন্নতি হবে। সন্দ রায়ের ভাষায়, টেকনিক্যাল দিক দি বিচার করলে 'শাখাপ্রশাখা' অবশ আর পাঁচটা ভারতীয় ছবির তুলন আলাদা।

পরিচালক জীবনের দী অসামান্য উজ্জ্বল পথ অতিক্রম ক আসা সত্যজিৎ রায়ের কাছে সীমা এ একটাই। সে সীমা তিনি নিজে 'শাখাপ্রশাখা' দিয়ে এবার তিনি বোধ নিজেকেই অতিক্রম করতে চলেছেন।

সৌমেন চৌধুর

দুই বোন, দুই জন: ছবিতে গানে আধ্যাত্মিকতার আলো

একজনের নাম শুভ্রা চ্যাটার্জি। জগৎ তাঁর চার দেওয়ালের মধ্যে। সামনে ক্যানভাস, তুলি, নানান রঙ, এবং মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষের মধ্যে স্বপ্ন। শুভ্রার চেতনায়, সত্তায় পুরোপুরি একটি শিল্পীমন। এবং তার প্রতিফলন তাঁর সামনে রাখা ক্যানভাসে। ছবি আঁকার তালিম দিয়েছেন ওয়াসিম কাপুর। ভারতের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে শুভ্রার ছবি প্রদর্শি প্রশংসিত। জলরঙে আঁকা তাঁর ছবি বিষয় গাছ, পাতা। প্রকৃতি তাঁকে আ করে টানে—সেই ছেলেবেলা থেকে জানালেন, রক্তের মধ্যে আ আধ্যাত্মিকতা, পারিবারিক সূত্রে। ত তাঁর ছবিতে ঝরা পাতায় এক অন্তমি জীবনের বেদনার সুর। অন্যজন হলে দেবযানী চাটার্জি। দেবযানী নিবেদি

সুরের কাছে, সুরব্রহ্মের কাছে। সেই জগত যেখানে ছায়া ফেলে আশাবরী, ভৈরবী, টোড়ি। আর বেহাগ, মালকোষ, দরবারীর বিষণ্ণতা ঘোরাফেরা করে শ্রোতার বুকের মধ্যে। মমতায় এবং নির্মমতায় আনন্দে এবং অশ্রুতে। তরুণী. সুন্দরী দেবযানী চ্যাটার্জি সঙ্গীত শিল্পী। ন্যাশনাল স্কলারশিপ প্রাপ্তা দেবযানী দুরদর্শন এবং আকাশবাণীর একটি পরিচিত মুখ। লঘু সঙ্গীতেও তিনি দক্ষ, এছাড়া দেবযানী কত্থক নৃত্যেও এক কৃতী শিল্পী। আরব সাগরের তীরে ভারতীয় সিনেমার 'মক্কাতে' বাংলার দেবযানী এবার আমন্ত্রিত। আর গঙ্গার উজান বেয়ে আরব সাগরের পথে দেবযানীর এই যে যাত্রা সুরের সাম্পান নিয়ে।

প্রদ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়তীর জয়যাত্রা: কলকাতার নাচমহলে অস্ট্রেলিয়ার ফুল

ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যকলায় পারদর্শিনী জয়তী দাশ সুদূর অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ শহর থেকে কলকাতায় এসেছেন নৃত্য পরিবেশন করতে। ২২শে মার্চ সন্ধ্যায় তা পরিবেশিত হল অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে। শিল্পী ওই দিন সন্ধ্যায় উপস্থাপনা করলেন ওড়িশি নৃত্যশিল্পী সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর পরিচালনায় ওড়িশি নৃত্য 'মঞ্চপ্রবেশ'।

কলকাতায় জয়তীর অনুষ্ঠান এই প্রথম নয়। এর আগেও দুবার এখানে নৃত্য পরিবেশন করেছেন। জয়তীর প্রথম নৃত্যানুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৮৬ তে বিড়লা অ্যাকাডেমি-র মঞ্চে। ষোল বছরের কিশোরী জয়তী সেইদিন পরিবেশন করেছিলেন ভরতনাট্যম। জাতিস্বরম্‌, শব্দম্‌, বর্ণম্‌, ও তিলানার প্রতিটি ভঙ্গির মাধ্যমে তিনি দর্শকের কাছে নিজেকে এক প্রতিশ্রুতিপূর্ণ শিল্পী হিসেবে প্রমাণিত করেছেন। এর পর জয়তী তাঁর দ্বিতীয় নৃত্য উপস্থাপনা করেন ১৯৮৭ সালে 'রঞ্জনা' সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আয়োজিত 'আইস স্কেটিং রিংক' মঞ্চে। এদিনও তিনি পরিবেশন করেছিলেন 'ভরতনাট্যম'। এবার আমরা পেলাম তাঁর নৃত্যের ওড়িশি ব্যাঞ্জনার ঋদ্ধ প্রকাশ।

জয়তী অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী ভারতীয়। ইচ্ছে থাকলে ভারত থেকে বহুদূরে থেকেও যে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে নিজেকে প্রোথিত করে রাখা যায় জয়তী তারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। ১৯৭১ এ কলকাতায় জয়তীর জন্ম। দশ বছর বয়স থেকেই অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তখন থেকেই ওদেশে ভারতীয় ধ্রুপদী নৃত্যের শিক্ষণ কেন্দ্র 'ভারতালয়'-এ নৃত্যশিক্ষার শুরু। নৃত্যগুরু চিত্রভানু তাঁর এই প্রিয় শিষ্যাকে মাত্র তের বছর বয়স থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনার সুযোগ করে দেন। মা বাবা উভয়েই এ ব্যাপারে প্রচুর উৎসাহ জুগিয়েছেন। মালয়েশিয়ার বিভিন্ন স্থানে জয়তীর নৃত্য পরিবেশিত হয়। প্রবাসের মায়াময় হাতছানি এড়িয়ে এরপর জন্মভূমির ডাকে জয়তী আসেন কলকাতায়। ভরতনাট্যমের পীঠস্থান দাক্ষিণাত্য থেকে ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিক দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও জয়তী যে নৃত্যপটুতা এখানে দেখান তা নিঃসন্দেহে সর্বজনস্বীকৃত। এরপর ভরতনাট্যমের সঙ্গে সঙ্গে ওড়িশি নৃত্যশিক্ষণও শুরু হয় গুরু চিত্রভানুর কাছে।

জয়তী সেই বিরল নৃত্যশিল্পীদের অন্যতম যাঁরা একই সঙ্গে ভরতনাট্যম আর ওড়িশি-র মত দুটি দুরুহতর নৃত্যশৈলীতে সাবলীল দক্ষতা দেখাতে পেরেছেন।

আলপনা ঘোষ

জলসার শিরোমণি: রাগ সংগীতের দুটি মাধুর্যময় রাত্রি

২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি '৯০ এশিয়ান পেইন্টসের আয়োজনে অষ্টম শিরোমণি পুরস্কার উৎসব উপলক্ষে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হল দুরাত্রি ব্যাপি এক রাগ-সঙ্গীতানুষ্ঠান। ২২ তারিখে সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ১০ টা পর্যন্ত এবং পরের দিন শিবরাত্রিতে সারারাত ব্যাপি ধ্রুপদী গানের জলসায় মেতে উঠেছিল নেতাজী ইনডোর। প্রথম সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ অজয় চক্রবর্তী। ধ্রুপদী রাগ সঙ্গীতের প্রসঙ্গে আলোচনা হল। ঠুমরী, টপ্পা, ভক্তিগীতিগুলির সঙ্গে মিলেমিশে শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপিত করা হল আধুনিক গান, রজনীকান্ত- দ্বিজেন্দ্র গীতি, রবীন্দ্রনাথের গান এবং নজরুল সঙ্গীত। সুর সম্রাট ভীমসেন যোশী অসম্ভব পরাক্রমতায় তুঙ্গে তুলে ধরলেন তাঁর গলা--অবিরত মুর্চ্ছনায় বেরিয়ে এল বিশিষ্ট ভোকাল ক্ল্যাসিকালের নানা দিগন্ত। ঠুম্‌রী এবং টপ্পার রানী গিরিজাদেবী গাইলেন তাঁর নিজস্ব ঘরাণায়। কখনো ইমন কল্যাণ, দেশ, ভৈরবী রাগে চলছে গান। কখনো রবি কিচলু আর বিজয় কিচলু ধরছেন আগ্রা ঘরাণার রাগপ্রধান খেয়ালি সঙ্গীত।

অনুষ্ঠানে রাগ সঙ্গীতের পাশাপাশি বোধহয় লঘু সঙ্গীতের বা অন্য ধরণের গানের প্রয়োজন বিবেচনা করেছেন কর্তৃপক্ষ। তাই হৈমন্তী শুক্লা বা সুবিনয় রায় এর গলায় ধ্বনিত হল রজনীকান্ত,
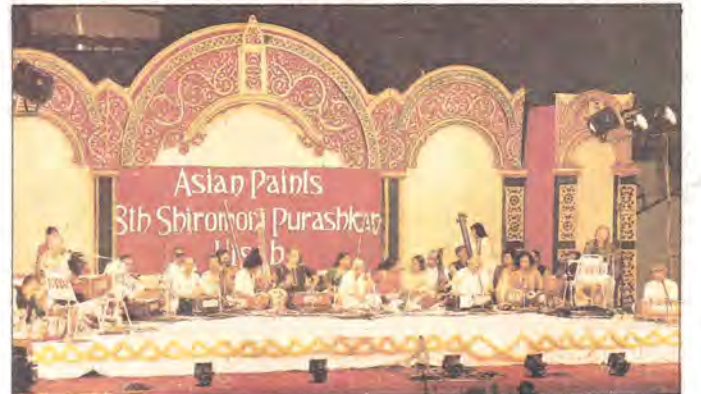
দ্বিজেন্দ্র বা রবীন্দ্রসঙ্গীতের গান, তার সুরলহরী। অতুলপ্রসাদের গানের একটি অংশ শোনালেন অজয় চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন ধীরেন মিত্র, তিনি শোনালেন তাঁর বহু-বিশ্রুত নজরুল সঙ্গীত। উচ্চ পর্যায়ের রাগ আর লঘু সঙ্গীতের মহামিলন ঘটল এই সন্ধ্যায়। নির্দ্ধারিত সময় শেষ হয়ে এসেছিল তাই শ্রোতাদের অপূরিত বাসনা জমা রাখতে হল আগামী কালের জন্য।

কিন্তু সে অপেক্ষা পরদিন সন্ধ্যায় আবার প্রদীপ শিখার মত জেগে উঠল। আজকের পরিচালনভার নিয়েছেন রবি কিচলু স্বয়ং। শুরু হল তাঁর সরস্বতী বন্দনা দিয়ে। তারপর একের পর এক চলতে লাগল গিরিজাদেবীর ঠুমরী, টপ্পা। রবি কিচলুর আগ্রা ঘরাণার শাস্ত্রীয় সঙ্গীত। সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারা। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের পুজা সঙ্গীত। সুকুমার মিত্র গাইলেন নজরুল সঙ্গীত সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান। এমন সময় পল্লী বাংলার গানে প্রায় জাগরণী সঙ্গীতের মতই অমর পালের আবির্ভাব-'প্রভাত হইল…' এবং অন্যান্য গান। আসর মাতিয়ে দিলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। কখনো টপ্পা কখনো রাগপ্রধান ভক্তিগীতি কখনো বা দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যগীতি। গিরিজাদেবী, রবি কিচলু এবং অজয় চক্রবর্তী--সুচিত্রা মিত্র এবং অন্যান্যদের গাওয়া বাংলা গানের রাগের সঙ্গে প্রাচীন রাগ, হিন্দি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ রাগে গাইলেন। দেখালেন একই রাগ কিভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন লোকসঙ্গীত বা ধ্রুপদী গানের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে এই বিশাল দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গীত সংস্কৃতিতে।

প্রথম পর্বের কিছুক্ষণের বিরতির পর শুরু হল শেষ দিনের দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান। ভক্তিগীতি--ভজনই এই পর্বের নির্দ্ধারিত গান। এই স্মরণীয় ভজনগুলি যথাক্রমে পরিবেশন করলেন সুনন্দা পট্টনায়েক, সুলোচনা বৃহস্পতি, অজয় চক্রবর্তী, গিরিজাদেবী এবং ভীমসেন যোশী। এই হৃদয়মধুর ও মননসমৃদ্ধ সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গতে অংশগ্রহণ করেছিলেন সংশ্লিষ্ট জগতের খ্যাতিমান শিল্পী জাকির হোসেন ও সঞ্জয় মুখার্জি।

এক ধরনের সুর আবিলতায় ক্রমশই মজে উঠছিলেন দর্শককুল-- উপস্থিত সুধীমণ্ডলী। সত্যি কথা বলতে কি এই ধরনের উচ্চাঙ্গ মূল্যবান সঙ্গীতের বাছাই অনুষ্ঠান কলকাতায় খুব বেশি হয় না। কলকাতাবাসীর কাছে তাই এই দুদিনের উপহার ছিল এক দুষ্প্রাপ্য সুযোগের মত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট ঘরাণার এই সঙ্গীত সম্মেলনটি কলকাতাবাসীকে উপহার দেওয়ার জন্য আয়োজক এশিয়ান পেইন্টসকে ধন্যবাদ জানাতে হয়।

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল।

মঞ্চের মল্লিকা: নয়া দৃষ্টিকোণে নরনারী ভাবনার শক্তি

পিটার ব্রুকের 'মহাভারত'-এ দ্রৌপদী মল্লিকা সারাভাই এবার মঞ্চে এসেছেন এক সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ভূমিকা নিয়ে। মঞ্চের প্রযোজনাটির নাম 'শক্তি'। একটি ধুতি আর শার্ট পরে তিনি ফুটিয়ে তুলছেন এক গভীর নারী চরিত্র, ঝড় তুলেছেন রাজ্যে রাজ্যে। অসীম মনোযোগে বহু রাজ্য পরিক্রমা এবং অন্বেষণের পর তিনি নারী এবং নারীভাবনাকে বিশ্লেষণ করছেন নতুন দৃষ্টিকোণে, নতুন মাত্রায়। তাঁর এই নারী ভাবনারই মুগ্ধ ফসল হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে 'শক্তি'র বিশেষ চরিত্রটি। এ ভূমিকায় মঞ্চে অভিনয় প্রসঙ্গে মল্লিকা নিজেই বলেন, 'আমি নারী সম্পর্কে, নারী জগত সম্পর্কে তাবৎ পৃথিবীর মনোভাব নিয়ে কাজ করতে চাই।'

মল্লিকার এই আন্তরিক চাওয়াই জন্ম দিয়েছে 'শক্তি'র। 'শক্তি' হচ্ছে একটি থিয়েটার গ্রুপের আন্তর্জাতিক মানের কাজ। ইতিমধ্যেই নিমন্ত্রিত হয়েছে এডিনবার্গ এবং গ্লাসগো ফেস্টিভ্যালে। মল্লিকার দাবি, নারী বিষয়ে এই প্রযোজনা পাশ্চাত্য দেশগুলিতে অপ্রত্যাশিত সাড়া জাগিয়েছে!

'শক্তি' 'নারী-বিষয়ের' চেয়ে 'মানুষ' সম্পর্কেই বেশি কথা বলছে। কারণ পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ অর্থাৎ নারীরা কখনোই সত্যিকারের স্বাধীনতা পাবে না যতক্ষণ আর অর্ধেক তাদেরকে শোষণ করছেন। সুতরাং 'শক্তি'-তে পুরুষ এবং নারী সম্পর্কেই বক্তব্য রাখা হয়েছে শোষক এবং শোষিত দু'পক্ষই সমান অপরাধী।

'শক্তি' সাধারণ কথিত শক্তি নয়। শক্তি হচ্ছে সেই নারীশক্তি, যা পৃথিবীকে ঘোরায়। চালিত রাখে। এটি হচ্ছে গতিশক্তি, যা পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাকে নারী-আদর্শ অনুযায়ী জন্ম দেয়। কেরালার বোনদের আত্মহত্যা সাধারণ আত্মহত্যার মতন নয়। তাদের ব্লাউজে আটকানো স্যুইসাইডাল নোট অন্যান্য সাধারণ স্যুইসাইডাল নোটের মতন নয়। তারা একথা বলেনি 'আমাদের মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।' বরং তারা বলছে, 'আমরা প্রতিবাদ করছি। এ সমাজ ভণ্ড সমাজ। আমরা এই সমাজে অংশ গ্রহণ করতে অক্ষম।' এটি এক সাংঘাতিক প্রতিবাদ। এরই নাম শক্তি। এই চরম প্রতিবাদ সমাজের প্রতি এক মারাত্মক চ্যালেঞ্জ। এটাই শক্তি।

অড্রিয়ান লী বিখ্যাত মিউজিসিয়ান। তিনি একজন ক্লাসিক্যাল গীটারিস্টও। সবচে বড় কথা হল সমস্ত যন্ত্রের বিষয়েই তাঁর গভীর জ্ঞান। তাঁরই পরিচালনায় এই প্রোডাকশনে একদম নতুনভাবে সঙ্গীতকে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ছ'জন মহিলার সুন্দর ভঙ্গি সঙ্গীতের মাধ্যমেই বলা হবে। সুরই হবে এখানে ভাষা। অনেক দৃশ্যে শুধু মিউজিক চরিত্রাভিনয় করেছে। যা কখনোই শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক নয়। মিউজিসিয়ান হিসেবে 'শক্তি'তে কাজ করেছেন আরও দু'জন। একজন পারকিউশনে অন্যজন মণিপুরী মিউজিসিয়ান, ইনি জাজ-এ দক্ষ। এই তিনজন মিলে ৪০টি যন্ত্র বাজিয়েছেন শক্তিতে।

বিগত দেড় বছর ধরে মল্লিকা তিনটি নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে একটি টি·ভি· সিরিয়াল-এর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যে কোন কারণেই হোক তাঁর এই স্বপ্ন সফল হচ্ছে না। এবং সিরিয়ালটি দূরদর্শনের কব্জাতেই বন্দী হয়ে আছে। মল্লিকা এতে খুব বেদনাহত।

পিটার ব্রুকের দ্রৌপদী মল্লিকা এবার মঞ্চেও এক অবিসংবাদিত নাম হিসেবে নিজেকে হাজির করেছেন। তাঁর সদম্ভ ঘোষণা 'আমি সামাজিক মনোভাব পাল্টানর জন্য নিরন্তর এরকমই কাজ করে যাব।'

গুরুপ্রসাদ মহান্তি

৮৫ পৃষ্ঠার পর

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। তিনি উপন্যাসটির একটি কপি আমাকে দিলেন। আমি আলম সাহেবের বাসায় ফিরে দুপুরের মধ্যেই উপন্যাসটা পড়ে ফেললাম। ইচ্ছে সন্ধ্যাবেলায় সুযোগ পেলে তাঁর সাক্ষাৎকারটা সেরে ফেলব। তবে সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে সাহিত্য–আসরে অন্যান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে কথা হলেও তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেল না। আসরের মধ্যেই এক ফাঁকে ঔপন্যাসিক রাবেয়া খাতুনের সঙ্গে কথা বলে নিলাম। জানলাম তাঁর 'পাখি সব করে রব' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। ঠিক হল পরের দিন সকাল নটার সময় তাঁর বাসায় যাব। এরপর কথা বললাম সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে। তাঁর 'শ্রোতবাহী নদী'র শুরুতে এটিকে আত্মজীবনী ভিত্তিক উপন্যাস' বলা হয়েছে। কিন্তু পরে এটিকে আমার উপন্যাস বলে মনে হয়নি। এখানে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার বর্ণনা আছে আর আছে বিভিন্ন সূত্র থেকে কিছু ঘটনা ও তত্ত্বের উল্লেখ। এসব কথা মনে রেখেই আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এটিকে তিনি আত্মজীবনী ভিত্তিক উপন্যাস বলে উল্লেখ করেছেন কেন। তিনি বললেন, 'উপন্যাসে যেমন নির্মাণ থাকে, এখানেও নির্মাণ আছে। আমি অনেক ঘটনা বাদ দিয়েছি। অন্য ঘটনাগুলি এমনভাবে নিয়েছি যার মধ্যে সম্পর্ক আছে।'

সাহিত্য আসর থেকে আমরা গেলাম ঔপন্যাসিক আবু রুশদের তোপখানা রোডের বাড়িতে। তাঁর 'শোভর' উপন্যাস আত্মজীবনীমূলক কি না সেটা জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তিনি জানালেন যে নোঙরের নায়ক কামাল চরিত্রে তাঁর জীবনের প্রক্ষেপ আছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় লতিকার সঙ্গে কামালের হৃদয়ের সম্পর্কও বাস্তব। তবুও এটিকে প্রকৃত অর্থে আত্মজীবনীমূলক বলা যায় না। বরং তাঁর 'সামনে নতুন দিন' উপন্যাসকে আত্মজীবনীমূলক বলা যায়। উপন্যাসের নায়ক হায়দার অনেকটাই ঔপন্যাসিক নিজে।

আনোয়ার পাশার স্ত্রী মমিনা পাশা

আবু রুশদের সঙ্গে কথা শেষ করে আমি আর গোলাম মোস্তাফা আনিসুজ্জামান সাহেবের বাড়িতে এলাম। তাঁর সঙ্গে সমস্ত দিনে কি করলাম তা আলোচনা করলাম। আগামী দিনের কর্মসূচীও আলোচনা করলাম। রাত দশটা নাগাদ আমি আলম সাহেবের বাসায় ফিরে এলাম। আনিসুজ্জামান সাহেব আমাকে আত্মজীবনীমূলক হতে পারে এরকম কয়েকটি উপন্যাস দিলেন। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর আমি রাজিয়া খানের 'বটতলার উপন্যাস' পড়তে লাগলাম।

ঢাকা যাবার আগেই আত্মজীবনীমূলক হতে পারে এরকম ওপার বাংলার যে কটি উপন্যাস আমি যোগাড় করতে পেরেছিলাম সে কটি পড়ে নিয়েছিলাম। ঢাকা গিয়ে আরও কয়েকখানি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের খোঁজে গেলাম। যেসব উপন্যাসিক বেঁচে আছেন আমি তাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করলাম। আর যাঁরা আজ আর নেই, আমি তাঁদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাঁদের সম্বন্ধে প্রকাশিত বইপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম। এ ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করলেন কবি রফিক আজাদ, আজহার ইসলাম, বেলাল চৌধুরী, হায়াৎ মামুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, শওকত আলী, রফিকুল ইসলাম এবং ওহিদুল আলম। যেমন চোদ্দ তারিখ সকালে সৈয়দ শামসুল হকের সঙ্গে দেখা করার কথা। কিন্তু তাঁর 'মৃগয়ায় কালক্ষেপ' উপন্যাসটা কোথাও কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। সেকথা জানতে পেরে রফিক আজাদ আমাকে নিয়ে লক্ষ্মী বাজারে ঔপন্যাসিকের ভাই রাজার কাছে নিয়ে গেলেন। রাজা তার ব্যক্তিগত কপিটাই শুধু আমাকে দিলেন না, নিজে থেকে বাংলা বাজারে এসে রফিক আজাদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর করে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বই আমাকে যোগাড় করে দিলেন।

চৌদ্দ তারিখ সকাল ৯টায় আলম সাহেব আমাকে সৈয়দ শামসুল হকের গুলশানের বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। তিনি জানালেন যে ১৯৭১–এ মুক্তি যুদ্ধের সময় তিনি লণ্ডনে গিয়ে ভগ্নীপতির বাড়িতে ছিলেন। তাঁর বাবা এসে পড়ায় সে বাড়ি ছেড়ে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হয়েছিল। তাঁর এই সময়কার জীবনটাই 'মৃগয়ায় কালক্ষেপ' উপন্যাসের বিষয়। উপন্যাসে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনা সত্য। তিনি যখন এসব বলছিলেন তখন ফোন এল। ফোনে তাঁর কথা শুনে আমি আশ্চর্য হলাম। কথাগুলি এরকম–হ্যাঁ···বলুন । ···আসলে–বলব···আমি শামসুল হক নই।···বাড়িতে থাকি।···কাল দুপুরে বা পরশুদিন সকালে।···ঠিক আছে। আমার কৌতূহল হতে লাগল কেন তিনি এরকম বলছেন। কিন্তু অযথা কৌতূহল ভাল নয়। আমি কৌতূহল দমন করে কাজের কথাই বলতে লাগলাম। 'মৃগয়ায় কালক্ষেপ' সম্পর্কে জানা শেষ হলে আমি 'খেলারাম খেলে যায়' প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম। তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে প্রচণ্ড দুঃখবোধ করলেন। বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'খেলারাম খেলে যায়' পড়ার পরে লোকে আমাকে ভদ্রলোক বলেই মনে করে না।···সব মিলিয়ে সৈয়দ শামসুল হকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার মনে রাখার মত। মনে রাখার মত রাজিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারও। চৌদ্দ তারিখে তাঁর সঙ্গে যখন কথা হল তিনি সরাসরি অস্বীকার করলেন যে 'বটতলার উপন্যাস' তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। কিন্তু তিনি নিজে থেকে বললেন যে 'চিত্রকাব্য' তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। সারা রাত জেগে উপন্যাসটা পড়ে পরের দিন যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম, তিনি অবান্তর কথাবার্তা বলে চললেন। একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন না।

বাংলাদেশে আমি ছিলাম মাত্র দু'সপ্তাহ। তার প্রায় সবকটা দিনই কেটেছে ঢাকায়। শুধু মাত্র দু'টি দিনের জন্য চট্টগ্রাম যেতে হয়েছিল। উনিশ তারিখ সকালে প্রভাতী মহানগর ধরে চট্টগ্রাম পৌঁছুলাম। গোলাম মোস্তাফা সঙ্গে ছিলেন। তাঁর দেব পাহাড়ের বাড়িতেই উঠলাম। বিকেলেই তাঁর কাজীর দেওড়ির বাসায় উমুরতুল ফজলের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি জানালেন যে 'উর্মি' তাঁর নিজের
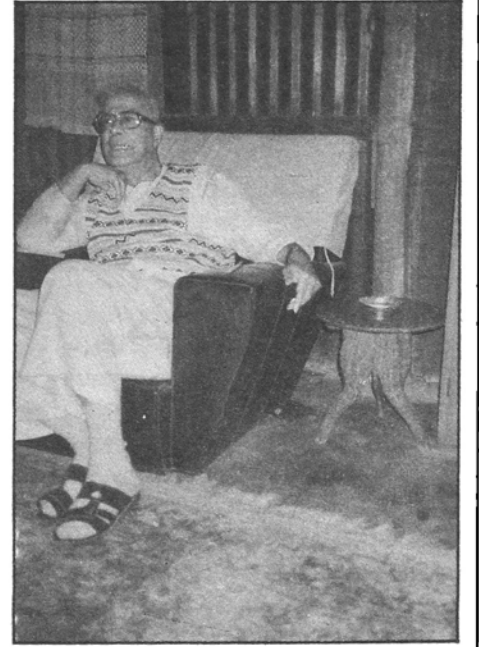
ঔপন্যাসিক আবু রুশদ

জীবনেরই কাহিনী। এতে কাল্পনিক ঘটনা নেই বললেই চলে। সত্যি কথাই গুছিয়ে লেখা হয়েছে। উমুরতুল ফজলের বাড়ি থেকে মুর্তজা বশীরের বাড়ি। কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। তাঁর স্ত্রী জানালেন যে তিনি ঢাকায় গেছেন। তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে ঢাকায় তাঁর সম্ভাব্য ঠিকানা জেনে নিলাম। পরের দিন মাহবুব-উল-আলমের 'মোমেনের জবানবন্দী' নিয়ে কথা বললাম তাঁর ভাই ওহীদুল আলমের সঙ্গে। সেই রাতেই ঢাকা ফেরার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু টিকিট না পাওয়ায় পরের দিন সকালে ফিরতে হল। ঢাকা ফিরেই আমি মুর্তজা বশীরকে খুঁজে বের করলাম। তিনি জানালেন যে 'আল্ট্রামেরিণ' উপন্যাস তাঁর আত্মজীবনীমূলক। এর ঘটনা এমন কি কথোপকথনেরও ৯৯·৯ ভাগ সত্য। নায়ক হাসান ওরফে বাবুল তিনি নিজে। আর নায়িকা মিতা সেন আসলে জয়া দাস। অন্যান্য চরিত্রগুলিও বাস্তবভিত্তিক।

মুর্তজা বশিরের সঙ্গে কথা বলে গেলাম কবি শামসুর রাহমানের বাড়ি। তাঁর কাছ থেকে তাঁর উপন্যাস 'অক্টোপাস' এবং 'অদ্ভুত আঁধার এক' এর কপি সংগ্রহ করলাম। রাতে পড়ে নিয়ে পরের দিন সন্ধ্যায় তাঁর সাক্ষাৎকার নিলাম। জানতে পারলাম যে উপন্যাস দু'টি আত্মজীবনীমূলক। ১৯৭১ সালে মুক্তি যুদ্ধের সময় তিনি ঢাকা ছেড়ে নরসিংহী হয়ে দেশের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই সময়কার জীবনই 'অদ্ভুত আঁধার এক' এর বিষয়। নায়ক নাদিম ইউসুফ তিনি নিজে। অন্যান্য চরিত্রগুলিও বাস্তবভিত্তিক। এমন কি নায়কের মামাতো বোন শাকিলাও। তবে শাকিলা বাস্তবে কে ছিল তা তিনি বলতে চাইলেন না। বললেন না 'অক্টোপাস' এর শারমিনের পরিচয়ও। তবে তিনি একথা বললেন যে চরিত্রগুলি বাস্তব এবং নায়ক ইশতিয়াক নিজে।

শামসুর রাহমানের সঙ্গে কথা হল বাইশ তারিখ সন্ধ্যায়। ইতিমধ্যে আমি সতের তারিখ সকালে শহীদুল্লাহ হলে গিয়ে ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে তাঁর 'দূরে কোথায়' উপন্যাস নিয়ে কথা বলে এসেছি। দেখা করেছি বেশ কয়েকজন ঔপন্যাসিকের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গেও। ষোল তারিখ আলম সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলাম আনোয়ার পাশার স্ত্রী মমিনা পাশার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে 'নীড় সন্ধানী' উপন্যাস নিয়ে কথা বললাম সেই ঘরে বসে যেখান থেকে ১৯৭১ এর ১৪ ডিসেম্বর আনোয়ার পাশা এবং তাঁর বন্ধু রাশীদুল হাসান অপহৃত হয়েছিলেন। আর তাঁদের পাওয়া যায় নি। কয়েক দিন পর পাওয়া গিয়েছিল তাঁদের মৃতদেহ। মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। সেই ভারাক্রান্ত মন নিয়েই কথা বললাম তাঁর ছেলে আফতার পাশার সঙ্গে যিনি সেই ঘটনার ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেন নি। তবুও তিনি আমাকে তাঁর বাবার জন্মভূমি ডাবকাই-এর কথা বললেন। বললেন বাবার মুখ থেকে শোনা কফিহাউসের কথাও।

আঠার তারিখ গোলাম মোস্তাফার সঙ্গে গিয়েছিলাম কল্যাণপুরে মুফিয়া মির্জার সঙ্গে দেখা করতে। মুফিয়া মির্জা দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন যে তাঁর স্বামীর 'ফিরে চলো' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। নায়ক আলমগীর খান তাঁর স্বামী মিরজা আবদুল হাই নিজে। আর রিজিয়া বেগম ওরফে মিসেস খান তিনি নিজে। তিন মেয়ে লীরা, মিলি, ইভু যথাক্রমে তাঁদের তিন মেয়ে লিপি, মিমি এবং আইভি। লিপি ওরফে তানজিনা মির্জাও বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও বললেন যে উপন্যাসে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনাই সত্য। মির্জা আবদুল হাই সরকারি চাকুরি করতেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় তিনি পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে আটকে পড়েন। স্ত্রী এবং তিন কন্যা নিয়ে সেখানে তিনি অনিশ্চিত জীবন যাপন করছিলেন। অবশেষে স্ত্রী কন্যাসহ পালিয়ে আফগানিস্তান হয়ে বাংলাদেশে আসেন। তাঁর সেই জীবনই 'ফিরে চল' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে মুফিয়া মির্জা এবং তানজিনা মির্জা উভয়েই সেই অনিশ্চিত জীবনে ঔপন্যাসিকের সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের সেই বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা উপন্যাসে কিভাবে এসেছে তা বিস্তৃতভাবে বললেন। সেসব কথা শুনে কল্যাণপুর থেকে আমরা গেলাম ধানমডি সাত মসজিদ রোডে জাহানারা করিমের সঙ্গে দেখা করতে। জাহানারা করিম জানালেন যে 'ফাল্গুন করা' তাঁর স্বামী নজমুল করিমের পরিবারের কাহিনী। তাতে ঔপন্যাসিকের বড়দা বজলুল করিমের কথা মূলত আছে। ঔপন্যাসিকের নিজের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। আমরা বজলুল করিমের সঙ্গেও কথা বললাম। তিনিও একই কথা বললেন। তাঁর নিজের উপন্যাস 'বেক বাগান রো' সম্পর্কেও তিনি বললেন যে এতে তাঁর জীবনের কথা এত কম আছে যে একে আত্মজীবনীমূলক বলা যায় না।

বজলুল করিমের সঙ্গে কথা হল বাইশ তারিখ। চব্বিশ তারিখ সকালে আমাকে কলকাতা ফিরতে হবে। হাতে আর সময় নেই। তাই বাজারে ঘোরাঘুরি করে প্রয়োজনীয় বইগুলো যথাসম্ভব জোগাড় করে নিলাম। এবার বিমানে সিটের ব্যবস্থা করতে হয়। তারজন্য আমার টিকিটটা আমি আলম সাহেবকে দিয়েছিলাম। তিনি যেটা দিয়েছিলেন এক ট্রাভেল এজেন্টকে। কিন্তু তেইশ তারিখ তাঁর কাছে গিয়ে দেখা গেল তিনি কিছুই করেন নি। আমি তো চোখে অন্ধকার দেখলাম। আলম সাহেবকে নিয়ে বিমান অফিসে গেলাম। সেখানে অনেক ধরাধরি করে তবে সিট পাওয়া গেল—তাও বেশি টাকা দিয়ে এক্সিকিউটিভ ক্লাসে। এই করতেই দুপুর হয়ে গেল। সন্ধ্যার সময় আবার আবু রুশদের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। ফলে, একটা জায়গা যে বেড়াতে যাব মনে করেছিলাম তা আর হল না। শুধু বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিটা দেখে নিলাম।

চব্বিশ তারিখ সকালে আলম সাহেব আমাকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দিলেন। বোর্ডিং কার্ড নিতে গিয়ে জানলাম যে বিমান ছাড়তে দেরি হবে। রজনীগন্ধা বিশ্রামগৃহে গিয়ে বসলাম। কিন্তু কিছুতেই বসতে পারছি না। ঘুমে চোখ এঁটে আসছে। এখানে দু সপ্তাহ ছিলাম। কিন্তু দুটো সপ্তাহ কিভাবে কেটে গেছে বুঝতেই পারি নি। সারাদিন একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি। আর রাতে ফিরে পরের দিন যে বইগুলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে সেগুলি পড়েছি। বইয়ের পাতার উপর দিয়েই রাতটা কেটে গেছে। পনের তারিখ রাতের কথাই ধরা যাক। পরের দিন সকাল বেলায় সামস্ রাশীদের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। তার জন্য রাতের মধ্যেই 'উপল উপকূলে' উপন্যাসটা পড়ে ফেলা দরকার। পড়তে লাগলাম। কিন্তু দু'টো খণ্ড মিলিয়ে আট শ তিরাশি পৃষ্ঠার উপন্যাস। প্রথম খণ্ডটাই শেষ হতে চায় না। এদিকে চোখও আর খোলা থাকে না। ঘুমিয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলাম। কিন্তু তাতেও ঢুলুনি এসে যায় অগত্যা চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে নিই। আবার পড়তে শুরু করি। অদূরে মোরগের ডাক শুনে চমকে উঠি। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। তখন শুলে আর উঠতে পারব না তাই হাত মুখ ধুয়ে কোথায় কোথায় যেতে হবে সেটা দেখতে থাকি। ঘুমে আর ক্লান্তিতে চোখ এঁটে আসে। এখনও আসছে। ঘুমিয়ে পড়ার ভয়ে আমি উঠে দাড়ালাম। বিমানের পক্ষ থেকে জলখাবার দিয়ে গেল। খেয়ে রজনীগন্ধার জানলা দিয়ে আমি অ্যাপ্রোণের দিকে তাকাতে লাগলাম। একটা সৌদিয়ার বিমান এসে দাঁড়াল। যশোর আর সিলেটের বিমান ছেড়ে গেল। চট্টগ্রামের বিমান ছাড়তে আরও দেরি হবে ঘোষণা করা হল। একটু পরেই শুনলাম কলকাতা যাবার জন্য বিমান তৈরি। নিরাপত্তা যাচাইয়ের পর আমি বিমানে গিয়ে বসলাম। বিমান আকাশে উঠল। বাংলাদেশ পড়ে থাকল। কিন্তু তার কথা বারবার মনে পড়তে লাগল। মনে পড়তে লাগল এখানকার মানুষের অত্যন্ত আন্তরিক ব্যবহারের কথা। তাঁদের আতিথেয়তার কথা। গবেষণার কাজে এখানে না এলে জানাই হত না যে এখানকার লোক এত আন্তরিকভাবে অতিথিপরায়ণ। আমার কাজ নিয়ে আমি যাঁর কাছেই গিয়েছি তাঁর কাছ থেকেই স্বতস্ফূর্ত সহযোগিতা পেয়েছি। যাঁর কাছেই গিয়েছি কিছু না কিছু খাইয়ে ছেড়েছেন। যাঁর কাছেই গিয়েছি ভাল ব্যবহার পেয়েছি। আমি আমার গবেষণার কাজে পশ্চিমবঙ্গেও অনেক জায়গায় অনেকের কাছে গিয়েছি। সেখানে খারাপ ব্যবহার না পেলেও এত আন্তরিক আর উষ্ণ ব্যবহার আমি পাই নি। তাই এখানকার লোকের আন্তরিক ব্যবহারে এবং আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ।

বাসু ভট্টাচার্য্যের সাম্প্রতিক ছবি 'পঞ্চবটী'

বিমল রায়ের সহকারী হিসাবে শিল্প-সম্মত ছবির প্রধান প্রধান গুণগুলি আয়ত্ব করে বাসু ভট্টাচার্য্য ছবির দুনিয়ায় নিজের স্বতন্ত্র স্বাক্ষর প্রথম রেখেছিলেন ওঁর 'তিসরী কসম'—এ। তারপর আর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। সৃষ্টিশীল এই চলচ্চিত্রকারের অতি সাম্প্রতিক ছবি নিয়ে এই প্রতিবেদন।

বেশ কয়েকবছর পর বাসু ভট্টাচার্য্য আবার ছবি নিয়ে জনতার দরবারে হাজির হতে যাচ্ছেন। এবারের ছবির নাম 'পঞ্চবটী'। ছবিটির নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন বাসু।

বিমল রায়ের সঙ্গে ওঁর সহকারী হিসাবেই ফিল্মের জীবন শুরু করেছিলেন বাসু ভট্টাচার্য্য। বিমল রায়ের সহকারী হিসাবে ভাল, শিল্প-সম্মত ছবির প্রাণধর্মের প্রধান প্রধান গুণগুলো আয়ত্ব করে বাসু ভট্টাচার্য্য ছবির দুনিয়ায় নিজের স্বতন্ত্র স্বাক্ষর প্রথম রেখেছিলেন ওঁর 'তিসরী কসম'—এ। সে ছবির সঙ্গে জড়িত ছিলেন রাজকাপুর আর শৈলেন্দ্রের মত দুই অনন্য প্রতিভা। রাজকাপুর আর ওয়েহিদা রহমানকে নায়ক-নায়িকা করে গ্ল্যামার বর্জিত জীবনের সহজ-সরল কথার সেই ছবিটি যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছিল একথা আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন।

ঠিক এরপরেই বাসু ভট্টাচার্য্য 'উসকী কাহানী' নামে একটি ছবি শেষ করেন একেবারে আনকোরা সব শিল্পীদের নিয়ে। তবে দুর্ভাগ্যবশত সেই ছবিটি জনতার দরবারে নানান কারণে পৌঁছোতে পারেনি, যদিও বার্লিন ফেস্টিভেলে ছবিটি দেখানোর জন্যে আমন্ত্রণ পেয়েছিল।

পঞ্চবটীতে দীপ্তি নাভাল

বাসুর এর পরের দুটি ছবি 'অনুভব' ও 'আবিষ্কার' ওঁকে আবার পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে ধরে। এই দুটি ছবিরই বিষয়বস্তু নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্ক। পরে, 'গৃহপ্রবেশ'—এরও বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে একই। এবার 'পঞ্চবটী'—ছবিতেও আবার সেই একই প্রসঙ্গ। দাম্পত্যবন্ধন ও নরনারীর স্বতন্ত্র সত্তা। এবারে একটি দম্পতিকে কেন্দ্র করে নয়, 'পঞ্চবটী' ছবিতে আমরা দেখব বাসু ওঁর বক্তব্য রাখছেন দুটি দম্পতিকে কেন্দ্র করে। এবারের বক্তব্যটি আরও গভীর। নরনারীর সামগ্রিক সত্তার প্রশ্নে উঠে এসেছেন বাসু ভট্টাচার্য্য। তাই দেখা যাচ্ছে বাসু নরনারীর প্রেম, দাম্পত্য জীবন এবং এই দাম্পত্যবন্ধনে নরনারীর স্বতন্ত্র সত্তার অনুভব, আবিষ্কার ও বিঘোষণ নিয়ে এক ধরনের অবসেসনে ভুগছেন। আর তাই ঘুরেফিরে ছবির দুনিয়ায় এ-ই হয়ে উঠছে ওঁর একমাত্র বক্তব্য বিষয়। জীবনের অন্য কোনো ক্লিশ্ট অবস্থা, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের কোনো অবক্ষয়ী চেহারা, মানুষের সংসারে জীবনযুদ্ধে পর্য্যুদস্ত বা সফল কোনো মানুষ বাসুর সৃজনশীল মনকে নাড়া দেয় না। ছবির জগতে বাসু একান্তভাবে ওঁর দেখা জীবন, বিশেষ করে দাম্পত্যজীবনের কথা নিয়ে হাজির হতে চান বার বার।

'আবিষ্কার' থেকে 'পঞ্চবটী'তে পৌঁছোবার আগে বাসু ভট্টাচার্য্য 'তুমহারা কাল্লু', 'ডাকু' আর 'স্পর্শ' নামেও তিনটি ছবি করেছিলেন। তবে সে-সব ছবি ছবির দুনিয়ায় তেমন কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। বাসু ভট্টাচার্য্যের ছবি হিসাবে কোনোটাই তেমন আলোচিত নয়। উল্লেখযোগ্যও নয়। অচিরেই

বাসু ভট্টাচার্য্য

ওঁর সে-সব ছবির কথা লোকেরাও ভুলে গেছেন। বাসুকে দর্শকেরা মনে রেখেছেন প্রধানত ওঁর 'তিসরী কসম', 'অনুভব', 'আবিষ্কার' আর 'গৃহপ্রবেশ'—এর জন্যে, যে-সব ছবিতে নরনারীর নিটোল প্রেম, ভালবাসার সত্যিকারের উন্মেষ, দম্পতির মধ্যে ব্যক্তিত্বের এবং সংঘাতের সূক্ষ্ম টানা-পোড়েন—এর কথাই বাসু আমাদের শুনিয়েছেন অভিজ্ঞ মানুষের মত। দেখেশুনে আমাদের মনে হয়েছে এই দুনিয়ার কথাই বাসুর ঠিক আয়ত্তের মধ্যে। এখানেই উনি স্থিতধী। তাই ছবির সৃজনকর্মে এধরনের বিষয়েই আমরা ওঁকে

সিনেমার পর্দায় কলকাতা শহর

চলচ্চিত্রের চালচিত্রে কলকাতা শহর বিভিন্ন সময়ে এসেছে বিভিন্ন ভঙ্গিমায়। এখানে বিশ্ববন্দিত দুই চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথা বলে চলচ্চিত্রে কলকাতার আগমন নিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে একটি সুচারু বিশ্লেষণ।

ছবি : কুমার রায়

সত্যজিৎ রায়

ছবি : গোপাল দেবনাথ

মৃণাল সেন

রমরমে হিন্দি সিনেমা। প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ। দর্শকরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে কাশ্মীরের শাহী উদ্যানে নায়ক নায়িকার নাচ দেখছেন। দৃশ্যপট পরিবর্তন হল। বোম্বাই-এর রাস্তায় মোটর সাইকেলে নায়কের পিছনে নায়িকা। গান অবশ্য তখনও চলছে। ভৌগোলিক সীমারেখাকে এরকম অনায়াসে কল্পনার রণপায়ে পেরিয়ে যাওয়া হিন্দি সিনেমার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। বাস্তব অবাস্তবের প্রশ্ন তুলে রাখাই ভাল। কিন্তু বাংলা সিনেমার নায়ক নায়িকাদের ভাগ্য সবসময় এত সুপ্রসন্ন হয় না। কারণ অবশ্যই টালিগঞ্জের পরিচালকদের অর্থভাগ্য এখনও বোম্বের পরিচালকদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারা; তাই এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ বাংলা ছবির পটভূমি এই তিনশ বছরের পুরনো কলকাতা শহর। গল্পের যদি কোন বিশেষ দাবি না থাকে, তাহলে এখনও বাংলা সিনেমার চরিত্ররা রেড রোড দিয়ে ট্যাক্সি চড়ে আসেন। রবীন্দ্র সরোবরের ধারে বসে থাকেন, ঝিলমিল অথবা ভিক্টোরিয়ায় বসে প্রেম করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রতিদিন বাসে ট্রামে বাদুড় ঝোলা হওয়া, জ্যামে আটকা পড়া অথবা লোডশেডিং-এ উত্যক্ত হওয়া দর্শকের কিন্তু পর্দায় কলকাতাকে দেখে মুগ্ধতার কোন অভাব ঘটে না।

কিন্তু এ তো গেল সাধারণ সিনেমার কথা। কলকাতা শহরের বদলে অন্য যে কোন শহর দেখালেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানে কোন পার্থক্য অনুভব করা যেত না। কিন্তু এমন সিনেমা বাংলায় তৈরি হয়েছে যেখানে কলকাতা শহরই হয়ে উঠেছে একটি চরিত্র। বোবা শহরের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে অজস্র কথা। ধোঁয়ায়-ধুলোয় ভরা এই শহরের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে মানুষের নতুন নতুন গল্প। কলকাতাকে এভাবে প্রথম আবিষ্কার করা যায় সম্ভবত ঋত্বিক ঘটকের 'নাগরিক' ছবিতে। মানুষকে তিনি যেন হঠাৎ আঘাত করেন। কলকাতা চমকে ওঠে নিজের সংকীর্ণতায়। এই বিশাল শহরে আশ্রয় মেলে না একটি ছোট পরিবারের। ঋত্বিক ঘটকের 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'তেও কথা ফোটে কলকাতার মুখে। বাংলা সংস্কৃতির পীঠস্থান এই শহর সেখানে উন্মুক্ত করে দেয় তার বুদ্ধিজীবীদের ক্ষয়িষ্ণুতা। শুধু ঋত্বিক ঘটক নন, বাংলার শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের বারবার আকর্ষণ করেছে এই শহর। কিন্তু কিসের এই আকর্ষণ? কোথায় লুকিয়ে আছে এর শিকড়? প্রশ্ন করা হল প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেনকে। তাঁর 'আকাশ কুসুম', 'কলকাতা-৭১', 'একদিন প্রতিদিন', 'খারিজ' প্রভৃতি বিভিন্ন সিনেমায় ঘুরেফিরে এসেছে কলকাতা শহর। এই পুনরাবৃত্তি কি মৃণালবাবুর কলকাতার প্রতি ব্যক্তিগত আকর্ষণ, নাকি শুধুমাত্র গল্পের প্রয়োজন? উত্তরে মৃণালবাবু জানালেন, ১৯৪০ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় পড়াশুনো করতে আসেন তিনি। ১৯৪৩-এর পর আর কখনও দেশে যান নি। কলকাতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ লুপ্ত করেছিল তাঁর স্বদেশপ্রীতি। দেশবিভাগও তাঁকে তাই তেমনভাবে নাড়া দেয় নি। সেই সময় বিশ্বযুদ্ধ এবং আনুপাতিক বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন-যেন সমস্ত বিশ্বের এক আনুবীক্ষণিক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছিল তাঁর কাছে, কলকাতা শহরের মধ্যে দিয়ে। সেই থেকে প্রতি মুহূর্তে-এই শহর তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে, উদ্বুদ্ধ করেছে, উজ্জীবিত করেছে। তাই কলকাতার নাগরিক জীবন নিয়ে ছবি করার সময় তাঁর মনে হয় এই শহরই যেন গড়ে তুলছে চরিত্রগুলিকে। কলকাতার নাকরিক মনস্কতার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর মতে 'আকাশ কুসুম' ছবিতে। নায়ক তার দোষ গুণ মিলিয়ে অবশ্যই একজন নির্ভেজাল কলকাতাবাসী বেকার। 'ভুবন সোম'-এর পটভূমি যদিও কলকাতা নয়, তবুও শ্রীযুক্ত সেন মনে করেন কলকাতা শহরের ছাপ সম্পূর্ণত রয়েছে ভুবন সোম চরিত্রটিতে। কলকাতা এক সম্পূর্ণ অননুমেয় শহর। হঠাৎ বৃষ্টিতে অচল হয়ে পড়তে পারে, হঠাৎ মিছিলে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে, আবার হঠাৎ আন্দোলনে উত্তালও হয়ে উঠতে পারে। তেমনই অবোধ্য ব্যক্তি ভুবন সোম। সেই কারণেই সিনেমার মধ্যে হঠাৎ অল্পক্ষণের জন্য চলে আসে কলকাতা শহর। 'কলকাতা-৭১'-এ দেখিয়েছেন বারুদ জমা কলকাতা। কলকাতাবাসী মধ্যবিত্তের সংকীর্ণতা ফুটে উঠেছে 'একদিন প্রতিদিন'-এ। মহানগরে বাস করেও প্রতিবেশীরা হস্তক্ষেপ করেন অন্যের ব্যক্তিগত জীবনে। অর্থাৎ এক একটি সিনেমায় কলকাতার নগর জীবনের এক একটি দিককে তুলে ধরেছেন তিনি। প্রশ্ন করলাম, 'প্রতিদিন এই শহরের সুবিধা অসুবিধার মধ্যে দিন কাটানর পর পর্দায় আবার সেই কলকাতাকেই দেখে মানুষ বিরক্ত হতে পারে বলে মনে করেন না?' মৃণাল সেন বললেন, 'তা সম্ভব নয়। কারণ
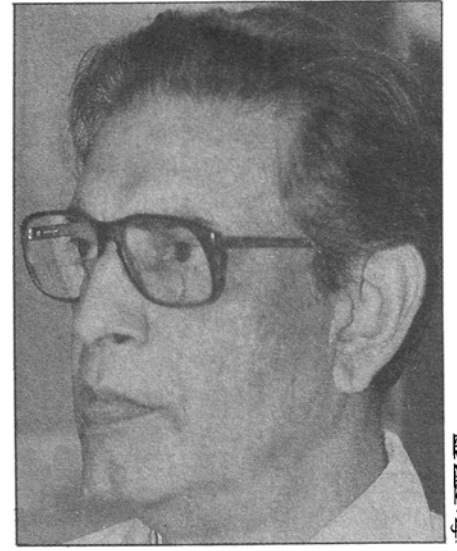
পর্দায় যখন একটি চরিত্রকে দেখে মানুষ তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তখনই ছবির আকর্ষণ বেড়ে যায়। যখন মানুষ দেখে যে, সে নিজে যে কথা বলতে পারে নি, পথের চরিত্ররা তাই বলছে তখনই সে নিজের দিকে ফিরে তাকায়। এ যেন আয়নায় নিজেকে দেখা। আর এই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে কলকাতা শহরেই। বারবার বহু ধরনের মানুষের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে চমকে উঠেছি।' মৃণাল সেনের মতে আজকের কলকাতার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ মধ্যবিত্তের পরিবর্তনশীল মানসিকতা। প্রতি মুহূর্তে তাদের মূল্যবোধ বদলে যাচ্ছে, দৃষ্টিভঙ্গী বদলে যাচ্ছে। কলকাতার দো-আঁশলা সংস্কৃতির তারাই ধারক ও বাহক। আজ তাই কলকাতাকে নিয়ে ছবি তৈরি করতে হলে তিনি তুলে ধরতে চাইবেন এই পরিবর্তনশীলতাকেই।

কলকাতা শহর সন্দেহাতীত ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায়। কথাবার্তার শুরুতেই শ্রীযুক্ত রায় জানালেন যে তাঁর চারটি ছবি–'মহানগর', 'সীমাবদ্ধ', 'প্রতিদ্বন্দ্বী' এবং 'জন-অরণ্য' তে কলকাতা শহর নিয়েছে প্রায় চরিত্রের ভূমিকা। কলকাতার নাগরিক জীবনের চারটি দিককে তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি। এই শহরের মধ্যবিত্ত মানসিকতা সবচেয়ে স্পষ্ট 'মহানগর'-এ। 'মহানগর'–এ বাস করেও মধ্যবিত্তের সংকীর্ণতা দূর হয় না। আবার এই মহানগরই অনায়াসে এক সাধারণ মেয়েকে করে তুলতে পারে আত্মনির্ভরশীল, আত্মসচেতন। 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ও 'জন অরণ্য'–এ আবার ফুটে উঠেছে বিপরীত ছবি। এত বড় শহর কলকাতা, এত অসংখ্য মানুষ সেখানে চাকরি করে অথচ আমাদের কেন চাকরি নেই? সত্যজিৎ রায় জানালেন যে 'জন অরণ্য'তে কলকাতার অন্ধকার জগৎকে তুলে ধরাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কারণ বেকারত্বের সঙ্গে দুর্নীতির প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 'সীমাবদ্ধ' বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অফিসারের উচ্চাশার গল্প। কিন্তু কলকাতা শহর এখানে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। মফঃস্বলবাসী টুটুলের কাছে কলকাতা স্বপ্নের শহর। কিন্তু এক্সিকিউটিভ শ্যামলেন্দু স্বপ্ন দেখে না। তার কারবার বাস্তবকে নিয়ে। শ্যামলেন্দুর কলকাতা অফিস, বাড়ি, ক্লাব আর রেসকোর্সে সীমাবদ্ধ। সত্যজিৎ রায় জানালেন যে তিনি কলকাতা ভিত্তিক সিনেমা সাদা কালোয় করা পছন্দ করেন। কারণ রঙ এই শহরকে বড় মায়াময় করে তোলে। রূঢ় বাস্তব ফোটে না। কলকাতা শহরের প্রতি এই বিশেষ পক্ষপাতিত্বের কারণ জানতে চাইলে সত্যজিৎবাবু বললেন যে এই শহরের নাগরিক জীবনের বৈপরীত্য তাঁকে আকর্ষণ করে। এই শহরের মানসিকতাকে কোন বিশেষ শ্রেণীতে ফেলা যায় না। কলকাতা যেন একইসঙ্গে আধুনিক আবার রক্ষণশীল অথবা প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রগতিশীল। আর এই টানা-পোড়েনেই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন ছবিতে।
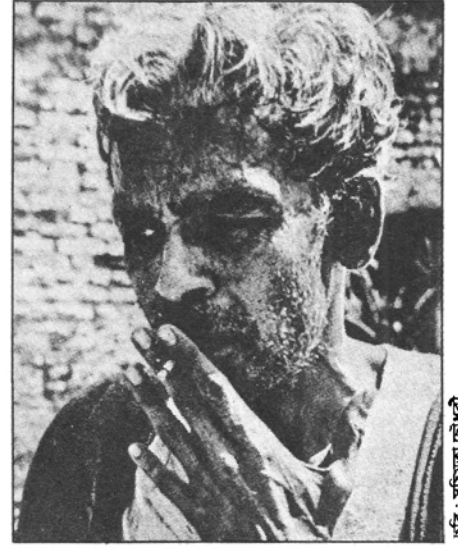
অর্থাৎ কারুর কাছে কলাকাতার বৈপরীত্য আকর্ষণীয়, কারুর কাছে সংকীর্ণতা। কেউ বা মধ্যবিত্তকে নিয়ে ভাবছেন আবার কেউ ভাবছেন বস্তিবাসীর কথা। কারুর মনে হয় কলকাতার দেওয়াল পরিষ্কার ঝকঝকে থাকলেই কলকাতা সুন্দর আবার কারুর মতে দেওয়াল লিখন আছে বলেই কলকাতা জীবন্ত। অবসান নেই তর্কের। আর এই মত পার্থক্য, চাপান–উতোরের খেলার জন্যই বোধহয় বাঙালি জীবনের নাম ভূমিকায় আজও আছে কলকাতা শহর।

দীপান্বিতা রায়

ছবি : সুস্মিতা চৌধুরী

ঋত্বিক ঘটক

'কলকাতার বৈপরীত্য আমায় আকর্ষণ করে। অন্য কোন শহরে এটা দেখা যায় না।'

–সত্যজিৎ রায়

প্র : কলকাতার তিনশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে সে বিষয়ে আপনার মতামত কি?

উ : কোন মতামতই নেই। কারণ আমি এ বিষয়ের কোন কিছুর সঙ্গে জড়িতও নই আর এ নিয়ে চিন্তা ভাবনাও করিনি।

প্র : কিন্তু একজন চিত্রপরিচালক হিসাবেও আমি আপনাকে প্রশ্নটা করি–আপনার অনেক সিনেমাতেই তো কলকাতা শহর এসেছে?

উ : হ্যাঁ। তা এসেছে।

প্র : কোন্ কোন্ সিনেমায় কলকাতা শহর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

উ : কলকাতা শহরকে ভিত্তি করে আমার চারটে সিনেমা আছে–'মহানগর', 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'সীমাবদ্ধ' আর 'জন অরণ্য'। প্রত্যেকটাতেই শহরের মানুষের জীবনের আলাদা আলাদা দিক দেখান হয়েছে।

প্র : একটু যদি বিস্তারিত ভাবে বলেন।

উ : যেমন ধরুন, 'মহানগর'–মেট্রোপলিটান সিটিতে মধ্যবিত্তের মানসিকতা এখানে ফুটে উঠেছে। 'জন অরণ্য' আর 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে বেকারের যন্ত্রণা। তবে 'জন অরণ্য' তে আণ্ডার ওয়ার্ল্ডকে তুলে ধরার একটা চেষ্টা ছিল। 'সীমাবদ্ধ' মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির এক্‌জিকিউটিভকে নিয়ে। এই চরিত্র কম বেশি সব শহরেই এক। তবে কলকাতা এখানে একটা নতুন মাত্রা দেয়। টুটুল আর শ্যামলেন্দুর কলকাতা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

প্র : আচ্ছা, আপনার এই চারটে সিনেমাই সাদা–কালো। এটা কি কেবলমাত্র বাজেটের কথা ভেবে, নাকি অন্য কোন কারণ আছে?

উ : বাজেটটা নিশ্চয়ই একটা কারণ ছিল। তবে আমি এখন হলেও ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটে করাই পছন্দ করব। কারণ রঙ ব্যাপারটাকে অনেকটা গ্লিটিফাই করে দেয়। কাঠিন্য আনা মুশকিল হয়। তবে আজকাল তো আর কেউ সাদা কালো ছবি দেখতে চায় না। তাই বাধ্য হয়েই রঙিন করতে হয়।

প্র : আচ্ছা, কলকাতার কি এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে, যা আপনাকে এই সিনেমাগুলো করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছে?

উ : কলকাতার একটা অদ্ভুত ডুয়াল ক্যারেক্টার আছে। এই শহরকে কোন ভাবেই ক্যাটাগোরাইজ করা যায় না। অদ্ভুত বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ। অন্য কোন শহরের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় না। এই ব্যাপারটা আমার ইন্টারেস্টিং মনে হয়।

প্র : আজকে যদি আপনি কলকাতাকে নিয়ে সিনেমা করবেন স্থির করেন, তাহলে কি বিষয় ভাবতে পারেন?

উ : সেটা কখনো এভাবে বলা যায় না। অনেক বিষয় আছে ভাবার। অনেক কিছু নিয়েই করা যায়। কলকাতার একেবারে নিচু তলার মানুষদের নিয়েও করতে পারি। তাদের নিয়ে তো এখনও পর্যন্ত তেমন কোন কাজই হয় নি।

৫

৮ পৃষ্ঠার পর

বলবৎ হবার পর হেরোইন বাজেয়াপ্তর পরিমাণ সরকারি হিসাব মত কুড়ি গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আভ্যন্তরীণ নজরদারি জোরদার করার পর ড্রাগ মাফিয়ারা চোরা চালানের কৌশল কিছু কিছু পরিবর্তন করেছে। চোরাপথে ড্রাগ চালান অব্যাহত রাখার জন্য সীমান্তের অন্য পথ ব্যবহার করতে শুরু করেছে। সম্প্রতি ভারত–নেপাল সীমান্ত ড্রাগ মাফিয়াদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। থাই হেরোইন ভারতে এই সীমান্ত দিয়েই বর্তমানে পাচার করা হচ্ছে।

ভারতে ম্যানডেক্স প্রস্তুত ১৯৮৪ সাল থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গোপন ল্যাবরেটরিতে ম্যানডেক্স তৈরি হচ্ছে কিনা এখন পর্যন্ত তার নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে নেশার ড্রাগের বিরুদ্ধে নজরদারি জোরদার করার ফলে কিছু কিছু ম্যান-ডেক্স ধরা পড়েছে। আফ্রেকিয়ানদের কাছ থেকে ভারতে ঢোকার মুখে এই ম্যানডেক্স ধরা পড়েছে। ১৯৮৩ সালে ভারতে কোন কোকেন বাজেয়াপ্তর নজির নেই। তবে পরবর্তী বছরে বেশ কিছু পরিমাণ কোকেন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সম্ভবত এখনও গোপন পথে ভারতে কোকেন পাচার অব্যাহত আছে। নেশার ড্রাগের মধ্যে আফিং সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। পপি থেকে আফিং তৈরি হয়। ভারত ও তুরস্ক কেবল এই দু'টি দেশই আন্তর্জাতিক আইনা-নুসারে আফিং প্রস্তুতকারী দেশ হিসাবে স্বীকৃত। অন্যান্য দেশে যেভাবে আফিং তৈরি হয়, তাতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নেই। তুরস্ক অবশ্য ১৯৭৪ সাল থেকে আফিং উৎপাদন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে স্বীকৃত দেশ হিসাবে একমাত্র ভারতে সর-কারের কঠোর নজরদারি ও ব্যবস্থাপনায় আফিং তৈরি হয়। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে আফিং তৈরির ব্যবস্থা আছে।

১৮২০ সালে উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে দেশের প্রথম আফিং তৈরির কারখানা বসানো হয়েছিল। উদ্দেশ্য কোন একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আফিং সরবরাহ। বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও আফিং ব্যবহারে কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। নিষিদ্ধও ছিল না। নানা জাতীয় ওষুধে আফিং নিয়মিত ব্যবহার করা হত। সেই সময় ওষুধের সঙ্গে আফিং মিশ্রণের কথাও উল্লেখ থাকত না। পৃথিবীতে সালফা ড্রাগের ব্যবহার শুরু হবার আগে পর্যন্ত আফিং যন্ত্রণা নিবারক, ও আমাশয় নিরাময়ের দাওয়াই হিসাবে ব্যবহার হত।

শারীরিক যন্ত্রণা উপশমের কার্যকর ওষুধ হিসাবে মরফিন ব্যবহৃত হত। আফিং থেকে মরফিন তৈরি হয়। এক ডোজ মরফিনে কুড়ি শতাংশ আফিং থাকে। সাদা স্ফটিক, বড়ি বা ইনজেকশন হিসাবে মরফিন বাজারে বিক্রি হয়। গন্ধহীন এবং স্বাদে তেতো। আফিং থেকে মরফিন সহজেই তৈরি করা যায়।

হেরোইন বর্তমানে বহু উচ্চারিত নাম। কম-বেশি সকলেই এই নামের সঙ্গে পরিচিত। ১৮৭৪ সালে মরফিন থেকে হেরোইন সিন্থেসাইজ করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হলেও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে হেরোইনের ব্যবহার বিশেষ ছিল না। আবিষ্কারের বহু বছর পর বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন–হেরোইনের মধ্যে আসক্ত করার শক্তি রয়েছে। খাঁটি হেরোইন সাদা রংয়ের গুড়ো এবং স্বাদে তেতো। আজ হেরোইনের রূপান্তর ঘটেছে। এর সঙ্গে নেশা বৃদ্ধি ও উত্তেজক কিছু দ্রব্য ব্যবহার করা হচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর এই আবিষ্কার–বর্তমানে বিংশ শতাব্দীর অভিশাপ। একবিংশ শতাব্দীতে পা–রাখার আগেই হেরো-ইনকে পৃথিবী থেকে নির্বাসন দিতে না পারলে যুবশক্তি পঙ্গু হয়ে যাবে।

ক্র্যাক নেশার জগতে একটি নতুন সংযোজন। সাধারণ সোডার সঙ্গে কোকেন সিদ্ধ করে ক্র্যাক্ তৈরি করা হয়। সঙ্গে অ্যামোনিয়া দেওয়ায় ফট্ ফট্ শব্দ হয়। শব্দের জন্যেই এই নেশার নাম রাখা হয়েছে ক্র্যাক্। মারিজুয়ানা থেকে ক্র্যাকে দশগুণ বেশি নেশা হয়।

বিদেশি নাম মারিজুয়ানা, ভারতে গাঁজা হিসাবে পরিচিত। চরস বা ভাং গাছের পুষ্পিত অংশ থেকে মারিজুয়ানা তৈরি হয়। অনাবৃত ও অবহেলার মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে এই গাছ আমাদের দেশে জন্মায়। ক্যানাবিজের সুদৃশ্য পত্র–পল্লব থেকে ভাং তৈরি হয়।

হ্যাশিশ বর্তমানে পরিচিত নাম, ধুনোর মত দেখতে ক্যানাবিজের রস। এই রসকে শুকিয়ে বিভিন্ন মাপের সীট্, বল ও কেক তৈরি করা হয়।

কোকেনের নামের সঙ্গেও অনেকেই পরিচিত। কোকা গাছের মোমের মত পাতার রস থেকে কোকেন তৈরি হয়। এই গাছ ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশেই পাওয়া যায়। অবশ্য আমাদের দেশে এই গাছ জন্মায় না। কোকেন এক রকম স্বচ্ছ পাউডার। নস্যির মত নাক দিয়ে টানতে হয়। আমেরিকার বিজ্ঞানীরা সিন্থেসাইজড্ কোকেন তৈরি করেছেন। প্রাকৃতিক কোকেনের অভাব ঘটলেও আবিষ্কৃত সিন্থেসাইজড্ কোকেন–ড্রাগ মাফিয়ারা নিজেরাই তৈরি করে নিচ্ছে।

ক্র্যাক নেশার জগতে একটি নতুন সংযোজন। সাধারণ সোডার সঙ্গে কোকেন সিদ্ধ করে ক্র্যাক্ তৈরি করা হয়। সঙ্গে অ্যামোনিয়া দেওয়ায় ফট্ ফট্ শব্দ হয়। শব্দের জন্যেই এই নেশার নাম রাখা হয়েছে ক্র্যাক্। মারিজুয়ানা থেকে ক্র্যাকে দশগুণ বেশি নেশা হয়।

যে সব নেশার ড্রাগের ইতিবৃত্ত এই নিবন্ধে আলোচিত হল সে সব নেশার ড্রাগের সন্ধানে মেয়েরাও ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মাদকের মত্ততা গ্রামা-ঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে কি না, এখন পর্যন্ত তার কোন সরকারি প্রমাণ নেই। তবে শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে দেশের বড় বড় শহরগুলিতে নেশাখোর বা ড্রাগ অ্যাডিকট্ মহিলার সংখ্যা বর্তমানে উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী মাদকাসক্ত মানু-ষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ। অর্থাৎ আশি কোটি মানুষের মধ্যে ষোল কোটি মানুষ কোনও না কোনও মাদক দ্রব্যে আসক্ত। মোট ড্রাগাসক্ত মানুষের মধ্যে চৌদ্দ ভাগের এক-ভাগ মহিলা।

দিল্লি, বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, ও হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি শহরে ড্রাগাসক্ত নারীর সংখ্যা বেশি। দেশের বিভিন্ন ডি–অ্যাডিশন্ সেন্টারে খোঁজ নিলে নারী ড্রাগাসক্তদের খবর মিলবে।

মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রধানত দুটি কারণে মহিলারা ড্রাগাসক্ত হচ্ছেন। প্রথমত ড্রাগাসক্ত স্বামীর উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ড্রাগের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছেন। দ্বিতীয়ত অর্থ। ড্রাগ মাফি-য়ারা শিক্ষিত ও সুদর্শনা মহিলাদের ড্রাগ পাচারের কাজে লাগাচ্ছে। রাজধানী দিল্লিতে এদের সংখ্যা বেশি। কলকাতায় জনৈকা সুবেশা সুন্দরী ড্রাগ পাচারকারীণী কিছুদিন আগে ধরা পড়েছিলেন।

ড্রাগ মাফিয়ারা গোপন নেশার ড্রাগের ব্যবসাকে জোরদার করার জন্য পুলিশকেও প্রলুব্ধ করেছে। এক কোটি টাকা মূল্যের হেরোইন সহ সম্প্রতি কলকাতায় এক পুলিশ ধরা পড়েছে। ড্রাগের নেশা যদি পুলিশ ও প্রতিরক্ষা বিভাগে অনুপ্রবেশ করে, তাহলে গোটা দেশ বিপদাপন্ন হয়ে পড়বে।

শুধু আইন দিয়ে এই জাতীয় বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। এর জন্য চাই সম্মিলিত সামাজিক সদিচ্ছা।

গোপালকৃষ্ণ রায়